নৌ বিদ্রোহের ইতিহাস

ফণিভুষণ ভট্টাচার্য

বুক্‌স অ্যাণ্ড পিরিয়ডিক্যাল্‌স
কলকাতা

Nou Bidroher Itihash
by Phani Bhusan Bhattacharya

প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৩৬১

প্রচ্ছদ
পূর্ণেন্দু পত্রী

প্রকাশক
অশোক ঘোষ
বুক্‌স অ্যাণ্ড পিরিয়ডিক্যাল্‌স
১/১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০ ০০৯

মুদ্রক
হারাধন ঘোষ
বীণাপাণি প্রেস
২ ঈশ্বর মিল বাই লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৬

ভূমিকা

ভারতের গত চতুর্থ দশকের নৌ বিদ্রোহ আমাদের জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামে একটি বিশিষ্ট ভূমিকা রচনা করেছিল। কিন্তু শুধু এইটুকু বললেই বোধহয় ওই বিদ্রোহের যথার্থ মূল্যায়ন করা হয় না। যে-সকল কারণে ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদী দস্যুরা ভারত-ত্যাগে বাধ্য হয়েছিল, তার মধ্যে আমাদের দেশের নৌ-সেনাদের ওই বিদ্রোহ ছিল নিঃসন্দেহে অন্যতম একটি প্রধান কারণ। নৌ বিদ্রোহের এই পরিচিতিই বোধহয় সঠিক ইতিহাসসম্মত ও বাস্তবভিত্তিক। ইংলণ্ডের যে-প্রধানমন্ত্রীর শাসনকালে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা অর্জন করেছিল, সেই প্রধানমন্ত্রী ক্লেমেণ্ট এ্যাটলি স্বয়ং ১৯৫৬ সালে এই কলিকাতা মহানগরীতে এসে ঠিক একই কথা বলেছিলেন।

এ-কথাও তো সাধারণ মানুষের সাধারণ বুদ্ধির অগম্য নয় যে গত প্রায় দুই শত বৎসর ধরে ভারতবর্ষকে নিষ্ঠুরভাবে শৃঙ্খলিত করে রেখে যে-সাম্রাজ্যবাদী দস্যুরা অতি নির্মম ও নিরবিচ্ছিন্নভাবে ভারতের সব সম্পদ লুণ্ঠন করে নিয়েছে, সেই সম্পদলিপ্সু দস্যুদের আবেদন নিবেদন, যুক্তি তর্ক কিংবা দুঃখভোগের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে কখনো ভারত ত্যাগে সম্মত করা যেত না। এও তো সকলেই দেখেছে এবং সকলেই জানে যে বিদেশী ইংরাজ দস্যুদের ভারতবর্ষে বলপূর্বক অবস্থানের এবং তাদের নির্লজ্জ দস্যুতার ভিত্তিই ছিল তাদের নিয়ন্ত্রিত স্থলবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবহর। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানের অব্যবহিত পরেই কতগুলি ঐতিহাসিক কারণে যখন ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদীদের শক্তির এই প্রধান উৎসসমূহ বিকল হয়ে যায়, তখনই তারা সন্ত্রস্তভাবে ভারত ত্যাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এবং শুধু তাই নয়। এই সামরিক শক্তিসমূহের আনুগত্যের অবক্ষয়ের এবং বহুলাংশে পরিবর্তনের ফলে সেই সময়ে ভারতবর্ষে যে-পরিস্থিতি দেখা দিয়েছিল এবং সেই সাথে সে-সময়ের (১৯৪১-৪৭) ভারতবর্ষের ব্যাপকতম জনগণের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী প্রচণ্ড বিক্ষুব্ধ মনোভাব লক্ষ্য করে সাম্রাজ্যবাদী নেতৃত্ব ভারতবর্ষ ত্যাগ করবার জন্য যে-দিন পূর্বনির্দিষ্ট করেছিল (জুন ১৯৪৮) অতি অল্প সময়েই তার পরিবর্তন করে এবং ত্বরান্বিত করে (আগস্ট ১৯৪৭)।

সুতরাং ইতিহাসের বাস্তব ঘটনাবলীর ভিত্তিতে ভারতের নৌ বিদ্রোহের বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করে দেখলে একথা অনস্বীকার্য বলেই প্রতীয়মান হবে যে, যে-সকল কারণ ভারতের জাতীয় মুক্তিকে ত্বরান্বিত করতে এবং সুনিশ্চিত করতে প্রত্যক্ষভাবে এবং প্রভূত পরিমাণে সাহায্য করেছে ভারতের দেশপ্রেমিক নৌ সেনাদের বিদ্রোহ সেগুলির মধ্যে অন্যতম।

আজ ত্রিশ বছরেরও কিছু বেশি হল ইংরেজরা ভারত ত্যাগ করেছে এবং আমরা জাতীয় স্বাধীনতা পেয়েছি। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় আমাদের দেশের জনসাধারণ আমাদের দেশের এবং জাতির ভাগ্যের এই বিরাট পরিবর্তন-সম্পর্কীয় ঘটনাবলী বিশদভাবে দূরের কথা সঠিকভাবেও প্রায় কিছুই জানে না। এবং আরো দুঃখের কথা ভারতবর্ষের জনসাধারণকে এই অতীব প্রয়োজনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ সঠিকভাবে জানাবারও যথাযত সুযোগ করে দেওয়া হয় নি।

একটু লক্ষ্য করলে সত্যই আশ্চর্য হতে হয় এবং মনে হতাশার ভাব জাগে যে বর্তমানের শিক্ষিত তরুণ-তরুণীদেরও এ-সম্বন্ধে সঠিক কোনো জ্ঞান কিংবা ধারণা নেই যে ইংরাজ দস্যুরা প্রায় দুই শত বৎসর আমাদের দেশের জনসাধারণের উপর কী অবর্ণনীয় নৃশংসতা ও বর্বরতা করেছে এবং তার প্রত্যুত্তরে ভারতবর্ষের জনগণ এই দুই শতাব্দীব্যাপী কাল কী পরিমাণে নিজেদের বুকের রক্ত ঢেলে দুর্দমনীয় বীরত্বের সাথে নিজেদের অতীত অনৈক্য ও দুর্বলতার প্রায়শ্চিত্ত করার চেষ্টা করেছে।

যাই হোক, আমাদের দেশের নৌ বিদ্রোহ আমাদের দীর্ঘকালব্যাপী জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের একটি বিশিষ্ট ও অতীব গৌরবোজ্জ্বল ঘটনা। এই গ্রন্থের লেখক শ্রীফণিভূষণ ভট্টাচার্য নৌ বিদ্রোহের সময় ভারতীয় নৌবাহিনীর শুধু একজন কর্মরত নাবিকই ছিলেন না, তিনি ঐ বিদ্রোহের একজন নেতৃস্থানীয় কর্মীও ছিলেন। তিনি তাঁর লেখনীর মাধ্যমে নৌ বিদ্রোহকে সঠিকভাবেই রূপায়িত করে তুলবার চেষ্টা করেছেন।

নৌ বিদ্রোহ সম্পর্কে বেশি বই লেখা হয় নি। ৩৫/৩৬ বৎসর পূর্বেকার অনেক ঘটনাই স্মরণের অতীতে চলে যায়। তা সত্ত্বেও ফণীবাবু যে সেই সব হারিয়ে-যাওয়া অমূল্য সম্পদসমূহ খুব কষ্ট করে খুঁজে বের করে দেশের মানুষের কাছে পরিবেশন করেছেন, তার জন্য তিনি সমগ্র জাতির ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতার পাত্র।

গণেশ ঘোষ

মুখবন্ধ

রয়েল ইণ্ডিয়ান নেভির বিদ্রোহের প্রাসঙ্গিক প্রামাণ্য নথিপত্র উদ্ধার করা খুবই কষ্টকর। বিশেষ করে, ১৯৪৪ সালের সামগ্রিক ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর বীরত্বপূর্ণ অভ্যুত্থান সম্পর্কিত যাবতীয় প্রামাণ্য দলিল-দস্তাবেজ উদ্ধার করা শুধু কষ্টসাধ্যই নয়, দুঃসাধ্যও বটে। কেন না, ব্রিটিশ ভারতের উপর থেকে তাদের শাসন-ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্ব-মুহূর্তে ভারতের বুকে তাদের দীর্ঘদিনের অন্যায়-অবিচার, অত্যাচার ও অমানবিক কার্যকলাপের লিখিত অলিখিত নথিপত্র বা দলিল-দস্তাবেজ যা-কিছু থাকা সম্ভব ছিল,—তা সবই ইচ্ছাকৃতভাবে ধ্বংস করে গেছে বলে আমার বিশ্বাস। নতুবা এতদিনেও এই নৌ বিদ্রোহের বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করা সম্ভব হয় নি কেন ? তাই, দীর্ঘদিন অতীত হলেও নৌ বিদ্রোহের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে ঘনিষ্ঠ থাকায় সাধারণ কর্মী হিসাবে এবং দেশমাতৃকার একজন দীনতম সেবকের কর্তব্য মনে রেখে ব্যক্তিগত উদ্যোগে এই কাজে হাত লাগাবার চেষ্টা করেছি মাত্র। এই গ্রন্থখানি তারই একটি নিদর্শন। জানি না, দেশের পাঠক-পাঠিকাদের নিকট এটি কতখানি সুখপাঠ্য ও আনন্দদায়ক হয়ে উঠবে। তবে আশার আলো দেখতে পেয়েছি ইংরাজী ১৯৭৩ সালের এপ্রিল মাসের 'আনন্দবাজার বার্ষিক সংখ্যা : ১৩৭৯'তে আমার এই গ্রন্থের সারসংক্ষেপ প্রকাশিত হতে দেখে।

এই গ্রন্থ রচনার ব্যাপারে যিনি আমাকে সর্বপ্রথম উৎসাহ দিয়েছিলেন তিনি হলেন আমার পরম পূজ্যপাদ ডক্টর পঞ্চানন চক্রবর্তী মহাশয়। এঁর পরেই যাঁর নাম আমার নিকট স্মরণীয় হয়ে থাকবে তিনি হলেন পরম শ্রদ্ধাস্পদ সিতাংশুকুমার দাশগুপ্ত, আই এ এস মহাশয়, (ভূতপূর্ব ডেপুটি ফিন্যান্স সেক্রেটারি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার)। তিনি আমাকে উৎসাহ-উদ্দীপনা, অমূল্য উপদেশ, সরকারি সাহায্য, এমন কি নিজের শারীরিক কষ্ট স্বীকার করেও সময়মত সক্রিয় সহযোগিতা দান করতে কুণ্ঠাবোধ করেন নি। তারপর কৃতজ্ঞতা জানাই দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকার কর্তৃপক্ষকে এবং বিশেষ করে এই পত্রিকার রবিবাসরীয় বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ঔপন্যাসিক রমাপদ চৌধুরী মহাশয়কে।

আর যাঁর কথা উল্লেখ করা একান্ত কর্তব্য, তিনি হলেন প্রকাশক 'বুক্স অ্যাণ্ড পিরিয়ডিক্যাল্‌স'এর অশোক ঘোষ। তাঁর সক্রিয় সাহায্য, সহযোগিতা ও উৎসাহ না পেলে রচনাটি হয়ত অপ্রকাশিত থেকে যেত।

যাঁদের অমূল্য উপদেশ ও সক্রিয় সহযোগিতা লাভে আমি ধন্য হয়েছি তাঁদের সকলকেই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। গ্রন্থখানির দ্রুত প্রকাশের ব্যস্ততায়

অনিচ্ছাকৃত কিছু কিছু ভুলত্রুটি থেকে যেতে পারে। পরবর্তী সংস্করণ ভিন্ন তা সংশোধন সম্ভব নয়। পাঠক-পাঠিকারা ক্ষমাসুন্দর চোখে তা দেখবেন আশা নিয়ে আমার মুখবন্ধের বক্তব্য এখানেই শেষ করলাম।

ফণিভূষণ ভট্টাচার্য

মাতৃদেবী আমোদিনী দেবীর পূণ্য স্মৃতির উদ্দেশে

প্রথম অধ্যায়

এখন থেকে ঐত্রিশ বছর পূর্বেও আমাদের দেশে ব্রিটিশরাজের অধীন ছিল। সেই ব্রিটিশ এদেশে আসে মুঘল সম্রাটের রাজত্বকালে ব্যবসা করবে বলে। ক্রমে তারা বসল এখানে আসন পেতে। প্রথমে এই ব্যবসারত বণিকদের দেখাশোনার জন্যে ব্রিটেন থেকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি এক স্কোয়াড্রন যুদ্ধজাহাজসহ ক্যাপ্টেন টমাস বেস্টকে অধিনায়ক করে পাঠালেন এদেশে। এই জাহাজগুলোর নাম হল, —'ড্রাগন', 'ওসিয়েণ্ডার', 'জেমস' ও 'সোলোমান'। ৫ সেপ্টেম্বর ১৬১২ সালে স্থাপিত হল 'রয়েল ইণ্ডিয়ান নেভি', সংক্ষেপে এর নাম হল: 'আর আই এন'।

তখন পরাক্রান্ত মুঘলগণ ভারত শাসন করতেন। সম্রাট জাহাঙ্গীর ইংরাজদের বাণিজ্য করার অনুমতি দিলেন। বাধিত হলেন ক্যাপ্টেন বেস্ট। প্রকৃতপক্ষে ক্যাপ্টেন বেস্ট তখন থেকেই সম্রাটের ক্ষমতার ব্যবহার করতে আরম্ভ করলেন। তাঁর নৌবাহিনীর জাহাজের কামান অতিসত্বর পর্তুগিজদের পরাভূত করল। শুধু তাই-ই নয়, এই নৌ-সৈন্য অন্যান্য ইউরোপীয় ব্রিটিশ-বিরোধী শক্তিগুলোকে এবং জলদস্যুদের আক্রমণ প্রতিহত করে ইংরাজদের বাণিজ্য জাহাজগুলোকে অবাধে চলাফেরা করার সুযোগ করে দিতে থাকল। পরে এই সৈন্যদের সাহায্যেই ভারতের বুকে ইংরাজরা নিরাপদে আসন বিছিয়ে বসল। এই নৌবাহিনীর তখন নামকরণ করা হল—'এইচ এম আই এন' (হিজ ম্যাজেস্টিস ইণ্ডিয়ান নেভি)। ১৬৮৬ সাল পর্যন্ত এই নামই প্রচলিত ছিল। মাঝে পাঁচবার এই নাম পরিবর্তিত হয় এবং ১৯৩৪ সালে আবার এর নাম পরিবর্তন করে রাখা হল: 'রয়েল ইণ্ডিয়ান নেভি' (আর আই এন)।

১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজদ্দৌলার পরাজয়ের পরে ভারতে ইংরাজ-প্রভুত্বের সূত্রপাত হল এবং তা পূর্ণক্ষমতায় বিকাশলাভ করল বক্সারের যুদ্ধে জয়লাভের মধ্য দিয়ে। ভারতীয় উপমহাদেশ (বর্তমান পাকিস্তান, বাংলাদেশ, ব্রহ্মদেশ, ভুটান ও সিংহলসহ) ইংরাজের জাতীয় পতাকা ইউনিয়ন জ্যাকের অধীনস্থ হল ১৮৪৭ সালে। অর্থাৎ মহান ভারতবর্ষ পরাধীন হল। 'বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল রাজদণ্ডরূপে'।

ভারতে ইংরাজের বিরুদ্ধে প্রথম সশস্ত্র অভিযান শুরু হয়েছিল বহু আগে থেকেই। কিন্তু তার প্রকটরূপ ধারণ করল সিপাহি বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে ১৮৫৭ সালে, স্বাধীনতার বীর সৈনিক মঙ্গল পাঁড়ের নেতৃত্বে। সিপাহি বিদ্রোহ ব্যর্থ হলেও সে তার ছাপ রেখে গেছে। এটা নিশ্চিতই জানি, কোনো কিছুই বৃথা যায় না। পেছনে সে ফেলে যায় তার পদচিহ্ন। তাই ঐ সিপাহি বিদ্রোহেরই সাতাশি বছর পরে (অর্থাৎ ১৯৪৪ সালে) রয়েল ইণ্ডিয়ান নেভির রেটিংরা (নৌ-সৈন্যদের রেটিং

বলা হয়ে থাকে) আবার বিদ্রোহ ঘটায়। তারই জের চলল ১৯৪৫ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। ১৮৫৭ সাল থেকে ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত— এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে অনেক স্বাধীনতা আন্দোলন ভারতের বুকে ঘটে গেছে, অসংখ্য দেশপ্রেমিক ফাঁসিকাঠে এবং ইংরাজ ও ইংরাজ দালালদের গুলিতে শহিদ হয়েছে। এবং আরও অনেক কিছু। সেসব অন্য ইতিহাস। আপাতত থাক সে-কথা। শুধু তাঁদের স্মরণে বলব, বিপ্লবের সাধনায় সংগ্রামের জয়রথে যাঁরা মুক্তির নিশান উড়িয়ে পরাধীনতার গ্লানি থেকে দেশকে শৃঙ্খলমুক্ত করার জন্যে স্বাধীনতার বেদিমূলে নিজেদের অমূল্য জীবন উৎসর্গ করে গেছেন, তাঁদের শত শত প্রণাম জানাই। শহিদদের শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদনের পর সেই নৌ বিদ্রোহের কথাই আবার বলি। কিন্তু কী দুর্ভাগ্য, সেই নৌ বিদ্রোহও ব্যর্থ হল! তবে একথা ঠিক, ঐ বিদ্রোহ ব্যর্থ হলেও ব্রিটিশকে কিন্তু বাধ্য করেছিল ভারতের প্রকৃত অবস্থা বুঝে এবং তার নতুন পরিস্থিতিকে মেনে নিতে। কারণ, এই বিদ্রোহ ব্রিটিশের প্রতি নৌ-সৈন্যের তথা সমগ্র ভারতীয় সশস্ত্রবাহিনীর আনুগত্যের ভিতকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল। এবং পরবর্তীকালে ঐ কাঁপুনি ছড়িয়ে পড়েছিল অন্য দুই বাহিনীতে; অর্থাৎ স্থল ও বিমানবাহিনীতেও দেখা দিয়েছিল বিদ্রোহ। ফলে, ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয় খুবই তাড়াতাড়ি। নৌ বিদ্রোহের দেড় বছর পরে ভারতের স্বাধীনতা-সূর্য বিতর্কিত ভাগাভাগির মাধ্যমে আবার উদিত হল। কিন্তু তারপর অনুরূপ দ্রুততার সঙ্গে ভারতীয় জনগণ আর বিশেষ কিছুই পেল না নিদারুণ দারিদ্র্য ও দুঃখকষ্ট ছাড়া।

পুরনো দিনের কথা হলেও মনে যতটা আছে তাই বলব। কেন নাবিক হয়েছিলাম, আর কী করে—প্রথমে সেই কথাই বলি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার আগে প্রধানতঃ পশ্চিম ভারতের অধিবাসীদের সৈন্যবাহিনীতে নিযুক্ত করা হত। কিন্তু অফিসারপদে নিয়োগ করা হত ইংরেজদের। ভীষণ সংকটে পড়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশ সরকার বাধ্য হল ভারতের অন্যান্য জাতীয় অধিবাসীদের মধ্য থেকে লোক সংগ্রহ করতে। এই সময় থেকেই কিছু কিছু ভারতীয় লোক অফিসার পদেও স্থান লাভ করল। কিন্তু হলে কী হবে, দেশের বৃহৎ জনসাধারণের সংস্পর্শ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা হত এই সেনাবাহিনীকে। এটা বিশেষভাবে দেখা দিয়েছিল ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহের পর থেকে। সৈন্যসংগ্রহের সময়ে বিশেষভাবে পরীক্ষা করা হত, কোনো রাজনৈতিক সংস্থার সাথে ঐ নিয়োগপ্রার্থী ব্যক্তির কোনো সম্পর্ক আছে কিনা। সংগ্রহকারী অফিসার প্রত্যেকের রাজনৈতিক বিশ্বস্ততা যাচাই করে দেখতেন। সামান্যতম রাজনৈতিক আলোচনাও সৈন্যবিভাগে নিষিদ্ধ ছিল। দেশের কোনো রাজনৈতিক আন্দোলনের সাথে যাদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যোগাযোগ ছিল তাদের সৈন্যবিভাগে

প্রবেশ করা ছিল দুঃসাধ্য। এই অবস্থার মধ্যে অতীতে আমার কিছুকিছু রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড থাকা সত্ত্বেও অতি স র্পণে নিজের বাড়ির ঠিকানা পালটে নৌবাহিনীতে প্রবেশ করলাম পোর্ট অফিসার হয়ে।

আজকাল অনেকেই বলে থাকেন, নৌ বিদ্রোহের পিছনে কোনো সংগঠিত ও সুচিন্তিত কার্যক্রম ছিল না, অথবা রাজনৈতিক দলগুলোর সহযোগিতায় সৈন্যবিভাগে বিদ্রোহ ঘটিয়ে ব্রিটিশকে তাড়িয়ে আমাদের মহান ভারতবর্ষকে স্বাধীন করার বা মুক্ত করার কোনো অভিপ্রায় ছিল না। এটা কতখানি সত্যি সে-বিষয়ে গভীর প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে। বিশেষ করে আমি নিজের ক্ষেত্রে বলতে পারি, ১৯৪২ সালের 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন (যে-আন্দোলনে যুক্ত থাকায় কারাদণ্ড ভোগ করে-ছিলাম), নেতাজীর 'ভারতীয় জাতীয় বাহিনী'র (আই এন এ অর্থাৎ ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি। 'দিল্লী চলো' আন্দোলন প্রভৃতিও যখন ব্রিটিশকে ভারত থেকে তাড়াতে পারল না, তখন সর্বভারতীয় ভিত্তিতে সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্য থেকে সংগ্রামমনা কর্মীরা কোনো কোনো রাজনৈতিক দলের মিলিত এক সর্বভারতীয় গোপন সংস্থার সিদ্ধান্ত মত কঠোর গোপনীয়তা রক্ষা করে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে (স্থল, নৌ ও বিমানবাহিনীতে) প্রবেশ করতে লাগল। আমিও যোগদান করলাম তখনকার কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টির নেতা অচ্যুত পটবর্ধনের নির্দেশে। পটবর্ধন এবং অরুণা আসফ আলি তখন 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে অভিযুক্ত হয়ে পুলিশকে এড়িয়ে আত্মগোপন করেছিলেন। আমি '৪২-এর আন্দোলনে কারাদণ্ড ভোগ করে কলকাতায় যখন এলাম তখন পটবর্ধন এবং আসফ আলি আত্মগোপন করে কলকাতায় অবস্থান করছিলেন। সেটা ছিল ১৯৪৩ সালের মার্চ মাস।

৭ মার্চ রাত্রি সাড়ে সাতটায় পটবর্ধন অতি গোপনে সংগ্রামীমনা কর্মীদের নিয়ে এবং বিশেষভাবে যাঁরা '৪২-এর আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন, তাঁদের নিয়ে এক যুক্ত সভা ডাকলেন কলকাতার রসা রোডের নকীপুরের জমিদার বাড়িতে। সে-বাড়িতে একটা এ আর পি ওয়ার্ডেন পোস্ট ছিল। ঐ এ আর পি ওয়ার্ডেন পোস্টের বেশির ভাগ কর্মীই ছিলেন কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টির সদস্য। সেখানে প্রবেশপথে কড়া পাহারা রাখা হয়েছিল। সকলকেই ঐ প্রহরীর কাছে পূর্ব-নির্দেশ মত এক প্রকার সাংকেতিক চিহ্ন দেখাতে হয়েছিল। ঐ সাংকেতিক চিহ্ন আর কিছুই নয়, তা ছিল সাদা ডোরাকাটা পুরোপুরি নীল রঙের একটা রুমাল থাকবে ডান হাতে, ভাবটা থাকবে এরকম যে নাক পোঁছা হচ্ছে। কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টির একজন সক্রিয় সদস্য নিরাপদ দাস আমাকে ওরকম একটা রুমাল দিলেন। দু'জনে আগে-পরে সামান্য সময়ের ব্যবধান রেখে সময়মত যথাস্থানে উপস্থিত

হলাম।

আমার ভেতরে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকারের তামাম শাসনের বনিয়াদকে ভেঙে গুঁড়িয়ে চুরমার করে দেওয়ার দুর্বার সংকল্পের আগুন জ্বলছে। মনে মনে ভাবলাম, গভীর আত্মবিশ্বাস ও দুর্জয় সাহসে মানুষ অসাধ্য সাধন করতে পারে—প্রতিহিংসা-প্রতিশোধের স্ফুলিঙ্গ একদিন রুদ্রমূর্তি ধারণ করে ধ্বংসের দাবানলে পরিণত হতে পারে। তার প্রমাণ আমরা কিছুটা পেয়েছিলাম ১৯৩০ সালে গান্ধীজীর 'আইন অমান্য' করে গণ-অভ্যুত্থানের প্রবল ঢেউয়ের মধ্যে, যার ফলস্বরূপ: ১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিল মাস্টারদা সূর্য সেনের নেতৃত্বে 'চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন'। ১৯৩৪ সাল থেকে ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত 'টিটাগড় ষড়যন্ত্র' এবং এরই মধ্য দিয়ে পথ-পরিক্রমায় প্রবলভাবে আত্মপ্রকাশ করল ১৯৪২ সালের আগস্ট আন্দোলন—'ভারত ছাড়ো'। এই 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের পটভূমিকায় যে-দৃশ্য ধরা পড়েছিল তাও ভাববার বিষয় হয়ে সাক্ষ্য বহন করছে।

১৯৪২ সালের গোড়ার দিকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় জাপানের চমকপ্রদ জয়লাভের ফলে ভারতের অচলাবস্থা সমাধানের জন্যে ব্রিটিশ সরকার প্রচেষ্টা চালাতে বাধ্য হয়। ১৯৪২ সালের ১১ মার্চ ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল ঘোষণা করলেন যে, যুদ্ধকালীন মন্ত্রীসভার (War Cabinet) সদস্য স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক স্বীকৃত কতগুলো শাসনতান্ত্রিক প্রস্তাব ব্যাখ্যা করবার উদ্দেশ্যে এবং 'সরেজমিনে ব্যক্তিগত আলোচনার মাধ্যমে' উক্ত প্রস্তাবের দ্বারা 'তাঁদের উদ্দেশ্য সিদ্ধি হবে কিনা তা যাচাই করবার জন্যে' ভারতবর্ষে যাবেন। স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস ১৯৪২ সালের ২২ মার্চ দিল্লীতে এসে পৌছান এবং ১৩ এপ্রিল করাচী হয়ে লণ্ডন অভিমুখে যাত্রা করেন। ব্রিটিশ সরকারের এই খসড়া ঘোষণায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলো ছিল:

১ "যুদ্ধ বন্ধ হবার সাথে সাথেই ভারতের নূতন সংবিধান রচনার জন্য একটি নির্বাচিত সংস্থা গঠনের ব্যবস্থা করা হবে।

২ "সংবিধান-রচনাকারী সংস্থায় দেশীয় রাজ্যগুলির প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করা হবে।

৩ "নিম্নে বর্ণিত সর্তসাপেক্ষে ব্রিটিশ সরকার উক্ত সংস্থা কর্তৃক প্রণীত সংবিধানটিকে স্বীকার ও অবিলম্বে কার্যকরী করবে:

(ক "ব্রিটিশ-ভারতের কোনো প্রদেশ যদি নূতন সংবিধানকে স্বীকার করতে না চায় এবং স্বীয় প্রচলিত শাসনতান্ত্রিক অবস্থা বহাল রাখতে চায় তবে তাকে সেই অধিকার দেওয়া হবে। ভবিষ্যতে যদি সেই প্রদেশ যুক্তরাজ্যে যোগদান করতে চায় তবে তা সে করতে পারবে।

আপাতত যুক্তরাজ্যে যোগদান করতে অনিচ্ছুক প্রদেশ যদি ইচ্ছা করে তাহলে ব্রিটিশ সরকার তাদের জন্যে নূতন এক সংবিধান গঠনে সম্মত হবে, সেই সংবিধানে

এই প্রদেশগুলিকে ভারতীয় ইউনিয়নের অনুরূপ পূর্ণমর্যাদা দেওয়া হবে।

(খ) "সংবিধান-রচনাকারী সংস্থা ব্রিটিশ সরকারের সাথে এক চুক্তি করবে, চুক্তিতে 'ব্রিটিশের হাত হতে সম্পূর্ণরূপে ভারতীয়দের হাতে দায়িত্ব হস্তান্তর-করণের ফলে উদ্ভূত সমস্ত বিষয় সম্পর্কে' ব্যবস্থা ও 'জাতিগত এবং ধর্মীয় সংখ্যা-লঘুদের রক্ষা-ব্যবস্থার' প্রতিশ্রুতি থাকবে। কিন্তু এই চুক্তির ফলে 'ভবিষ্যতে ব্রিটিশ কমনওয়েলথের অন্যান্য সদস্য-রাষ্ট্রের সাথে স্বীয় সম্পর্ক নির্ধারণের ব্যাপারে ভারতীয় ইউনিয়নের ক্ষমতার ওপর কোনো বাধানিষেধ আরোপিত হবে না।'

৪ "প্রাদেশিক বিধানমণ্ডলীর নিম্নসভাগুলির (Lower Houses) সদস্যগণ, কর্তৃক আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে সংবিধান-রচনাকারী সংস্থা নির্বাচিত হবে।

৫ "নূতন সংবিধান রচনা না-হওয়া পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকার ভারতের প্রতিরক্ষার জন্য দায়ী থাকবে। কিন্তু 'স্বদেশ, কমনওয়েলথ এবং জাতিসংঘ সম্পর্কীয় সমস্ত ব্যাপারে ভারতের জনসাধারণের মুখ্য অংশগুলির নেতৃবর্গের অবিলম্বে কার্যকরী অংশগ্রহণ' করাই ব্রিটিশ সরকারের 'কাম্য ও বাঞ্ছনীয়'।"

এই ঘোষণায় ভারতকে একটা আশ্বাসমাত্র দেওয়া হল—সে-আশ্বাসও আবার পূর্ণ হবে সঙ্গে সঙ্গে নয়, ভবিষ্যতে। মহাত্মা গান্ধী এই পরিকল্পনাকে 'ভবিষ্যতের তারিখ-যুক্ত চেক' (post-dated cheque) বলে অভিহিত করলেন। দ্বিতীয়তঃ, ভারতীয় ইউনিয়নে প্রদেশগুলির যোগদান না-করবার ব্যবস্থা রাখায় পাকিস্তানের দাবির সুস্পষ্ট স্বীকৃতি যদি না-ও হয় তবে তাতে প্রত্যক্ষভাবে উৎসাহ দান করা হয়েছে নিশ্চয়ই। তৃতীয়তঃ, প্রতিরক্ষা সম্পর্কে প্রস্তাবিত ব্যবস্থা কংগ্রেসের নিকট গ্রহণযোগ্য ছিল না। চতুর্থতঃ, কংগ্রেসের দাবি ছিল, ভারতীয় নেতৃবর্গ কর্তৃক গঠিত জাতীয় সরকারের পরামর্শে গভর্নর-জেনারেল নিয়মতান্ত্রিক শাসনকর্তারূপে কাজ করবেন,—এই মর্মে অলিখিত আশ্বাস। কিন্তু কংগ্রেস তা পেল না। জওহরলাল নেহরুর মতে ক্রিপস পরিকল্পনার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, 'সরকারের বর্তমান কাঠামো অবিকল পূর্বের ন্যায় বজায় থাকবে, বড়লাটের স্বৈরাচারী ক্ষমতা বহাল থাকবে এবং আমাদের মধ্যে জনকয়েক তাঁর উর্দিধারী হুকুমবরদার হয়ে ভোজনশালা ও ঐ জাতীয় ব্যাপারের তদারকী করবে।' সেই জন্যে কংগ্রেস ব্রিটিশ সরকারের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল। মুসলিম লিগও প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে পাকিস্তানের দাবির পুনর্ঘোষণা করল।

তাই, স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস যখন ভারত ত্যাগ করলেন তখন ভারত অদৃষ্টপূর্ব এক উত্তেজনায় কম্পমান। বিশেষতঃ, জাপান যখন ভারতের দুয়ারে এসে উপস্থিত হয়েছে সেই সংকট মুহূর্তেও ব্রিটিশ সরকার যখন আপস-মীমাংসায় রাজি হল না, তখন কংগ্রেসও সরকারের প্রত্যক্ষ বিরোধিতার নীতি গ্রহণে বিলম্ব করতে আর চাইল না। স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস-এর প্রত্যাবর্তনের অব্যবহিত পরেই 'ভারত

ছাড়ো'—এই ধারণা মহাত্মা গান্ধীর মনে উদয় হয় এবং অবিলম্বে তিনি একে জাতীয়তাবাদী ভারতের রণধ্বনি করে তোলেন। ১৯৪২ সালের ১০ মে তারিখে তিনি 'হরিজন' পত্রিকায় লিখলেন, 'ব্রিটিশের ভারতে অবস্থিতি জাপানকে ভারত আক্রমণে আমন্ত্রণ জানানোরই সামিল। ব্রিটিশ ভারত ছেড়ে গেলেই এই প্রলোভন বিদূরিত হবে।' কিছুকাল পরে তিনি আবার লিখলেন, 'ভারতকে ঈশ্বরের হাতে, অথবা আধুনিক পরিভাষায় বলতে গেলে, নৈরাজ্যের হাতে ছেড়ে দিয়ে যান। তখন সমস্ত দল হয় নিজেদের মধ্যে কুকুরের মত মারামারি করবে, না-হয় প্রকৃত দায়িত্ববোধের সম্মুখীন হয়ে নিজেদের মধ্যেই মীমাংসা করে ফেলবে।'

১৯৪২ সালের ১৪ জুলাই কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির এক প্রস্তাবে বলা হল যে, ব্রিটিশের শাসন-ক্ষমতা ত্যাগের দাবি প্রত্যাখ্যাত হলে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে 'ব্যাপক' অহিংস সংগ্রাম শুরু করতে কংগ্রেস 'অনিচ্ছুক হয়েও বাধ্য' হবে। এই প্রস্তাব ১৯৪২ সালের ৮ আগস্ট বোম্বাইতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে গৃহীত হল। সেখানে ঘোষণা করা হল :

'ভারতের স্বার্থে এবং জাতিসংঘের উদ্দেশ্যের সার্থকতার জন্যে ভারতে অবিলম্বে ব্রিটিশ শাসনের অবসান হওয়ার জরুরী প্রয়োজন। এই শাসন চালিয়ে যাওয়ার ফলে ভারত হীনমন্য ও দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং এরই ফলে দেশরক্ষায় এবং পৃথিবীর মুক্তিসংগ্রামে যোগদান সম্বন্ধে ভারত ক্রমশ অপারগ হয়ে পড়েছে।'

পরদিন সকালে (১৯৪২ সালের ৯ আগস্ট) গান্ধী-সহ কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির নেতৃবর্গ এবং বহু কংগ্রেস নেতাকে গ্রেপ্তার করা হল। সাথে সাথে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি এবং প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিগুলি বেআইনী ঘোষিত হল। তৎকালীন ভারতের বড়লাট লর্ড লিনলিথগো ইচ্ছাকৃতভাবে সারা ভারত জুড়ে কঠোর দমননীতি অনুসরণ করতে লাগলেন। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে হঠাৎ গ্রেপ্তার করার ফলে জনসাধারণের নেতা বলতে কেউ থাকলেন না এবং সরকারের হিংস্র অত্যাচারে জনসাধারণ চরম অবস্থা গ্রহণে উৎসাহ পেল। মুমূর্ষু সাম্রাজ্যবাদী অত্যাচারের বিরুদ্ধে নেতৃত্বহীন জনতার সহিংস সংগ্রামের পূর্ণ কাহিনী এখনো পর্যন্ত লিপিবদ্ধ হয় নি। সরকারি বিবৃতি অনুযায়ী আড়াই শ' রেলস্টেশন ও পাঁচশ ডাকঘর হয় ক্ষতিগ্রস্থ. না-হয় ধ্বংস করা হয়েছে; দেড়শ'র অধিক থানায় আক্রমণ চালানো হয়েছে, বেশ কিছু সংখ্যক রাজকর্মচারী ও সৈন্য নিহত হয়েছে এবং নয়শ' জনের অধিক নাগরিক প্রাণ হারিয়েছে। এই হিসাব ব্রিটিশের সুবিধামত পরিবেশিত, যা অতীব নগণ্য। যা ঘটেছিল, তার দশভাগের একভাগ মাত্র। '৪২-এর 'আগস্ট আন্দোলন'-এর পরিচালন ভার যে-সর্বভারতীয় কণ্ট্রোল কমিশনের পাঁচজন সদস্যের ওপরে ছিল, তাঁরাই তা ভালভাবে জানেন। তাঁদের মধ্যে মনে হয় দুজন এখনো বর্তমান। তাঁরা হলেন, পান্নালাল দাশগুপ্ত এবং অরুণা আসফ আলি। তাঁরাই পারেন প্রকৃত তথ্য-সম্বলিত ঘটনাপঞ্জী লিপিবদ্ধ করতে।

অবশ্য মহাত্মা গান্ধী এই হিংসাত্মক কার্যকলাপের বিন্দুমাত্র দায়িত্ব গ্রহণ করতে চাইলেন না। ১৯৪৩ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি থেকে তিন সপ্তাহ অনশন করে রইলেন। তাঁর জীবন যখন ঘোরতর সংকটাপন্ন তখনো তাঁকে মুক্তিদানে লর্ড লিনলিথগোর অস্বীকৃতির দরুন দু'জন হিন্দু এবং একজন পার্শী বড়লাটের শাসন-পরিষদ হতে পদত্যাগ করলেন। এর পরেই ১৯৪৩ সালে বাংলায় প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। এটাও ব্রিটিশের ইচ্ছাকৃত সৃষ্টি। এই দুর্ভিক্ষে বহু লক্ষ লোক প্রাণ হারায় এবং ১১৭৬ বঙ্গাব্দের (ইংরাজী ১৭৭০ সাল) কুখ্যাত 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের' বিভীষিকা নতুন করে বাংলাদেশে দেখা দিল। দেশের এরকম অস্থির ও চাঞ্চল্যকর এবং উত্তেজনাপূর্ণ পটভূমিকায় আমরা মিলিত হয়েছিলাম রসা রোডের ঐ জমিদার বাড়িতে।

আমরা যে-ঘরটায় মিলিত হয়েছিলাম সেটা ছিল একটা বড় হলঘর। দরজা-জানলা বেশির ভাগই বন্ধ ছিল। মাথার উপরে বৈদ্যুতিক পাখা ঘুরছে। আলো ঝলমল করছে। এক-এক করে দেখতে দেখতে প্রায় দেড়শ' যুবক উপস্থিত হল। এই মুক্তিসেনার দল, স্বাধীনতার স্বপ্নে মুক্তিনেশায় উন্মত্ত, প্রাণের বিনিময়ে দেশের বৃহত্তর স্বার্থে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে তারা যে-কোনো সময়ে প্রস্তুত। যারা আঘাত হানবার জন্যে দুর্জয় সাহসে বুক বেঁধেছে, শৃঙ্খল ভাঙবার উন্মাদনায় যারা অধীর—তারা কংগ্রেসের নৈতিক চেতনা বা অহিংস-নীতির চুলচেরা বিচারে আগ্রহী নয়; পরাজয়ের গ্লানিকে তারা কিছুতেই মানতে পারে না। এ যেন যুদ্ধক্ষেত্র। সকলেই সেনাপতির আদেশের অপেক্ষায় অপেক্ষমান। যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকের কাছে যেমন সেনাপতির নির্দেশ—সেখানে সৈনিকের মনে বিচার-বিশ্লেষণের অবকাশ নেই, কোনো তর্ক, কোনো অক্ষমতার বা দ্বিধার স্থান সেখানে নেই,—যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকের একমাত্র কর্তব্য সেনাপতির আদেশ পালন করা আর প্রয়োজনমত শেষ রক্তবিন্দু বিসর্জন দিয়ে মৃত্যুবরণ করা। যুদ্ধের তাই নীতি হল :

There's not to make reply,
There's not to reason why,
There's but to do and die.

আমাদের বহু আকাঙ্ক্ষিত দীর্ঘ-প্রতীক্ষিত যুদ্ধক্ষেত্রের সেনাপতিতুল্য অচ্যুত পটবর্ধন ঠিক সাড়ে সাতটায় হলঘরে উপস্থিত হলেন। তাঁর প্রবেশের সাথে সাথে সকলে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো সম্মান দেখাবার জন্যে। আমিও উঠে দাঁড়ালাম। পূর্বেই তাঁর বিষয়ে অনেক উচ্চ ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল! সম্মান পাবার উপযুক্তও বটে। তিনি ইংরাজীতে তাঁর বক্তব্য রাখলেন। হরিদাস মুখার্জী তা বাংলায় তর্জমা করে দিলেন। তাঁর বক্তব্যের মূল কথা হল, 'ব্রিটিশকে তাড়াবার জন্যে ভারতের বীর জনগণ অশেষ দুঃখ অশেষ নির্যাতন ভোগ করেছে, বর্তমানেও করছে। '৪২-আন্দোলনের জের এখনো চলছে। সর্বোপরি নেতাজী বিদেশে গিয়ে ভারতমাতাকে

মুক্ত করতে যে-চেষ্টা করেছিলেন তা এখনো কার্যকরী হয় নি। তিনি (সুভাষচন্দ্র বসু) চান, আমরা যারা ভারতে আছি, আমাদের একান্ত কর্তব্য হল, ব্রিটিশের ভারতীয় সেনাবাহিনীতে যত বেশি সংখ্যক প্রবেশ করা এবং সেখানে বিদ্রোহ ঘটানোর আপ্রাণ চেষ্টা করা। তাই, আমি আবেদন রাখছি, আপনারা দলে দলে সামরিক বাহিনীতে যোগদান করুন, ভারতমাতাকে মুক্ত করুন। আপনারা মনে রাখবেন, এই ব্যাপারে আমাদের দলই শুধু এই সিদ্ধান্ত নেয় নি, অন্যান্য রাজনৈতিক দল,—যেমন কংগ্রেসের বামপন্থী গোষ্ঠি, ফরওয়ার্ড ব্লক, কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি, মুসলিম লিগ, আর সি পি আই, ওয়ার্কার্স পার্টি, এম এন রায় পন্থী, এমন কি কম্যুনিস্ট পার্টিও এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে।'

কম্যুনিস্ট পার্টির কথা বলায় অনেকেই আশ্চর্য হলেন। অনেকেই তাঁর দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন। কেননা, ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টি তখন তাদের পার্টিগত নীতিতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, অর্থাৎ যখন রাশিয়ার বিরুদ্ধে আক্রমণ শুরু হল, তখন থেকে জনযুদ্ধ' (people's war) বলে ঘোষণা করে ব্রিটিশকে কতকটা পরোক্ষে সাহায্য করতে থাকে। এই নীতিতে বিশ্বাসী হয়ে তারা কী করে সামরিক বিভাগে লোক ঢুকিয়ে বিদ্রোহ ঘটাবে ? মনে প্রশ্ন জাগল।

পটবর্ধন আরো বললেন, 'ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টি যদিও নীতিগতভাবে এই যুদ্ধকে 'জনযুদ্ধ' বলে ঘোষণা করেছে, তবুও তারা ১৯১৭ সালের রাশিয়ার বিপ্লবের সময়ে সেখানকার সেনাবাহিনী কীভাবে বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করেছিল, তা তারা ভোলে নি। আমাদের সাথে কথাও হয়েছে। সর্বভারতীয় ভিত্তিতে আমরা সমস্ত রাজনৈতিক দল মিলে একটা সংস্থাও গঠন করেছি, যা গোপনীয়তা বজায় রেখেই চলবে। এতে ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টিও থাকছে। এই গোপন সংস্থার কাজই হবে, ভারতীয় সেনাবাহিনীতে বিদ্রোহ ঘটিয়ে দেশের জনগণের সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত থেকে ব্রিটিশকে তাড়িয়ে ভারতে বিপ্লবী সরকার গঠন করা। নেতাজীও এটাই চাইছেন। শুধু তাই-ই নয়। এই গোপন সংস্থার নাম হল 'আণ্ডারগ্রাউণ্ড সেণ্ট্রাল অরগানাইজেশন,' যা গঠিত হয়েছিল ১৯৪১ সালে। এর সঙ্গে যোগসূত্র আছে আমাদের মহান বিপ্লবী নেতা রাসবিহারী বসুর, যিনি এখন জাপানের নাগরিক। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় তাঁর সৃষ্ট ভারতীয় স্বাধীনতা লিগ আমাদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছে। রাসবিহারীবাবু বর্তমানে সিংগাপুরেই আছেন।'

এরপরে অচ্যুত পটবর্ধন সাংগঠনিক পদ্ধতির কিছুটা ইঙ্গিত দিয়ে বললেন, 'সেনাবাহিনীতে ঢোকার জন্যে আমরা প্রধান প্রধান শহরে কতকগুলো গোপন আস্তানা খুলেছি। আপনাদের পৃথক পৃথকভাবে সেখানে নিশানা নিয়ে যেতে হবে। সেই নিশানাসহ ঠিকানা স্থানীয় পার্টি-সম্পাদকের কাছে অথবা তাঁর (সম্পাদকের) নিকটতম প্রতিনিধির কাছে পাবেন। একটা কথা সর্বদাই মনে রাখতে হবে যে, এই ব্যাপারে আমাদের সর্ববিষয়ে কঠোরভাবে গোপনীয়তা রক্ষা করতে হবে, যেমন

ভাবে করেছিলেন অগ্নিযুগের মহান বিপ্লবীরা। যাঁরা '৪২-এর আন্দোলনে অথবা অন্য কোনো রাজনৈতিক কারণে জেল খেটেছেন, তাঁদের নিজের বাড়ির ঠিকানা পালটে ফর্মের কলাম-এ গোপন সংস্থা যে-ঠিকানা দেবেন তাই বাড়ির ঠিকানা হিসাবে বসিয়ে দেবেন।' এইরূপে নির্দেশ দান করে তিনি সাড়ে ন'টায় সভাস্থল ত্যাগ করে তাঁর গোপন আস্তানায় চলে গেলেন। যাবার আগে আবার তিনি বললেন, 'ভারতবর্ষে বড় বড় শহরে প্রতিটি সামরিক কর্মনিয়োগ-কেন্দ্রে আমাদের নিজস্ব লোক আছে, কলকাতায় যেমন আছেন কর্নেল লাহিড়ী।'

মনে হল, দেশমাতৃকার বেদিমূলে আত্মোৎসর্গের মহামুক্তির সংগীতসুধা তিনি স্থির বিশ্বাসে সমস্ত দেহ-মন দিয়ে পান করেছেন। বিপ্লবীরা জানতেন, এ-সংগ্রাম বড় কঠিন, বড় ভয়াবহ।

সামরিক বিভাগে ঢোকার উদ্দেশ্য হল, ব্রিটিশকে তাড়াতে হলে এবং ভারত-মাতাকে মুক্ত করতে হলে এখন একমাত্র পথ, ব্রিটিশের ভারতীয় সেনাবাহিনীতে বিদ্রোহ ঘটানো। কেননা, এই সেনাবাহিনী দ্বারাই ব্রিটিশ ভারতবর্ষকে তখনো পদানত করে রেখেছে। যদিও সেই সময় ভারতীয় সেনাবাহিনীতে ভারতের লোকই বেশি, তবুও সামরিক বিধি-বিধানের অক্টোপাসে ঐ বাহিনী এমনভাবে আবদ্ধ ছিল যে, সম্পূর্ণভাবে তারা (সৈন্যরা) ভারতীয় জনগণের তথা জাতীয় নেতাদের থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল। অথচ তাদের (সৈন্যদের) মধ্যে ধুমায়িত অসন্তোষ, বিক্ষোভ যেন ফেটে পড়ার মত। শুধু চাই একটু রাজনৈতিক ছোঁয়াচ, প্রয়োজন বোধে সংগঠিত ও বলিষ্ঠ রাজনৈতিক নেতৃত্ব। একথা ঠিক যে, সৈন্যবিভাগের বেশির ভাগ লোক রাজনৈতিক জ্ঞানসম্পন্ন ছিল না। আর, ছিল না বলেই গোপন সংস্থার মাধ্যমে বিশ্বস্ত, মোটামুটি রাজনৈতিক জ্ঞানসম্পন্ন বেশ কিছু লোক ভারতীয় সেনা-বাহিনীর তিন বিভাগেই বিভিন্ন পদে নিযুক্ত হয়েছিল। সে-সময়ে ভারতীয় সেনা-বাহিনীতে ১৯৪১ সাল থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত নিম্নলিখিত-সংখ্যক ভারতীয় ছিল (মন্নু সুবাদারের প্রশ্নের উত্তরে কেন্দ্রীয় এ্যাসেমব্লিতে সহকারি যুদ্ধসচিব পি ম্যাসন বলেন) : স্থলবাহিনী ২,৫৩,০০০; নৌবাহিনী ৩২,৯১৭; বিমান বাহিনী ২৯,৮২০।

আজ বলতে বাধা নেই, ঐ গোপন সংস্থার মাধ্যমে স্থলবাহিনীতে ঢোকানো হয়েছিল ৭,৫০০ জনকে, নৌবাহিনীতে ৩,৫০০ জনকে এবং বিমানবাহিনীতে ২,৫০০ জনকে। প্রয়োজনের তুলনায় অবশ্য খুবই নগণ্য। তাছাড়া, এখন এও বলতে বাধা নেই, ঐ কেন্দ্রীয় গোপন সংস্থার সদস্য ছিলেন (গোপন সংস্থার সঙ্গে যুক্ত থাকায় আমি যতটা জানি) : হরিসাধন ঘোষাল (যিনি পরে বর্মায় পালিয়ে গিয়ে রেড আর্মি পরিচালনা করেন), চন্দ্র সিং গারোয়াল, শেখ শাহাদত আলি, ভুলাভাই দেশাই, অচ্যুত পটবর্ধন, আর এস রুইকর, ডঃ জি অধিকারী,

ডঃ ইউসুফ, শ্রীমতী কমলা ভোগে, বি টি রনদিভে, অরুণা আসফ আলি এবং আরোও দু'একজন, যাদের নাম আমি জানতাম না। তবে, ঐ নাম-না-জানাদের মধ্যে একজন ছিলেন পি কোট্টায়াম, যাঁর সাথে আমার পরবর্তী সময়ে সাক্ষাৎ পরিচয় হয়েছিল মুলতান সামরিক জেলে।

১৯৪৩ সালের ৭ মার্চ। এদিনটি আমার কাছে বিশেষভাবে স্মরণীয়। আমার ওপরে নির্দেশ এল, আমাকে নৌবাহিনীতে ঢুকতে হবে—তা সে যেভাবেই হোক। একটু চিন্তায় পড়লাম। বিশেষভাবে চিন্তিত এই জন্যে যে, অতীতে রাজনৈতিক কাজে লিপ্ত থাকায় 'টিটাগড় ষড়যন্ত্র মামলায়' (যে মামলায় আমাদের গোটা পরিবারই গ্রেপ্তার বরণ করেছিল। তখন আমার বয়স মাত্র নয় বৎসর, সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র। আমার বড়দাদা কালীপদ ভট্টাচার্য ঐ মামলার একজন নেতৃস্থানীয় আসামী ছিলেন) অভিযুক্ত হয়েছিলাম। তাছাড়া আমি ১৯৪২ সালে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে গ্রেপ্তার বরণ করি ও দণ্ড ভোগ করি। এই সব কিছুর বিবরণ ভারত সরকারের হেফাজতে নিশ্চয়ই থাকবে। অথচ সামরিক বিভাগে ঢুকতে হলে কোনো-প্রকার রাজনৈতিক ছোঁয়াচ থাকলে চলবে না। মহাসংকটে পড়লাম। সংকট দেখা দিল এই ভেবে যে, বাড়ির ঠিকানাটা পালটে দিয়ে ঢোকার নির্দেশ পেয়েছি বটে, কিন্তু সামরিক বিভাগে যে-উদ্দেশ্যে আমরা যাচ্ছি, তা ওখানে বেশিদিন থেকে সিদ্ধ করতে পারব তো! সামরিক পুলিশ বা গুপ্তচরবাহিনীর কাছে ধরা পড়ব না তো! এইসব নানাপ্রকার এলোমেলো চিন্তা আমার মনে ভিড় জমালো। শেষ পর্যন্ত মনকে স্থির করলাম এই ভেবে যে, যাই ঘটুক না কেন, ভারতমাতাকে মুক্ত করার জন্যে সর্ব-প্রকার বিপদের মধ্যেও ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রস্তুত থাকব। বিশেষ করে আমি তো 'ডু-অর-ডাই' মন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছি! অতএব চিন্তার কোনো কারণ থাকা উচিত নয়।

স্থানীয় পার্টি-সম্পাদকের কাছ থেকে গোপন আস্তানার ঠিকানা এবং সাংকেতিক নিশানা জেনে নিয়ে ২২ মার্চ সকালে ৭৫ হ্যারিসন রোডের (বর্তমান মহাত্মা গান্ধী রোড) বাড়িতে কেন্দ্রীয় গোপন সংস্থার শাখা অফিসের সামনে সাংকেতিক নিশানা-সহ এসে উপস্থিত হলাম। এক্ষেত্রে সাংকেতিক নিশানা ছিল, সেই নীল রঙের রুমাল বুক-পকেটে থাকবে, যার একটা কোণ অন্তত দেড় ইঞ্চি বেরিয়ে থাকবে। ঐরূপ নির্দেশিত পথে আমি পকেটে রুমাল রেখে হ্যারিসন রোডের ৭৫ নম্বর বাড়িতে হাজির হলাম। দু'জন অপরিচিত যুবক দরজা পাহারা দিচ্ছিল। আমার কাছে সাংকেতিক নিশানা ঠিকমত পেয়ে কোনোরকম প্রশ্ন না করে কানে কানে বলে দিল, সোজা চলে যেতে তিন তলায় দু'নম্বর ঘরে। তাদের কথামত এসে হাজির হলাম দু'নম্বর ঘরের সামনে। ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করা ছিল। পূর্ব-নির্দেশ মত দরজার গায়ে তিনটা টোকা মারতেই এক মহিলা দরজা খুলে দিলেন। তিনি

বললেন, সামনের পরদাটা তুলে ভেতরে যেতে। তাঁর কথামত সেখানে গিয়ে দেখলাম, জনা পাঁচেক লোক বসে আছে। তারা আমার পরিচিত ছিল না। আমার কাছে স্থানীয় পার্টি-সম্পাদকের লিখিত ঠিকানাটা চাইলেন। অর্থাৎ আমি যে সেই প্রেরিত ব্যক্তি, তার পরিচয় হল স্থানীয় পার্টি-সম্পাদকের নিজের হাতে লেখা ৭৫ হ্যারিসন রোডের ঠিকানাটা, যা আমার কাছে থাকা চাই-ই।

বিপ্লবীদলের সদস্য সংগ্রহের ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্কতা ও পরীক্ষানিরীক্ষা করা হত। এখানেও সেই গোপনীয়তার পরীক্ষা চলল আমার ওপরে। কষ্টিপাথরে যাচাই করে নেওয়া হচ্ছে প্রত্যেকটি কর্মীকে। এ যেন সেই মৌরলা মাছ ধরার জাল। একেবারে ছেঁকে তোলা হচ্ছে। কেউ ফাঁকি দিয়ে যেন পালাতে না পারে—তার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি।

ঘরটি খুব বড় নয়। তবে একসঙ্গে পঁচিশ/ত্রিশ জন লোক বসতে পারে। ফ্যামিলি কোয়ার্টারের মতই সাজানো-গোছানো। আলনা, ড্রেসিং টেবিল থেকে শুরু, মায় রেডিও পর্যন্ত শোভা পাচ্ছে। ঘরের উপরের দিকে চোখ পড়তেই দেখা গেল, অনেকগুলো ফটো রেলিং করে সাজানো রয়েছে। ফটোগুলো দেখে নিশ্চিতই ধারণা হবে যে, ঐ ঘরটির বা ঐ ঘরের পরিবারপরিজন একান্তই পরম ব্রিটিশভক্ত। তার ভেতরে এতটুকু ঘাটতি নেই। মনে মনে ভাবলাম ব্রিটিশকে ফাঁকি দেবার বাঙ্গালীর কী অভিনব বুদ্ধি! বিশেষ করে আমি যখন সন্ত্রাসবাদী দলে (অনুশীলন সমিতি) ছিলাম, যদিও আমি তখন ছোট ছিলাম, তখনকার যুগের সেই 'গুপ্তীমন্ত্র'-এর নিশানা অনেক কিছুই জানতাম। তার কারণও ছিল,—তখন আমাকে দিয়ে বেশির ভাগ সময়ই খবর চিঠিপত্র আদানপ্রদানের (courier) কাজগুলো করানো হত। তাতে আমি জানি কী কঠোর গোপনীয়তা রক্ষা করে কৃচ্ছ্রতার মধ্য দিয়ে তিন/চার ঘণ্টা পর পর পোশাক-পরিচ্ছদ পালটে নিয়ে চলতে হত। সে-অতীত সত্যিই স্মরণীয়।

যে-পাঁচজন ওখানে বসে ছিলেন তাঁদের মধ্যে তিনজন প্রৌঢ়, আর বাকি দু'জন যুবক। তিনজন প্রৌঢ়ের মধ্যে একজনকে তাঁর পোশাক-পরিচ্ছদে মনে হচ্ছিল যেন কোনো স্কুলের হেডপণ্ডিত, অর্থাৎ স্কুলের সংস্কৃতের শিক্ষক। অথচ তিনিই হলেন মূল। তাঁর নাম বিনয় বাগচি। তিনি ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির তৎকালীন রাজ্য কমিটির সদস্য। আমার খাঁটি নাম-ধাম লিখে নিয়ে এবং আমার অতীতের রাজনৈতিক কার্যকলাপের নোট রেখে বললেন, 'আপনার নিজের নাম এবং বাবার নাম ঠিক রেখে বাড়ির ঠিকানা পালটে দিয়ে চব্বিশ-পরগনার এই বাড়ির ঠিকানা দিয়ে দেবেন বাড়ির ঠিকানা বসাবার জায়গায়। মনে রাখতে হবে যে, গোপনীয়তা প্রাণ গেলেও বজায় রাখতে হবে। শত্রুরা কিন্তু ওত পেতে আছে আমাদের ধরার জন্যে।' মনে হল, তাঁরা যেন আগেভাগেই সব কিছু ঠিক করে রেখেছেন। তখন আমার বয়স মাত্র বাইশ বছর। আমাকে আগামীকাল সকাল

দশটার মধ্যে সেনাবাহিনীর কর্মী নিয়োগ কেন্দ্রে যেতে বললেন নৌবাহিনীতে ভর্তি হবার জন্যে।

মনে হল যেন, মহান বিপ্লবী শহিদদের অমর আত্মা হঠাৎ আমার কানে ঝংকার তুলে বাণী শুনিয়ে গেল, 'দেশের মুক্তিযজ্ঞের যূপকাষ্ঠে আত্মোৎসর্গের গৌরব ঘোষণা করেই হবে আমাদের আত্মপ্রতিষ্ঠা। লৌহকারায় অবরুদ্ধ সংকুচিত ভীত জীবনে মরণের মহাশঙ্খ ধ্বনিতে শুনবে জাগরণের জয়গান। শৃঙ্খলমুক্ত জীবনে লাগবে বাঁচার দীপ্ত পরশ, মুক্তদীপ্ত প্রাণ ছুটে যাবে মরণকে আলিঙ্গন করতে। এ-জীবন-মরণের মোহনা থেকে শুরু হবে আমাদের জীবনের জয়যাত্রা। মনে রাখতে হবে সংগ্রামের দুর্গম পথে যাত্রার পূর্বে মুক্তিসেনারা এই সংকল্পে নিজেদের দীক্ষিত করে নিতেন।'

আনত শিরে আমিও দীক্ষিত হলাম মহামন্ত্রে। কারণ বিপ্লবীদের সশস্ত্র অভ্যুত্থান লক্ষ প্রাণের চিরনিবেদনও সমাহারের স্তরে পৌঁছায় না। সেখানে শত্রুর সঙ্গে আপসের কোনো পথ খোলা থাকে না। সেখানে একমাত্র সমাধানের পথ—সংগ্রাম। শত্রুর সঙ্গে আপস একমাত্র মৃত্যুতে, বেঁচে থাকতে নয়। শোণিত লেখায় একদল ইতিহাস সৃষ্টি করে যায়, অন্যদল পথ বেঁধে যায়, উত্তরসূরীরা সেই পথে রক্তের চিহ্ন ধরে এগিয়ে চলে, একই পথের ওপরে কখনো ঘুরে-ফিরে পাক খায় না—হারিয়ে যায় না। বিপ্লবী ঐতিহ্য যাদের হাতছানি দিয়ে ভবিষ্যতের অনির্দিষ্ট কাঁটাপথে টেনে নিয়ে যায়, যারা আদর্শের হোমাগ্নি-শিখায় যাত্রাপথকে আলোকিত করে, তাদের উত্তরসাধকেরা যাত্রার শেষ কোথায় তা না-জানলেও কখনো মধ্য অঙ্কে অভিনয় শেষ করে না। তারা বৈপ্লবিক চিন্তাধারার পরিপন্থী। তাই পরের দিন সকালে ছুটে গেলাম সেনাবাহিনীর কর্মীনিয়োগ কেন্দ্রে। আবার মনে পড়ে গেল চিরস্মরণীয় মহান বীর বিপ্লবী মাস্টারদা সূর্য সেনের কথা। তিনি বলেছিলেন, 'ভারতবর্ষে বর্তমানে একমাত্র শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত কীভাবে মৃত্যু-বরণ করতে হয় এবং তা শেখানোর একমাত্র পথ হল নিজেদের মৃত্যুবরণ করা।'

২৩ মার্চ ১৯৪৩ সাল। কোনোরকমে মুখে কিছু গুঁজে তাড়াহুড়ো করে সকাল দশটার মধ্যে সামরিক কর্মীনিয়োগ কেন্দ্রে এসে উপস্থিত হলাম। বিরাট তাঁবুর প্যাণ্ডেল করে (বর্তমানে যেখানে গান্ধীজীর প্রস্তর-মূর্তি শোভা পাচ্ছিল সেই চৌরঙ্গী-পার্ক স্ট্রিটের মোড়ের গা ঘেঁষে একটু উত্তর-পশ্চিম দিকে বড় মাঠে) কর্নেল লাহিড়ী বসে আছেন। সঙ্গে কিছু লোকজনও বসে আছে তাঁকে ঘিরে। বিস্তীর্ণ তাঁবুর প্যাণ্ডেলে ক্ষুধার্ত-শীর্ণ আঠারো থেকে বিশ/বাইশ বছরের যুবকদের ভিড়। তিলধারণের জায়গা নেই। কিছু কিছু ভাল স্বাস্থ্যের যুবকও ছিল। ঐ বয়সের মেয়েদের সংখ্যাও কম ছিল না। তাঁবুটা ভরে গেছে সৈন্যবিভাগে কর্মপ্রার্থীদের দ্বারা। ১৩৫০ সালের মন্বন্তরের ছাপ ঐ বিরাট তাঁবুর গায়ে এসে লেগেছে। দূর থেকে মনে হল বিরাট এই তাঁবুর প্যাণ্ডেল যেন পঞ্চাশের মন্বন্তরের ক্ষুদ্র প্রতিচ্ছবি।

বেলা ক্রমে বেড়ে যাচ্ছে ; সকলেই উদগ্রীব। অনেকেই ক্ষুধায় কাতর। বেলা একটা নাগাদ কর্নেল লাহিড়ী আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, যাদের খিধে পেয়েছে, তারা যেন বেশি বেশি করে জল খেয়ে নেয়। কাছেই জলের কল ছিল। অনেকেই পেট ভর্তি করে জল খেয়ে নিল। আমিও খেলাম। পরে বুঝতে পারলাম এই জল খাওয়ার উদ্দেশ্য কী। সামরিক বিভাগে চাকরি নিতে হলে কম-পক্ষে ৪৫ সের (পূর্বের হিসেব মত) শরীরের ওজন হওয়া চাই-ই। তা না হলে চাকরি হবে না। ঐ জল খাওয়ায় যার যেটুকু ওজনের অভাব ছিল তা পূর্ণ হল। সবাই যখন এসে গেল, কর্নেল লাহিড়ী সকলকে লাইন করে দাঁড়াতে বললেন। মেয়েদের আলাদা লাইনে দাঁড়াতে হল। মৃত্যুপণ করা তরুণ তরুণীর দল। 'কার আগে প্রাণ কে করিবে দান, তারই লাগি কাড়াকাড়ি' করে যেন সবাই লাইন করে দাঁড়াতে ব্যস্ত। সবাই লাইনে দাঁড়ালাম। তিনি (মিঃ লাহিড়ী) সবার সামনে এসে ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলেন। এই হল প্রাথমিক পরীক্ষা। পরে এক এক করে সকলের শরীরের ওজন নিলেন তিনি। কিন্তু, কী আশ্চর্য, তিনি কোনো প্রার্থীকেই নিরাশ করলেন না। সত্যিই অমায়িক ও উদার প্রকৃতির লোক ছিলেন। আমরা এতটা আশা করি নি। অথচ তিনি একজন প্রাক্তন সামরিক অফিসার, কর্নেল লাহিড়ী নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি সকলকেই নির্বাচন করলেন এবং তাঁর নির্বাচনই ছিল চূড়ান্ত।

এর পর ফর্ম পূরণের পালা। নির্বিঘ্নেই সব চুকল। সেখানে এমন অনেক প্রার্থীই ছিল যাদের সামরিক বিধি অনুযায়ী চাকরি হওয়া উচিত নয়। কিন্তু কর্নেল লাহিড়ীর দৌলতে তারা চাকরি পেয়ে গেল।

বেলা পড়ে এসেছে। প্রায় চারটা নাগাদ ফোর্ট উইলিয়ামের হেড-কোয়ার্টারে আমাদের নিয়ে যাওয়া হল মেজর জেনারেলের কাছে। আমাদের সবাইকে ফোর্টের বিশ্রামঘরে বসানো হল। ভেতরে আমাদের জন্যে সবাই যেন ব্যস্ত। সর্টিং হচ্ছে প্রত্যেকের বিভাগগুলো এবং র‍্যাঙ্কগুলো। বলা বাহুল্য পূর্বে সেই একই স্থানে স্থল, নৌ এবং বিমানবাহিনীর লোক নিয়োগ করা হত। অন্তত ঐ সময়ে তাই দেখেছি। বর্তমানে তা আলাদাভাবে পৃথক পৃথক স্থানে হচ্ছে। অবশ্য ট্রেনিংয়ে সকলকেই থাকতে হবে।

ফোর্ট উইলিয়ামের শোভা দেখছি। স্পষ্ট দেখা যায় হলঘর থেকে। সত্যিই দেখবার মত। মনে পড়ে গেল ফোর্ট উইলিয়ামের ইতিহাস। আর ভাবছি, আমি আমার দেশেই আজ পরবাসী। সঙ্গে সঙ্গে ভেসে উঠল দেশমাতৃকার শৃঙ্খল-মূর্তি। মনে হল, জাতির আত্মিক বল যেন জেগেছে। দাসত্ব থেকে মুক্তির জন্যে বিপ্লবীদের কী দুঃসাহসিক পরিকল্পনা! জাতির অমিত-প্রাণ এই মুক্তিপাগল তরুণেরা বিদেশী দস্যুদের প্রভুত্বের ক্ষুধিত লালসাকে মৃত্যুর কালানলে পুড়িয়ে মারতে চায়। কবিও গেয়েছেন :

'ওরা দু'পায়ে দলে মরণ শংকারে
সবারে ডেকে গেল শিকল ঝংকারে।'

রাণাপ্রতাপ, শিবাজী, পৃথ্বীরাজ, পুরুর বীর আত্মা তো মাস্টারদা সূর্য সেন, ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী, কানাইলালকেও জন্ম দিয়েছিল। পরিশেষে নেতাজীও তো মহান বিপ্লবের ও বীরত্বের গরিমার অগ্নিশিখা জ্বেলে রেখেছেন। তাঁদেরই তো আমরা বংশধর, জাতির স্বার্থে নিশ্চয়ই আমাদের দায়িত্ব বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে বইকি। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের রক্তে তর্পণ করব জালিয়ানওয়ালাবাগের অমর শহিদদের শান্তির জন্যে—দেশমাতৃকার বেদিমূলে আত্মবিসর্জন দিয়ে। অতীতের ভুলভ্রান্তির, জাতির ক্ষমাহীন কাপুরুষতার প্রায়শ্চিত্ত করব—এই প্রতিজ্ঞা, এই মৃত্যুপণ সংকল্প আমাদের অন্তরে। তাই সংগ্রামের প্রাক্ ঐতিহাসিক মুহূর্তে সংকল্প নিলাম এবং তা উদাত্তকণ্ঠে স্বাভাবিকভাবেই উচ্চারিত হল :

'উদয়ের পথে শুনি কার বাণী,
ভয় নাই ওরে ভয় নাই ;
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান,
ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।'

হঠাৎ এই সুখ-স্বপ্ন ভেঙে দিয়ে একজন ল্যান্স নায়েক হাঁক দিল, চা-পাটি খেয়ে নিতে। দু'টো পরোটা ও এক মগ করে চা পাওয়া গেল। ক্ষিধের জ্বালায় আমরা অনেকেই কষ্ট পাচ্ছিলাম। পরোটা দু'টো গোগ্রাসে খেয়ে নিয়ে আরামে চা পান করতে লাগলাম।

সন্ধ্যা নেমে এল ফোর্ট উইলিয়ামের মাথায়। আলোছায়ার মাঝখানে দূর থেকে রূপসী গঙ্গাকে দেখা যাচ্ছিল। ফোর্ট উইলিয়ামের পরিণত গাছগুলো যেন তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। কিন্তু সে তো মায়াবিনী, মায়াজাল দিয়ে ঘিরে রাখে, সহসা ধরা দেয় না। একেই হয়ত বলা হয়ে থাকে নিয়তির খেলা।

রাত্রি সাড়ে সাতটায় সামরিক ট্রাকে আমাদের হাওড়া রেল স্টেশনে সামরিক ট্রেনে তোলা হল। জানি না, কোথায় নিয়ে যাচ্ছে। সামরিক বিধি-আইনে পূর্বে কোনো খবর নেওয়া বা দেওয়া আইনবিরুদ্ধ কাজ। তবে গুপ্তচর-বাহিনীর বেলায় আলাদা নিয়ম আছে। সামরিক ট্রেন ঘন অন্ধকার ভেদ করে ছুটে চলেছে। জানালা দিয়ে বাইরের অন্ধকার দিগন্তের পানে তাকিয়ে আছি। অব্যক্ত অসীম উদার নৈসর্গিক প্রকৃতির শোভা নিরীক্ষণ করছি। অন্ধকার অসীম সত্তা আজ আমার কাছে সসীম হয়ে যেন ধরা দিতে চাইছে। অজানায়ও যে আনন্দ আছে তা এবার আমার কাছে ধরা পড়ল।

তিনদিন ধরে একনাগাড়ে ট্রেন চলেছে। বিরতি কোথাও পেলাম না। ট্রেনে দু'বার করে খাবার দেওয়া হচ্ছে। সেই একই খাদ্য যা পেয়েছিলাম প্রথমদিন ফোর্ট-উইলিয়ামে। চতুর্থ দিন অর্থাৎ ২৬ মার্চ (১৯৪৩ সাল) ভোর বেলায় আমাদের

ট্রেন এসে পৌঁছল বোম্বেতে। সেখান থেকে সামরিক ট্রাকে করে শহরের মধ্য দিয়ে আমাদের নিয়ে যাওয়া হল নৌবাহিনীর ক্যাসেল ব্যারাকে। ভোরের আবছা আলোতে ছিমছাম শহরটিকে দেখতে পেলাম। ফাঁকা রাস্তায় তখন সবেমাত্র দু একজন লোক নেমে এসেছে। সকলেই আত্ম-গরিমায় ভরা সামরিক জাঁকজমক দেখতে দেখতে পথ চলেছে। আর মনে মনে ভাবছে হয়তো তাদের অদৃষ্টের কথা। কিন্তু হেসেছিল রাস্তার ওপরে দাঁড়ানো ইটের পাঁজরের শক্ত দেয়ালগুলো। মনে হল যেন বলছে, দেয়ালের লিখনগুলো ভাল করে পড়বে। কাল চলে কালের স্রোতে মহাকালে মিলিত হবে বলে। মহাকাল যে তোর সম্মুখে!

ট্রেনে বসে কিছু কিছু আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে সম-আদর্শে বিশ্বাসী দু' একজন বন্ধুও জুটে গেল। জুনিয়ার কমাণ্ডিং অফিসার সুবলচন্দ্র ধরের সাথেই আমি বেশি করে যোগসূত্র রাখতে লাগলাম। পূর্বেই বোধহয় আমাদের আগমনের খবর দেওয়া হয়েছিল। নতুবা সময়মত বেলা ১১টায় এতজন লোকের খাবার পেলাম কী করে? খাবার যে নিকৃষ্ট ধরনের তার প্রমাণ প্রথমেই পেয়ে গেলাম।

ক্যাসেল ব্যারাকে বড় বড় হলঘর। এক-একটা ঘরে আড়াইশ' থেকে তিনশ' করে লোক ধরে। আমার আস্তানা একটা হলঘরে ঠিক করে নিয়ে খাটিয়ার ওপরে আরাম করে বসে পড়লাম। আমরা নতুন লোক, নতুন পরিবেশে এসে পড়েছি। তার ওপরে সামরিক নিয়ম-কানুন বিষয়ে আমরা তো একেবারেই নবিস। কখন কী আদেশ আসবে, তার অপেক্ষায় থাকতে হচ্ছে। তবে ভরসা এইটুকু যে, আমাদের এখন ট্রেনিং চলছে। যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রবর্তী বাহিনী করে নিশ্চয় এখনই পাঠাবে না। তা হতে পারে ব্যাটলফিল্ড ট্রেনিং শেষ হওয়ার পরে। তার এখনো সাত-আট মাস বাকি।

ক্রমে ক্রমে একজন দু'জন করে লোকের সঙ্গে পরিচিতি লাভ করছি। অবসর সময়ে ঘুরে ঘুরে ব্যারাকের অভ্যন্তরের পরিস্থিতি-বিষয়ে ওয়াকিবহাল হবার চেষ্টা করছি। কেননা, আমি তো নিছক চাকরি করার জন্যেই এখানে আসি নি। চাকরির চেয়েও বড় কাজের দায়িত্ব নিয়ে এখানে এসেছি। সে-দায়িত্ব হল ব্রিটিশকে উৎখাত করা এবং তা সম্ভব সামরিক বিভাগে সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘটিয়ে, তা তো ভুললে চলবে না। সপ্তাহে একদিন করে ছুটি পেতাম। (যুদ্ধক্ষেত্রে অবশ্য এই ছুটি থাকে না)। তাই সকল বিষয় জানবার চেষ্টা করতে সুযোগমত গেট অফিসারের অনুমতি নিয়ে শহরে বেরিয়ে যেতাম, অবশ্যই পূর্ব-নির্দেশিত গোপন সংস্থার সাথে যোগাযোগ করতে।

১৯৪২ সালের 'ভারত ছাড়ো', ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সেই চরমপত্রের বিষয়ে রেটিংরা (নৌবাহিনীর সৈন্যরা) যে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল, তা ঠিক বলা চলে না। তারাও সেই আন্দোলন সম্বন্ধে চিন্তা করত, ভাবত। ভাবত এই জন্যে যে, যাঁরা ঐ আন্দোলনে প্রাণ দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই তো ওদের মা-বাবা,

ভাই-বোন ছিলেন। অনেক রেটিংয়ের আপন ভাই-বোন মারা গেছেন, অনেক রেটিংয়ের নিকট আত্মীয়স্বজন পুলিশ ও সৈন্যের গুলিতে প্রাণ দিয়েছেন,—এই খবর তাদের কাছেও পৌছেছে। তা ছাড়া, রেটিংরা তো ঐ সাধারণ ঘর থেকেই এসেছে। ওদের মধ্যেও তাই নাড়ির টান রয়েছে। ক্যাসেল ব্যারাকের প্রতি ঘরে ঘরে তারই আলোচনা, তারই কানাকানি। রেটিং নিত্যশিবম আর রেটিং রফিকুল মোল্লা কান্নায় ভেঙে পড়ে বলছিল তাদের দু'জনের দু'ছেলেই বোম্বে শহরের বুকে সৈন্য এবং পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারিয়েছে। রেটিং ওয়ালেকর-এর দেশের বাড়ি পুলিশ জ্বালিয়ে দিয়েছিল। তার বাড়ির লোকদের অপরাধ, '৪২-এর আন্দোলনের দু'জন ফেরার আসামীকে নাকি পুলিশ ঐ বাড়ির দিকে দৌড়িয়ে যেতে দেখেছিল। সেই বাড়ি তন্ন তন্ন খুঁজেও যখন পেল না তখন রাগে জ্বলে উঠে প্রতিহিংসা পূরণ করল হতভাগ্য ওয়ালেকর-এর বাড়ির লোকজনদের বেদম প্রহার করে। তাতেও জিঘাংসা যখন পূর্ণ হল না তখন বাড়িটাকে সম্পূর্ণভাবে আগুন জ্বালিয়ে বহ্ন্যুৎসব পালন করল। রেটিং আসাদ আলি সান্ত্বনা দিয়ে বলল, 'ওহে ভায়া, আর কতদিন শালারা আমাদের দেশকে জ্বালিয়ে খাবে? দিন ফুরিয়ে এসেছে। নেতাজী তে আ গিয়া, আ গিয়া।' কথাগুলো সে হিন্দিতেই বলেছিল। স্পষ্ট দেখতে পেলাম নেতাজী যে আসবেনই—এই জ্বলন্ত বিশ্বাস তার চোখে-মুখে ফুটে বেরচ্ছে।

এই সময়েই সাক্ষাৎ লাভ করলাম মালয়, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া থেকে আগত কয়েক শ' আহত নৌ-সৈন্যের, যারা সাময়িকভাবে ক্যাসেল ব্যারাকে এসেছে। তাদের ভাল চিকিৎসার জন্যে বড় সামরিক হাসপাতালে পাঠানো হবে। কিন্তু হাসপাতালে জায়গার অভাব থাকায় সেখানে যেতে তাদের দু'দিন দেরি হবে। তাই এই ব্যারাকে দু'দিন থাকতে হচ্ছে। তাদের সাথে আলাপ করে জানতে পারলাম যে, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ১৯৪১ সালের ২৬ জানুয়ারি কলকাতার বাসগৃহ হতে অন্তর্হিত হয়ে গুপ্তভাবে আফগানিস্তান হয়ে রাশিয়ায় ও বার্লিন যান এবং ১৯৪৩ সালে মালয় ও ব্রহ্মদেশে আসেন। পরে বিস্তারিতভাবে জানা গেল যে, সুভাষচন্দ্র বসু ১৯৪১ সালের ১৮ মার্চ সেনর অরল্যাণ্ডো ম্যাজোটা নাম গ্রহণ করে ইতালিয়ান দূতাবাসের সাহায্যে ইয়োরোপে যাত্রা শুরু করেন। তার প্রমাণ দিয়েছেন জার্মানীর বৈদেশিক দপ্তরের তখনকার দায়িত্বশীল কর্মী ডাঃ আলেকজান্দার হের্থ। তিনি লিখেছেন, 'At the Italian Legation in Kabul there happened to be a vacant position for an official wireless operator with diplomatic status. This position including a diplomatic passport in the name of Orlando Mazzota was taken over by Netaji.' [*Netaji in Germany*, Alexander Werth; P. 12]

সরকারিভাবে রাশিয়া কিছু না করলেও সুভাষের সঙ্গে তাদের ব্যবহার কিন্তু

খুবই হৃদ্যতাপূর্ণ ছিল। সুভাষের ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকেও তাদের দৃষ্টি ছিল অত্যন্ত সজাগ। প্রত্যক্ষভাবে অপেক্ষাকৃত বেশি কিছু করা সত্যিই সেদিন সম্ভব ছিল না রাশিয়ার পক্ষে। কিন্তু পরোক্ষভাবে সেদিন যেটুকু তারা করেছিল, তার মূল্য কিন্তু কোনো অংশেই কম নয়। তাদের সহযোগিতা না পেলে সুভাষের পক্ষে বার্লিন যাওয়া সম্ভব হতই না। রাশিয়া জানত সেনর অরল্যাণ্ডো ম্যাজোটা কে ছিলেন। মস্কোর জার্মান দূতাবাসের সামরিক গোয়েন্দা-বিভাগের অধিকর্তা সেদিন সুভাষের ব্যাপারে রাশিয়ার মনোভাব সম্বন্ধে বার্লিনে যে-রিপোর্ট পাঠিয়েছিলেন, তা থেকেই পরিষ্কার সব বোঝা যাবে। তাতে বলা হয়েছে : 'In Moscow no official cognizance had been taken of his presence, but the Russians had done everything they could to make his stay there a pleasant one. Revolution in India fitted their plans excellently.' [(German Military Intelligence Service for East in the charge of Paul Leverkuehn) : *Netaji in Germany*, Alexander Werth ; P. 181]

নেতাজী যে প্রথমে কাবুল থেকে রাশিয়াতেই গিয়েছিলেন তার আরো অনেক প্রমাণ রয়েছে কলকাতার 'নেতাজী রিসার্চ ইনস্টিটিউটে'। তাছাড়া ঐতিহাসিক অনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'সমগ্র ভারতের ইতিহাস-'এ এ-ব্যাপারে একই মন্তব্য করেছেন। তাতেও স্বীকার করা হয়েছে যে, সুভাষচন্দ্র বসু কাবুল থেকে প্রথমেই রাশিয়ায় যান এবং সেখান থেকে ইতালি হয়ে বার্লিনে যান। এ-বিষয়ে কারোর কোনো সন্দেহ থাকা উচিত নয়। জাপানী সাম্রাজ্যবাদীরা তখন এই অঞ্চলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের উৎখাত করে ফেলেছিল। এখানে এসে ব্রিটিশের অধীন ভারতীয় সৈন্য যারা জাপানের হাতে বন্দি হয়েছিল তাদের নিয়ে তিনি 'আজাদ হিন্দ ফৌজ' (আই এন এ—ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি) গড়ে তোলেন। আসামে ব্রিটিশের সাথে লড়াই করেন এবং বীরত্বের সাথে লড়াই করে ব্রিটিশ-অধিকৃত অনেক দেশ জয় করে নিয়েছেন। দেখলাম, আহত হওয়া সত্ত্বেও তারা এই সংবাদ বলার সময়ে সাময়িক-ভাবে হলেও খুবই আনন্দিত এবং গর্বিত। বিশেষ করে কেবল্ সিম্যান মোবারক হোসেন তো খুবই গর্বিত। আস্তে আস্তে এই খবর ছড়িয়ে পড়ল এক ব্যারাক থেকে অন্য ব্যারাকে। তা থেকে ক্রমে 'তলোয়ার' জাহাজের পরিবহণ সংস্থায়। সেখান থেকে বোম্বের সমুদ্রতীরে অবস্থিত সিগন্যাল স্কুল এইচ এম আই এস (হিজ ম্যাজেস্টিস ইণ্ডিয়ান শিপ) 'তলোয়ার' জাহাজে এবং ক্রমে ক্রমে আম্বর সাগরে অবস্থিত অন্যান্য জাহাজেও এই খবর ছড়িয়ে পড়ল। সৈন্যরা এখন মনে করতে আরম্ভ করল যে, তারাও 'আজাদ হিন্দি' (স্বাধীন ভারতীয়)।

এই প্রসঙ্গে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের বিষয়ে কিছু আলোকপাত করলে তা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম সেরা ছাত্র সুভাষচন্দ্র বসু ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে ইস্তফা দিয়ে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের সাথে রাজনীতিতে যোগ দিয়েছিলেন। ভারতের জাতীয় উদ্দেশ্যের প্রতি তাঁর আনুগত্যের বিষয়ে কেউ কথনো সন্দেহ না করলেও, উচ্চতর কংগ্রেস নেতৃত্বের ঘোষিত নীতির সাথে তাঁর প্রায়শই মতানৈক্য ঘটত। ১৯২৮ সালে কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে তিনি পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি তোলেন, অথচ কংগ্রেস চাইল ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস। ১৯২৯ সালে লাহোর অধিবেশনে তিনি অধিবেশন-গৃহ ত্যাগ করে 'কংগ্রেস ডিমোক্র্যাটিক পার্টি' নামে এক নতুন দল গঠন করলেন। ১৯৩৪ সালে মহাত্মা গান্ধী আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ করে দিলে সুভাষচন্দ্র একে ব্যর্থতার স্বীকৃতি বলে অভিহিত করলেন। মতামতে রক্ষণশীল না হলেও ১৯৩৮ এবং ১৯৩৯ সালে পুনর্বার তিনি কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। কিন্তু উচ্চতর কংগ্রেস নেতৃত্বের সাথে মতবিরোধের ফলে তাঁকে বাধ্য হয়ে কংগ্রেস-সভাপতি পদে ইস্তফা দিয়ে 'ফরোয়ার্ড ব্লক' নামে এক নতুন দল গঠন করতে হয়।

১৯৪১ সালের ২৬ জানুয়ারি কলকাতার বাসগৃহ হতে তিনি অন্তর্হিত হন এবং গুপ্তভাবে আফগানিস্তান হয়ে বার্লিন ও রাশিয়ায় যান। ১৯৪৩ সালে তিনি মালয় ও সিঙ্গাপুরে আসেন। জাপানী সাম্রাজ্যবাদীরা তখন এই অঞ্চলের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের উৎখাত করে ফেলেছিল। এখানে এসে তিনি আজাদ হিন্দ ফৌজ গড়ে তোলেন এবং আসামে ব্রিটিশের সাথে লড়াই করেন। জাপানীদের হাতে বন্দি প্রধানতঃ ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর ভারতীয় সৈন্যদের নিয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠিত হয়েছিল। প্রিয়তম নেতাজীর নেতৃত্বে সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িক বিভেদ ভুলে এই সৈন্যগণ ভারতের মুক্তি অর্জনের জন্য প্রাণোৎসর্গ করেছিলেন। আসাম থেকে বৃটিশ ফৌজকে হটাবার জন্যে তাঁদের অদ্ভুত বীরত্বের পূর্ণ কাহিনী এখনো লেখা হয় নি। কিন্তু অসম যুদ্ধে তাঁদের অনিবার্য পরাজয় ঘটে এবং ব্রিটিশ ব্রহ্মদেশ পুনরধিকার করবার পর এই বাহিনীর অবশিষ্ট সৈন্য ব্রিটিশের হাতে বন্দি হয়। ১৯৪৫।৪৬ সালে আজাদ হিন্দ ফৌজের এই বীরদের সামরিক আদালতে বিচার হয় এবং অনেকেই দণ্ডাদেশ প্রাপ্ত হন। কংগ্রেস তখন সমর্থনে এগিয়ে আসে এবং সুপ্রসিদ্ধ ব্যবহারজীবীদের দ্বারা তাঁদের পক্ষ সমর্থন করায়।

১৯৪৫ সালের ২৩ আগস্ট সুভাষচন্দ্র এক বিমান দুর্ঘটনায় রহস্যজনকভাবে মৃত্যুবরণ করেন বলে কথিত আছে। তাঁর সম্পর্কে বলতে গিয়ে এক প্রখ্যাত ইতিহাসকার লিখেছেন, 'বাল্যকাল হতেই তাঁর জীবন ছিল ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ।...(তিনি ছিলেন) অতীন্দ্রিয়বাদ ও বাস্তবতার, অতীব ধর্মানুরাগ ও দৃঢ় বাস্তববোধের, গভীর আবেগবিহ্বলতা ও কঠিন পরিকল্পিত কর্মদক্ষতার এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ।'

সুভাষচন্দ্র বসুর ধর্মানুরাগ কত বিজ্ঞানসম্মত তার নিদর্শন পাওয়া যাবে সুরসম্রাট দিলীপকুমার রায় মহাশয়ের নিকটে মান্দালয় জেল থেকে ৯.১০.২৫

তারিখের ঐক লিখিত পত্রে। ইষ্টপ্রাণতা না থাকলে যে প্রকৃত নেতা হওয়া যায় না—তা অতীব সত্য কথা। পৃথিবীর মহান অবতারগণও বলে গেছেন, 'ইষ্ট নাই নেতা যেই, যমের দালাল কিন্তু সেই।' নেতাজীর অটুট ইষ্টপ্রাণতা ছিল বলেই তো তিনি 'নেতাজী' হতে পেরেছিলেন এবং তা বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতেই। এবারে তাঁর চিঠির পূর্ণ উদ্ধৃতি দিচ্ছি :

ম্যাণ্ডেলে জেল
৯.১০ ২৫

ভাই দিলীপ

এ-কথা কিছুতেই মনে করো না যে, আমার দৃষ্টি নিতান্তই সংকীর্ণ। Greatest good of greatest number—এতে আমি যথার্থই বিশ্বাস করি, কিন্তু সে 'good' আমার কাছে সম্পূর্ণ বস্তুগত নয়। অর্থনীতি বলে, মানুষের যে কোনো কাজই হয় productive, না হয় unproductive; তবে কোন কাজ যে productive, তা নিয়ে অনেক বাগবিতণ্ডা হয়ে থাকে। আমি কিন্তু কারুকলা বা সে-সংক্রান্ত কোনো প্রচেষ্টাকে unproductive মনে করি নে। আর দার্শনিক চিন্তা বা তত্ত্ব-জিজ্ঞাসাকে নিষ্ফল বা নিরর্থক বলে অবজ্ঞা করি নে। আমি নিজে একজন আর্টিস্ট না হতে পারি—আর সত্যি বলতে কি আমি জানি যে তা নই—কিন্তু সেজন্যে দোষী প্রকৃতি বা ভগবান যাই বলো, আমি নই। অবশ্য যদি বলো যে, আর জন্মের কর্মফল এ-জন্মে ভোগ করছি, তাহলে আমি নাচার। সে যাই হোক, এ-জন্মে যে আর্টিস্ট হলুম না তার কারণ, হতে পারলুম না; আর আমার বিশ্বাস, 'শিল্পী জন্মায়, তৈরি করা যায় না,' এ-কথা অনেকটা সত্য। কিন্তু নিজে আর্টিস্ট না হলেই যে আর্ট উপভোগ করা যায় না, এমন কোনো কথা নেই; আর কোনোও কলার সমঝদার হতে গেলে তাতে নিজের যেটুকু পরিমাণ দখল থাকা দরকার, আমার মনে হয় তা প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষেই সুলভ।

দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে এ-আক্ষেপ করো না যে, সংগীত নিয়ে তুমি সময়টা হেলায় কাটিয়ে দিচ্ছ, যখন সেক্সপিয়রের কথায় বলতে গেলে 'The time is out of joint.' বন্ধু, সারা দেশকে সংগীতের বন্যায় প্লাবিত করে দাও, আর যে-সহজ আনন্দ আমরা প্রায় হারিয়ে বসেছি, তা আবার জীবনে ফিরিয়ে আনো। যার হৃদয়ে আনন্দ নেই, সংগীতে যার চিত্ত সাড়া দেয় না, তার পক্ষে জগতে বৃহৎ কি মহৎ কিছু সম্পাদনা করা কি কখনো সম্ভব? কার্লাইল বলতেন, 'সংগীত যার প্রাণে নেই, সে করতে পারে না হেন দুষ্কার্যই নেই।' এ-কথা সত্যি হোক বা না-হোক আমার মনে হয় যার প্রাণে সংগীতের কোনো সাড়া নেই, সে চিন্তায় বা কাজে কখনো মহৎ হতে পারে না। আমাদের প্রত্যেক রক্তকণিকায় আনন্দের অনুভূতি সঞ্চারিত হোক এই আমরা চাই, কারণ আনন্দের

পূর্ণতাতেই আমরা সৃষ্টি করতে পারি। আর সংগীতের মত এমন আনন্দ আর কিসে দিতে পারে ?

কিন্তু আর্ট ও তজ্জনিত আনন্দকে দরিদ্রতমের পক্ষেও সহজলভ্য করতে হবে। সংগীতে বিশেষজ্ঞতার চেষ্টা অবশ্য ছোট ছোট গণ্ডীর মধ্যে চলবে আর সে রকম চর্চা হওয়াও উচিত ; কিন্তু সংগীতকে সর্বসাধারণের উপযোগীও করে তুলতে হবে। বিশিষ্ট সাধনার অভাবে আর্টের উচ্চ আদর্শ যেমন ক্ষুণ্ণ হয়, তেমনি জনসাধারণের কাছে সুগম না-হলেও আর্ট এবং জীবনে বিচ্ছেদ ঘটে, আর তাতে আর্ট নির্জিত ও খর্বই হয়ে যায়। আমার মনে হয় লোকসংগীত ও নৃত্যের (folk music and dancing) ভিতর দিয়েই আর্ট জীবনের সঙ্গে যোগ রাখে। ভারতবর্ষে জীবন ও আর্টের মধ্যে এই যোগটি পাশ্চাত্য সভ্যতা প্রায় ছিন্ন করে ফেলেছে, অথচ তার স্থানে নূতন কোনো যোগসূত্র যে আমরা পেয়েছি, তাও নয়। আমাদের যাত্রা, কথকতা, কীর্তন প্রভৃতি যেন কোনো অতীত যুগের স্মৃতিচিহ্ন মাত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। বস্তুত যদি আমাদের গুণী শিল্পীরা অচিরে আর্টকে পুনরায় জীবনের সঙ্গে সম্বন্ধ-যুক্ত না-করতে পারে, তাহলে আমাদের চিত্তের যে কী দৈন্যদশা ঘটবে, তা ভাবলেও শিউরে উঠতে হয়। তোমার হয়ত মনে আছে তোমাকে আমি একবার বলেছিলাম যে, মালদায় 'গম্ভীরা' গানের সৌন্দর্যে আমি অত্যন্ত মুগ্ধ হয়েছিলাম। তাতে সংগীত ও নৃত্য উভয়ই ছিল। বাংলায় অন্যত্র ও-রূপ জিনিস কোথাও আছে বলে তো আমি জানি নে ; আর মালদাতেও ওর মৃত্যু শীঘ্রই অবশ্যম্ভাবী, যদি নূতন করে প্রাণশক্তি ওতে সঞ্চারিত করবার চেষ্টা না হয়, আর বাংলার অন্যান্য স্থানেও ওর প্রচলন না হয়। বাংলাদেশে লোকসংগীতের উন্নতিকল্পে মালদায় তোমার শীঘ্রই যাওয়া উচিত। গম্ভীরার মধ্যে জটিল বা বিশাল বা মহৎ কিছুই নেই,—তার গুণই এই যে, তা সহজ, সাদাসিধে। আমাদের নিজস্ব folk music ও folk dancing একমাত্র এই মালদাতেই এখনো বেঁচে আছে, আর সেই হিসেবেই গম্ভীরার যা মূল্য। সুতরাং যারা ও-প্রকার সংগীত ও নৃত্য পুনর্জীবিত করতে চান তাঁদের মালদা থেকে কাজ আরম্ভ করাই সুবিধা।

লোকসংগীত ও নৃত্যের দিক থেকে বর্মা এক আশ্চর্য দেশ। খাঁটি দিশি নাচ ও গান এখনো পুরোদমে এখানে চলছে, আর সুদূর পল্লিতে পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ লোককে আমোদ-আহ্লাদের খোরাক জোগাচ্ছে। ভারতীয় সংগীতের বিভিন্ন পদ্ধতিগুলি অনুশীলন করার পর, তুমি যদি ব্রহ্মদেশের সংগীতের চর্চা করো তো মন্দ হয় না। সে-সংগীত হয়ত তত সূক্ষ্ম বা উন্নত নয়, কিন্তু দরিদ্র ও অশিক্ষিতকেও আনন্দ দান করবার যে-ক্ষমতা তার আছে, আপাতত আমি তাতেই আকৃষ্ট হয়েছি। শুনি নাকি এখানকার নাচও বড় সুন্দর। বর্মায় জাতিভেদ না-থাকাতে এখানকার শিল্পকলার চর্চা কোনো শ্রেণীবিশেষের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নয়। ফলে বর্মায় আর্ট চারিদিকে ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে। বোধহয় এই কারণে, আর লোকসংগীত ও নৃত্যের প্রচলন

থাকায় দরুন ব্রহ্মদেশে ভারতবর্ষের চেয়ে জনসাধারণের মধ্যে সৌন্দর্যজ্ঞান অনেক বেশি পরিণতি লাভ করেছে। দেখা হলে এ-বিষয়ে আরো কথা হবে।

দেশবন্ধুর সম্বন্ধে তোমার সঙ্গে আমি একমত। আমিও সম্পূর্ণ মানি যে, অনেক সময় সমাজ বা রাষ্ট্রের বৃহৎ ক্ষেত্রের চেয়ে জীবনের ছোটখাটো ঘটনায় মানুষের মহত্ত্ব ঢের বেশি প্রকাশ পায়। দেশবন্ধুর ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে পরিচিত হয়েছিলাম বলেই তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা ভক্তি ভালবাসা জন্মেছিল—দেশনেতা-রূপে তাঁর অনুগামী ছিলাম বলে নয়। তাঁর বেশির ভাগ ভক্তেরও ঠিক আমার মতই হয়েছিল। বস্তুত সহকর্মী ও অনুগামী ছাড়া তাঁর অন্য কোনো পরিজন ছিল না বললেই হয়। আমি তাঁর সঙ্গে জেলে আট মাস একসঙ্গে ছিলাম—দু'মাস পাশাপাশি ঘরে, আর ছ'মাস একই ঘরে। এইরূপে তাঁকে সম্পূর্ণ ঘনিষ্টভাবে জানবার সুযোগ পেয়েছিলাম,—তাই তো তাঁর পদতলে আশ্রয় নিয়েছিলাম।

তুমি শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে যা লিখেছ তার সবটা না হলেও বেশির ভাগই আমি মানি। তিনি ধ্যানী—আর মনে হয়, বিবেকানন্দের চেয়েও গভীর, যদিও বিবেকানন্দের প্রতি আমার শ্রদ্ধা প্রগাঢ়। আমিও তোমার কথায় সায় দিই যে, নীরব ভাবনা, কর্মবিহীন বিজন সাধনা সময়ে সময়ে দরকার হয়, এমন কি দীর্ঘকালের জন্যও। কিন্তু আশঙ্কা এই যে, সমাজের বা দেশের জীবনস্রোত থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখলে মানুষের কর্মর দিকটা পঙ্গু হয়ে যেতে পারে, আর তার প্রতিভার একপেশে বিকাশের ফলে সে সমাজবিচ্ছিন্ন অতিমানুষের মতন উদ্ভট কিছু একটা হয়ে উঠতে পারে। অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন দু'চারজন প্রকৃত সাধকের কথা অবশ্য আলাদা, কিন্তু বেশির ভাগ লোকের পক্ষে কর্ম বা লোকহিতই সাধনার একটা প্রধান অঙ্গ। নানা কারণে আমাদের জাতির কর্মের দিকটা শূন্য হয়ে এসেছে, তাই এখন আমাদের দরকার রজোগুণের **double dose**। সাধক বা তাদের শিষ্যদের মধ্যে অতিরিক্ত চিন্তার ফলে ইচ্ছা ও কর্মশক্তি অসাড় যদি না হয়ে যায় তা হলে নির্জনে ধ্যান যতদিনের জন্যে তারা করে করুক, আমি তাদের সঙ্গে ঝগড়া করতে যাবো না। কিন্তু আমরা যেন **'sicklied o'er with the pale cast of thought'** না হয়ে পড়ি। সাধক নিজে হয়ত সর্ববিধ তামসিক প্রভাব এড়িয়ে চলতে পারে, কিন্তু তার চেলারা? গুরুর সাধন-পদ্ধতি কি সজ্ঞানে না হোক অজ্ঞানে তাদের কোনো অনিষ্ট করবে না?

আমি এ-কথা সম্পূর্ণ মানি যে প্রত্যেকেরই নিজের ক্ষমতার পূর্ণ বিকাশ করবার চেষ্টা করতে হবে। নিজের মধ্যে যা সর্বোৎকৃষ্ট, তার দানই হচ্ছে প্রকৃত সেবা। আমাদের অন্তর প্রকৃতি, আমাদের স্বধর্ম যখন সার্থকতা লাভ করে, তখনই আমরা যথার্থ সেবার অধিকারী হই। এমারসনের কথায় বলতে গেলে নিজের ভেতর থেকেই আমাদের গড়ে উঠতে হবে; তাতে আমরা সকলেই যে এক পথের পথিক হব এমন কোনো কথা নেই, যদিও একই আদর্শ হয়ত আমাদের অনুপ্রাণিত করবে। শিল্পীর

সাধনা কর্মযোগী সাধনা থেকে ভিন্ন, তপস্বীর যে-সাধনা বিদ্যার্থীর সে-সাধনা নয়; কিন্তু আমার মনে হয় এ-সকলের আদর্শ প্রায় একই। গোলাকার ব্যক্তিকে চতুষ্কোণ গর্তের মধ্যে পুরতে আর যে-ই চা'ক না কেন, আমি কখনই চাই নে। নিজের প্রতি সত্য হলে বিশ্বমানবের প্রতি কেউ অসত্য হতে পারে না। তাই আত্মোন্নতি ও আত্মবিকাশের পথ নিজের প্রকৃতিই দেখিয়ে দেবে। প্রত্যেক ব্যক্তি যদি নিজের শক্তি ও প্রকৃতি অনুসারে নিজেকে সার্থক করে তুলতে পারে, তাহলে অচিরেই সমগ্র জাতির নবজীবন দেখা দেয়। সাধনার অবস্থায় হয়ত মানুষকে এমনভাবে জীবন যাপন করতে হয়, যাতে তাকে বাইরে থেকে স্বার্থপর বা আত্মসর্বস্ব মনে হতে পারে। কিন্তু সে-অবস্থাতে মানুষ বিবেকবুদ্ধির দ্বারা চালিত হবে, বাইরের লোকের মতামতের দ্বারা নয়। সাধনার ফল যখন প্রকাশিত হবে, তখনই লোকে স্থায়ী বিচার করবে। সুতরাং আত্মবিকাশের সত্যপথ যদি অবলম্বন করা হয়ে থাকে, তাহলে লোকমত উপেক্ষা করা যেতে পারে। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, তোমার সঙ্গে আমার মতের যে বিশেষ পার্থক্য আছে, তা নয়। ইতি

তোমার স্নেহবদ্ধ
সুভাষ

আবার জেল থেকে চিকিৎসার জন্যে যখন ভিয়েনায় যাচ্ছেন তখন ৫. ৩. ৩৩ তারিখে তাঁর পরম প্রীতিভাজন দিলীপ রায়ের নিকট ইংরাজীতে একখানা চিঠি দিলেন। সেখানেও তাঁর দৃঢ় ধর্মীয় চেতনার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। পাঠক-পাঠিকাদের জ্ঞাতার্থে সেই চিঠির পূর্ণ উদ্ধৃতি এখানে দেওয়া হল :

LLOYD TRIESTINO Pfo., Gange
5. 3. 33

My dear Dilip

I have not written to you for a long time though you have been good enough to write to me. You see, I was passing through a species of mental torture, owing to repeated pinpricks of the Government and, till the last, I was not sure at all that I would be able to leave for Europe for treatment. Owing to the vindictive policy of the Govt. it was not possible for me to meet my parents or my friends. Only a few near relatives were allowed to interview me in Jubbulpore Jail. Many friends came from distant places to Bombay to interview me, but they had to return disappointed. The police officers who escorted me up to the boat, surrounded me like a pack of

hounds till the ship actually sailed from the harbour. These pinpricks which continued till the moment of sailing from Bombay caused me intense pain.

However, I do not think I should worry you with these petty affairs. It was so good of you to feel so keenly for me all the time that I was suffering in custody. And it was so unexpected—because you are supposed to have 'given up the world' and taken to *yoga*. To be quite frank, my dear Dilip, quite apart from *yoga* and spiritually – your intensely 'human' feeling for me has profoundly moved me. That you – who are supposed to have forgotten all earthly affairs and to have taken leave of your erstwhile friends – should feel so keenly for me and my position – was altogether unexpected.

In one of your letters you asked about my attitude towards *Shiva* – or something to that effect. To be quite frank, I am torn this side and that – between my love for *Shiva*, *Kali*, *Durga* and *Krishna*. Though they are fundamental'y one – one does prefer one symbolism to another. I have found that my moods vary – and according to my prevalent mood, I choose one of the three forms – *Shiva*, *Kali* (*Durga*) and *Krishna*. Among these three, again, the struggle is between *Shiva* and *Shakti*. *Shiva*, the ideal *Yogi*, holds a fascination for me. You see, of late (that is, for last four or five years) I have become a believer in *mantrashakti* by which I mean that certain *mantras* have an intense *shakti* – power. Prior to that, I had the ordinary rationalistic view, *viz.*, that *mantras* are like symbols and they are aids to concentration. But my study of the *tantra* philosophy gradually convinced me that certain *mantras* or বীজমন্ত্র had an inherent *shakti* – and each mental constitution was filled for a particular *mantra*. Since then, I have tried my best to find out what my mental constitution is like and what *mantra* I would be suited for. But so far I have failed to find that out because my moods vary and I am sometimes a *Shaiva*, sometimes a *Shakta* and sometimes a

Vaishnava. I think it is here that the *guru* becomes useful, because the real *guru* knows more about ourselves than we do and he could at once tell us what *mantra* we should take up and which method of worship we should follow.

To come back to matters mundane, I reach Venice tomorrow. From there I proceed to Veinna to consult the doctors. Thereafter I shall probably go to some Swiss sanatorium.

The voyage was fairly pleasant one up to Port Said as the sea was calm. Since passing Port Said we have encountered very rough weather. My troubles (like abdominal pain) are still persisting – but nevertheless I have been feeling somewhat better. Before we reached Port Said I had been feeling decidedly better but the rough weather has upset me since we entered the Mediterranean.

I shall stop here today as the rolling is making writing somewhat difficult. With warmest love,

I am
Ever yours affly.
Subhas

নেতাজীর ইংরাজী চিঠির পূর্ণ বঙ্গানুবাদ নিচে দেওয়া হল :

লয়েড ট্রিয়েস্টিনো পি এণ্ড ও গঙ্গে
৫. ৩. ৩৩

প্রিয় দিলীপ

বহুদিন তোমাকে চিঠি লিখি নি। তুমি অবশ্য পত্র দিতে ভোল নি। তুমি জানো, সরকারের একের পর এক উৎপাতের জন্য আমি এ-যাবত মানসিক যন্ত্রণা নিয়ে দিন কাটাচ্ছিলাম। চিকিৎসার জন্য আমার ইউরোপ যাওয়া সম্ভব হবে কিনা সে-বিষয়ে শেষ মুহূর্তেও আমি নিশ্চিত হতে পারি নি। সরকারের প্রতিহিংসাপরায়ণ নীতির জন্য পিতামাতা কিংবা বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা আমার সম্ভব হয় নি। কয়েকজন মাত্র নিকট আত্মীয় জব্বলপুর জেলে আমার সঙ্গে দেখা করার অনুমতি পেয়েছিলেন। দূর-দূরান্তর হতে বহু বন্ধুবান্ধব বোম্বেতে আমার সাথে দেখা করতে এসেছিলেন ; কিন্তু নিরাশ হয়ে তাঁদেরকে ফিরে যেতে হয়েছিল। জাহাজ বন্দর থেকে ছাড়বার পূর্বক্ষণ পর্যন্ত পাহারাদার পুলিশকর্মচারীরা একদল শিকারি কুকুরের ন্যায় আমাকে ঘিরে রেখেছিল। বম্বে ত্যাগ করবার পূর্ব পর্যন্ত এইসব উৎপাত আমার গম্ভীর মনোবেদনার কারণ হয়েছিল।

যাক, এইসব ছোটখাটো ব্যাপার নিয়ে তোমার মন ভারাক্রান্ত করতে চাই নে। বন্দিদশায় অসুস্থ থাকাকালে সর্বক্ষণ তুমি আমার জন্য ভাবিত ছিলে, এটা তোমার সহৃদয়তারই পরিচয়। এ একান্তই অপ্রত্যাশিত। কারণ, তুমি এক্ষণে সংসার ছেড়ে যোগের পথ ধরেছ। প্রিয় দিলীপ, যোগ ও আধ্যাত্মিকতার কথা বাদ দিয়ে খোলা মনেই বলি, আমার প্রতি তোমার এই 'মানবিক' দরদ ও মমতা আমার মনকে বিশেষভাবে নাড়া দিয়েছে। যে-ব্যক্তি সংসারের সবকিছু ভুলে, এতাবৎকালের সঙ্গীসাথীদের ফেলে দূরে সরে গেছে, সেই লোক আমার ও আমার অবস্থার জন্য এতখানি প্রাণঢালা দরদ পোষণ করবে, এ কোনোক্রমেই যে আমি আশা করতে পারি নি, ভাই!

তোমার পত্রগুলির মধ্যে একখানিতে তুমি শিব কিংবা ঐ রকম কিছু সম্পর্কে আমার মনোভাব জানতে চেয়েছ। খোলাখুলি বলতে গেলে—শিব, কালী, দুর্গা, কৃষ্ণ—এঁদের প্রত্যেকের প্রতিই আমার প্রেমভক্তি আছে, কিন্তু দোদুল্যমান—একবার ইনি, একবার তিনি। যদিও মূলতঃ এরা এক, তবু এক-একজন এক একটি প্রতীক পছন্দ করে। আমি লক্ষ্য করেছি. যে আমার মধ্যে এই সব ভাবের পরিবর্তন ঘটে। মনের বর্তমান অবস্থানুযায়ী আমি শিব, কালী (দুর্গা) ও কৃষ্ণ, এই তিনটির যে-কোনো একটিকে গ্রহণ করি। এই তিনটির মধ্যে আবার শিব ও শক্তিকে নিয়ে দ্বন্দ্ব বাধে। আদর্শ যোগী হিসেবে শিবের প্রতি আমার একটা আকর্ষণ আছে। তুমি জানো, সম্প্রতি (গত ৪/৫ বছর যাবত) আমি মন্ত্রশক্তিতে বিশ্বাসী হয়ে পড়েছি। আমি মনে করি, কোনো কোনো মন্ত্রের মধ্যে অমোঘ শক্তি বর্তমান। ইতিপূর্বে মন্ত্র সম্পর্কে আমার সাধারণ যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। মনে করতাম যে, মন্ত্রগুলি প্রতীকের মত। তা মনঃসংযোগের সহায়ক। কিন্তু তান্ত্রিকদর্শন অধ্যয়নের ফলে ক্রমে ক্রমে আমার দৃঢ় প্রতীতি জন্মেছে যে, কোনো কোনো মন্ত্রের বা বীজমন্ত্রের একটা অন্তর্নিহিত শক্তি আছে। মানসিক গঠন অনুসারে প্রতিটি ব্যক্তির পক্ষে এক-একটি বিশেষ মন্ত্র উপযোগী। তখন থেকে আমি নিজের মানসিক গঠনের স্বরূপ কী এবং আমার সঠিক মন্ত্রটিই বা কী হতে পারে তা জানবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। কিন্তু তা খুঁজে পেতে আমি এ-যাবত ব্যর্থ হয়েছি। কারণ, ভাবের বৈলক্ষণ্য হেতু আমি কখনো শৈব, কখনো শাক্ত এবং কখনো বা বৈষ্ণব। আমার মনে হয়, এইখানটাতেই গুরুর প্রয়োজন। কারণ, প্রকৃত গুরু আমাদের নিজেদের অপেক্ষাও আমাদের বিষয় অধিক জানেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গেই বলতে পারেন, কোন মন্ত্র আমাদের গ্রহণীয় এবং কোন সাধনপদ্ধতি আমাদের উপযোগী।

এইবার পার্থিব জগতে ফিরে আসি। আমি আগামীকাল ভেনিসে পৌঁছাবো। সেখান থেকে ভিয়েনা যাব ডাক্তারদের পরামর্শ নিতে। তারপর সম্ভবতঃ আমি সুইজারল্যাণ্ডের কোনো একটি স্বাস্থ্যনিবাসে চলে যাব।

সমুদ্র শান্ত থাকায় পোর্ট সৈয়দ পর্যন্ত আমার সমুদ্রযাত্রা বেশ আরামদায়কই

ছিল। পোর্ট সৈয়দ পার হওয়ার পর আমাদের খুব দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে পড়তে হয়েছিল। আমার দৈহিক যন্ত্রণাদি (তলপেটের বেদনা) এখনো চলছে। তৎসত্ত্বেও আমি অনেকটা ভাল বোধ করছি। পোর্ট সৈয়দে পৌছবার পূর্ব পর্যন্ত খুব ভাল বোধ করেছিলাম। কিন্তু ভূমধ্যসাগরে প্রবেশের পর দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার জন্য অস্বস্তি বোধ করছি।

এখানেই শেষ করতে হল। জাহাজের দোলানীতে লেখা অসম্ভব করে তুলছে।

আন্তরিক প্রীতিসহ
তোমার চিরপ্রিয়
সুভাষ

এখন আবার আমরা সেই নৌবাহিনীর আলোচনায় ফিরে যাচ্ছি। নৌবাহিনীর সকলেই তখন নিজেদের স্বাধীন ভারতীয় (আজাদ হিন্দি) বলে মনে করতে আরম্ভ করেছিল।

এই সময়ে সমগ্র সেনাবাহিনীতে (স্থল, নৌ ও বিমানবাহিনীতে) ঘটনা-প্রবাহ এমনই ছিল যে, সৈন্যরা নিজেদের দৈনন্দিন অভাব-অভিযোগকে পর্যন্ত আর চেপে রাখতে পারছিল না। নানাভাবে তা ব্যক্ত করতে আরম্ভ করল। একদিন ঘটনাক্রমে কোনো একজন রেটিংয়ের দুপুরের খাওয়ার সময়ে তার প্রয়োজনীয় রান্না-করা ডালের পরিমাণ কমে যাওয়ায় সে মারমুখো হয়ে ছুটে গেল যারা রান্না করছিল সেই রেটিংদের গালাগাল দিতে। সেখানে আবার উপস্থিত ছিল কয়েকজন গোরা সৈন্য। ঐ গোরা সৈন্যদের মধ্য থেকে দু'জন ঐ ক্ষিপ্ত রেটিংকে ধরে তাকে নিরস্ত করবার চেষ্টা করতে থাকে। কিন্তু ফল হল তার উলটো। ঐ ক্ষিপ্ত রেটিংকে গোরা সৈন্যরা ধরে রাখায় অন্যান্য রেটিংরা রেগে গিয়ে একসঙ্গে আক্রমণ করল গোরা সৈন্যদের। একেই তো ছিল নিকৃষ্ট খাবার, তার ওপরে আবার কম। এই আক্ষেপ নিয়ে ছুটে গিয়েছিল রেটিং-বন্ধু তারই সমগোত্রীয় (যারা রান্না-বান্না করছিল সেই রেটিংরা) বন্ধুদের অভিযোগ জানাতে। পথে পেল গোরা সৈন্যদের বাধা। একেবারে সোনায় সোহাগা। লড়াই বাধে আর কি! গোরা সৈন্যরা রাইফেল একবার তুলেও ছিল, কিন্তু কোনো অর্ডার না-পাওয়ায় গুলি চালনা থেকে নিরস্ত থাকল। কিছু হাতা-হাতি হওয়ার পরে গোরা সৈন্যরা স্থানত্যাগ করল। তার পরে আপনা থেকেই রেটিংদের ক্রোধ প্রশমিত হল।

যুদ্ধের দিনগুলির ঘটনাবলী তাদের মনে জাগতে শুরু করেছে। প্রায়ই লক্ষ্য করত যে তারা যখন ব্রিটিশ নাবিকদের (সৈন্যদের) পাশাপাশি কাজ করত তখন গোরা সৈন্যরা পেত পক্ষপাতমূলক বৈষম্য। নৌ-ঘাঁটিতে অথবা যুদ্ধ এলাকাতে তাদের জন্য ভাল ভাল খাবার, ব্যবস্থা ছিল উপযুক্ত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের। তারা চলাফেরা

করত অনেকটা স্বাধীন মত। ইচ্ছা করলেই স্বচ্ছন্দে ক্যান্টিন, মেসের কামরা, স্নানের জায়গা ব্যবহার করতে পারত। কিন্তু অপরদিকে ভারতীয় সৈন্যরা ব্রিটিশ সৈন্যদের তুলনায় সুযোগ সুবিধা বিশেষ কিছুই পেত না। শুধু তাই নয়, ভারতীয় সৈন্যরা যদি ব্রিটিশ অফিসারদের অভিবাদন করতে ভুলে যেত, তবে তার জন্য তাদের কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হত। অপরপক্ষে ভারতীয় অফিসারদের ওরা অভিবাদন না-জানালে কিছুই হত না। এটা দেখা গেছে, ইচ্ছাকৃতভাবে ভারতীয় সৈন্যদের মনে হীনমন্যতার ভাব জাগিয়ে তোলার প্রচেষ্টা ছিল প্রবল।

এই প্রভেদগুলি ছিল খুবই অভদ্র ও অপমানজনক। ব্রিটিশের লোকদের জন্যে, সে বহুদূরের সমুদ্রতীরেই হোক, বা গভীর জঙ্গলেই হোক, ভাল গরম খাবারের ব্যবস্থা, উপযুক্ত যানবাহন এবং অস্থায়ী বসবাসের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হত। অথচ ভারতীয় সৈন্যরা কিছুই পেত না। তাদের কপালে জুটত না বিশেষ কিছুই— অতিকষ্টে কঠোর পরিশ্রম করে কাদায়-বৃষ্টিতে অথবা ঝলসানো রোদে না-খেয়ে কোনোরকমে প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টা করত। ওদিকে কার্যক্ষেত্রে যোগ্যতার বিচারে দেখা গেছে ভারতীয় সৈন্যরা ব্রিটিশ সৈন্যদের তুলনায় অনেক বেশি পারদর্শী। তবুও কিন্তু ভারতীয় সৈন্যদের ওরা (ব্রিটিশ সৈন্যরা) বিদ্রূপ করে বলত, 'অযোগ্য কালা আদমি'। যুদ্ধ চলাকালে ব্রহ্মদেশে ভারতীয় সৈন্যরা এমনভাবে ব্যক্তিগত অবমাননা এবং পার্থক্য বোধ করেছিল যে, ব্রিটিশ সৈন্যদের প্রতি ভারতীয় সৈন্যদের আর এতটুকুও সমবেদনা বা সহানুভূতি অবশিষ্ট ছিল না। সবই যেন উবে গেছে। ফলে, তারা গোরা সৈন্যদের বিদ্রূপ করে 'টমি' বলে ডাকতে শুরু করল। তা ছাড়া দৈনন্দিন খাদ্যও ছিল ওদের বেলায় উৎকৃষ্ট আর ভারতীয়দের ভাগ্যে জুটত নিকৃষ্ট। এ যে শুধু নৌবাহিনীতেই বিদ্যমান তা নয়, সমগ্র ভারতীয় সেনাবাহিনীতেই (স্থল, বিমান ও নৌবাহিনী) ঐ একই অবস্থা বা বৈষম্য বিদ্যমান ছিল। ফলে গোটা ভারতীয় সেনাবাহিনীও আজ একটা আগ্নেয়গিরিতে পরিণত হল। যে কোনো মুহূর্তেই অগ্ন্যুৎপাত ঘটতে পারে। ভারতীয় সেনাবাহিনীর সকলেই নিজেদের এখন আজাদ হিন্দি বলে ভাবতে শুরু করেছে। তাই, এই সুযোগে ভারতীয় কেন্দ্রীয় গোপন সংস্থা চুপ করে না থেকে এই পরিস্থিতির সদ্ব্যবহার করতে চেষ্টা করল এবং এক ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণের প্রস্তুতি চালাতে লাগল। গোপন সংস্থার মাধ্যমে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বামপন্থী নেতাদের কাছ থেকেও আমরা কিছু কিছু নির্দেশ পেলাম। (অবশ্য, কেন্দ্রীয় গোপন সংস্থায় যে-সকল কংগ্রেসের বামপন্থী নেতারা স্থান পান নি তাঁদের কাছ থেকেই ঐ নির্দেশ পেয়েছিলাম।) তাঁদের মধ্যে তখনো কেউ কেউ আত্মগোপন করেই থাকতেন; কিন্তু আমাদের সাথে তাঁদের যোগসূত্র ছিল।

সর্বভারতীয় কেন্দ্রীয় গোপন সংস্থা ভারতীয় সমগ্র সেনাবাহিনীতে (স্থল, নৌ ও বিমানবাহিনীতে) সামগ্রিক পরিস্থিতির ভিত্তিতে এই সর্বপ্রথম রাজনৈতিক

স্তরে ১৯৪৩ সালের ১ মে এক গোপন ও বিপদসঙ্কুল কর্মসূচী গ্রহণ করল এবং তা বিভিন্ন শাখায় স্থানের ভিত্তিতে রূপায়ণ করতে নির্দেশ পাঠানো হল। সেই গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচীর কাঠামো ছিল নিম্নরূপ :

ক। যে যে বিষয় নিয়ে সৈন্যবাহিনীতে অসন্তোষের সৃষ্টি হয়েছে তা মুখে মুখে প্রচারের দ্বারা ঐ সকল অসন্তোষকে কেন্দ্রীভূত করে একই খাতে বইয়ে দেবার জন্যে একপ্রকার গোপন চুপ চুপ, ফিস ফিস অভিযান (whispering campaign) লাগাতার চালাতে হবে।

খ। জাহাজে, ব্যারাকে এবং সেনাবাহিনীর অন্যান্য সংগঠনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা অর্থাৎ আর্জ প্রোভোকাত্যর (agent provocateur)।

গ। অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপের দ্বারা (পোস্টারিং সমেত) ব্রিটিশবিরোধী মনোভাব গড়ে তোলা।

ঘ। সমস্ত সেনাবাহিনীকে (জাতি, ধর্ম, বর্ণ, সম্প্রদায় নির্বিশেষে) ভারতীয় জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করা ইত্যাদি।

আমি নৌবাহিনীর কর্মী। গোপন সংস্থার নির্দেশমত আমার কাজ শুরু করলাম ক্যাসেল ব্যারাকে এবং এম আর ব্যারাক্‌স-এ। দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ করার জন্যে আমরা দেশপ্রেমিকদের বীরত্বের গাথাসমূহ আলোচনার মধ্যে হাতিয়ার করে নিলাম। 'হুইসপারিং' কর্মসূচীর মধ্যেও তাকে স্থান দিলাম। নৌবাহিনীতে ব্রিটিশের নিরাপত্তা সংস্থা ছিল খুবই জোরালো। তাদের এড়িয়ে অতি সন্তর্পণে একটু একটু করে আমরা এগোতে লাগলাম। আলোচিত হতে লাগল ঝাঁসীর রানী লক্ষ্মীবাঈয়ের কথা, বাঁশের কেল্লার তিতুমীরের কথা, সিপাহি বিদ্রোহের অন্যতম নেতা মঙ্গল পাঁড়ের কাহিনী। তাছাড়া বিপ্লবী বীর ভগৎ সিং, মাস্টারদা সূর্য সেন, ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী, কানাইলাল, এমন কি দক্ষিণের কাট্টাবোম্মান এবং আসামের মনিরামের কথাও বাদ পড়ল না। নেতাজীর আই এন এ বাহিনীও যে কামান-বন্দুক-মেসিনগান নিয়ে এগিয়ে আসছে, তাও প্রচারের হাতিয়ার করা হল। ভারতের কিষান-মজুর-মধ্যবিত্তের বীরত্বপূর্ণ লড়াইয়ের কথাও আলোচনার মধ্যে রাখা হল।

এইভাবে প্রস্তুতি চলতে থাকল ১৯৪৩ সালের ৩১ জুলাই পর্যন্ত। আর মনে মনে আশা পোষণ করলাম এই মুক্তিযোদ্ধাদের প্রবল আক্রমণে ব্রিটিশ-সামরিক ঔদ্ধত্যের মেরুদণ্ড ভেঙে খান খান হয়ে যাবে। শুরু নয়, শেষও নয়, আজকের এই প্রস্তুতি, পরাধীনতার বন্ধন মোচনে মুক্তির যে-সংগ্রাম, তা সেই শেষ পরিণামের শুরু। অবিশ্বাস্য ঘটনা, কিন্তু অতি সত্য। অসম্ভব কি? তাদেরও (সৈন্যদের) রক্তস্রোতে বইছে সংগ্রামের তীব্র অগ্নিধারা! দেশপ্রেম অমিত শক্তির অধিকারী করেছে তাদের। সৈন্যরা ভাবতে শুরু করেছে, এবং তা রাজনীতির ধারাতেই। জাতীয়তাবাদী ভারত ব্রিটিশকে বলেছিল, ভারতের ব্যাপার ভারতীয়দের হাতে ছেড়ে দিতে। তাদের কী অধিকার আছে আমাদের দেশের ওপর রাজত্ব করার?

কিন্তু সে-ব্যাপারে ব্রিটিশরা ছিল তেমনি অনমনীয়। কারণ ব্রিটিশ জানত, জাতীয়তাবাদী ভারতীয়দের কাছে ভারতীয় সেনাবাহিনীর লোকেরা ছিল একমাত্র ভাড়াটে সৈন্য হিসাবে পরিচিত। সেই সেনাদের দ্বারা দেশের স্বাধীনতার কাজ ত্বরান্বিত হতে পারে,—এই ধারণা ব্রিটিশের মনে কখনো আসে নি। তাই তারা ভেবেছিল এই ভাড়াটে সৈন্য দিয়েই স্বাধীনতার আন্দোলনকে ঠাণ্ডা করে দিতে সক্ষম হবে। বিশেষতঃ '৪২-এর আন্দোলনকে দমন করে তাদের সে-ধারণা আরো বদ্ধমূল হল। তারা কিন্তু হিসেবে একটু ভুল করেছিল। ১৯৪২ সাল আর ১৯৪৩ বা ৪৪ সাল য এক নয় এবং তা যে এক হতে পারে না,—এই ধারণার অভাব থাকাই হল মস্ত বড় ট্রাজেডি। ব্রিটিশ সেই ট্রাজেডি বহন করে চলছে। তার প্রমাণ হল, ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর লোকেদের মনে বোধ জাগল যে, তারা ব্রিটিশের একমাত্র ভাড়াটে সৈন্য নয়, তারাও যে দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামী হতে পারে, সেটাই প্রমাণ করার ভার পড়ল আজ তাদের ওপর। তারা যেন অজ্ঞাতসারেই হয়ে উঠল এক-একজন ষড়যন্ত্রকারী। মনে হল, যেন এক ঐশ্বরিক শক্তি তাদের আশ্রয় করে বলীয়ান করে তুলেছে।

ওদিকে দৈনন্দিন খাওয়া-দাওয়ার পরিস্থিতি ক্রমেই নিকৃষ্ট থেকে নিকৃষ্টতর হয়ে উঠছিল। পরিধেয় পোশাকেরও মান ক্রমশ খারাপ হল। সৈন্যদের মাসিক ভাতাও ঠিকমত তাদের পিতা-মাতা, স্ত্রী-পুত্রের কাছে সৈন্য বিভাগের হেড-কোয়ার্টার থেকে পাঠানো হচ্ছিল না। প্রায়ই তাদের বাড়ি থেকে টাকা পাঠাবার তাগিদ আসতে থাকে চিঠি ও টেলিগ্রামের মাধ্যমে। পিতা-মাতা, স্ত্রী-পুত্র না খেয়ে আছে। সর্বত্র গুঞ্জরণ চলছে। অসন্তোষ যেন চরমে পৌঁছল।

আগস্ট মাস এসে গেল। সর্বভারতীয় কেন্দ্রীয় গোপন সংস্থা ৮ আগস্টকে স্মরণে রেখে এবং ৯ আগস্ট বিপ্লবের দিন স্বীকৃতি দিয়ে (যা ১৯৪২ সালে ঘটেছিল) তাকে স্মরণীয় করে রাখার জন্যে সৈন্যবাহিনীতে ১৯৪৩ সালের ৯ আগস্ট তিন বিভাগেই (স্থল, নৌ ও বিমান) একটি করে বিপ্লবের স্টেশন হিসাবে এ্যাকশন কমিটি তৈরি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল, যাতে একসাথে লড়াইয়ে নামা যায়। প্রস্তাব গ্রহণ করা হল, স্থলবাহিনীতে চন্দ্র সিং গাড়োয়ালের নেতৃত্বে, নৌবাহিনীতে মদনলাল সাকসেনা এবং বিমানবাহিনীতে পি কোট্টায়ামের নেতৃত্বে পৃথক পৃথকভাবে তিনটি এ্যাকশন কমিটি গঠিত হবে। আরো প্রস্তাব নেওয়া হল প্রত্যেক এ্যাকশন কমিটিতে অন্তত্পক্ষে তেরজন করে সভ্য থাকবে। এবং প্রত্যেক সিদ্ধান্তই সকলকে একমত হয়েই গ্রহণ করতে হবে। আরো ঠিক হল একই তারিখে একই সময়ে সংগঠিত আন্দোলন শুরু করা হবে। এও ঠিক করা হল, কেন্দ্রীয় গোপন সংস্থা আমাদের সঙ্গে এক হয়ে সেনাবাহিনীর বাইরে জনগণের মধ্যে বিশেষ করে মজুর, কিষান ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে আমাদের আন্দোলনের সমর্থনে এক উত্তাল উদ্দাম সংগ্রামের ঢেউ বইয়ে দেবে। ১৯৪৪ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি সেই বিপ্লবের দিন

ধার্য হল প্রথম প্রকাশ্য আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। কেননা, ঐ দিনেই আমাদের বীর যোদ্ধা মানকুমার বসুঠাকুর, আবদুল কাদের, চিত্তরঞ্জন ব্যানার্জী প্রমুখ তেরজন বীরকে মাদ্রাজ দুর্গে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল ১৯৪৩ সালে, তাঁরা চতুর্থ মাদ্রাজ রেজিমেণ্টের সৈন্য ছিলেন।

প্রকাশ্য আন্দোলনের কর্মসূচী হিসাবে ঠিক হল, সৈন্যরা তাদের খাবার গ্রহণ করবে না। কারণ, ব্যারাক-জীবনের এমন এক বিষয়কে বেছে নেওয়া প্রয়োজন যাতে প্রত্যেকটি রেটিং বা সৈন্য জড়িত থাকে। যে-খাবার তাদের দেওয়া হত তা শুধু খারাপই ছিল না, ছিল অখাদ্য ও অরুচিকর, মান অত্যন্ত নিকৃষ্ট, অপর্যাপ্ত। সুতরাং খাবার গ্রহণে অস্বীকার করতে হবে। তাহলে সামগ্রিকভাবেই সৈন্যবাহিনীতে সৈন্যদের মনে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে এক অনমনীয় ও তেজোদ্দীপ্ত সংগ্রামের স্পৃহা জাগবে। কারণ সৈন্যদের মনে জাগবে—খারাপ খাদ্য সরবরাহ করার মধ্য দিয়ে ব্রিটিশ সরকার তাদের (সৈন্যদের) বিরুদ্ধে সামগ্রিকভাবে এক কঠোর শাস্তি বিধান করে রেখেছে, 'ভারতীয় কালা আদমি' বলে। অতএব এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা একান্ত প্রয়োজন। খাবার যেহেতু গ্রহণ করা হবে না, সেইহেতু কোনো কাজও করা হবে না। শ্লোগান ঠিক করা হল, 'নো ফুড, নো ওয়ার্ক' অর্থাৎ 'না খাবার, না কাজ।' পরিবর্তিত ধাপে যখন আন্দোলন খুবই ঘোরালো হয়ে উঠবে তখন শ্লোগান হবে, 'ব্রিটিশ, তুমি ভারত ছাড়ো', 'ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক', 'কংগ্রেস-লিগ এক হোক', 'এখনই বিদ্রোহ করো', 'আমরা সবাই আজাদ হিন্দি', 'গোরাদের হত্যা করো', 'স্বাধীন ভারত জিন্দাবাদ', 'দিল্লী চলো, এগিয়ে চলো' ইত্যাদি পুরোপুরি রাজনৈতিক শ্লোগান। এখানে কথাপ্রসঙ্গে একটা কথা বলা প্রয়োজন, '৪২-এর 'ভারত ছাড়ো' (Quit India) কথাটি প্রকৃতপক্ষে মহাত্মা গান্ধীর নিজের নয়। এ তাঁর উক্তির পঞ্চাশ বছর পূর্বের কথা। বোম্বাইয়ের তৎকালীন ইন্দুপ্রকাশ পত্রিকায় শ্রীঅরবিন্দ পর-পর সাতটি প্রবন্ধ লেখেন। এই প্রবন্ধেই শ্রীঅরবিন্দ ইংরেজ রাজশক্তিকে ভারতীয়দের কল্যাণের জন্য এ-দেশ ত্যাগ করতে বলেছিলেন। তখন কংগ্রেস সবেমাত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সেই সময়ে অরবিন্দের মুখে এ-উক্তি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

দেখতে দেখতে এল অক্টোবর মাস। ১৯৪৩ সালের অক্টোবরে লর্ড লিনলিথগোর স্থলে লর্ড ওয়াভেল বড়লাট নিযুক্ত হলেন। প্রধান সেনাপতি হিসাবে তিনি ক্রিপস পরিকল্পনা প্রসঙ্গে আলাপ-আলোচনায় প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করতে থাকলেন। দেশের জাতীয় নেতারাও তাঁর প্রতি একটু সহানুভূতিসুলভ মনোভাব দেখাতে লাগলেন। কিন্তু আমরা জানি, ওঁরা সকলেই একই ধাতুতে গড়া। রকমফেরে কেউ কেউ নরম গরম কথা বলতে পারে—এই মাত্র তফাত।

এদিকে আমাদের ট্রেনিংও প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। শুনতে পেলাম, পাঁচখানা জাহাজ যুদ্ধসাজে সজ্জিত করে আফ্রিকা-সীমান্তে পাঠাবে মিত্রপক্ষের দ্বিতীয় ফ্রন্টকে

সাহায্য করতে। প্রকৃতপক্ষে ব্রিটিশের এই মিত্রপক্ষের দ্বিতীয় ফ্রন্টকে সাহায্য করার আদৌ সদিচ্ছা ছিল না। তাদের উদ্দেশ্য ছিল অন্যরকম। যুদ্ধ তখনো চলছে। আফ্রিকায় আর একটি ফ্রন্ট খোলার কথা চলছে। তারা ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে যাদের মনোভাব সন্দেহজনক, তাদের সেখানে পাঠাবার নাম করে আরব সাগরের মাঝখানে ডুবিয়ে মারার এক গভীর ষড়যন্ত্র এঁটেছিল। সেটি পরে প্রকাশ হয়ে পড়ে। আসলে রাশিয়ার সুবিধার জন্যে আফ্রিকায় আরেকটি ফ্রন্ট খোলার ব্যাপারে ইংরাজরা সত্যি সত্যি তেমন আগ্রহী ছিল না। অথচ ঐ নাম করে এই ষড়যন্ত্র করেছিল। এই ব্যাপারে যে-বিক্ষোভ দেখা দেয় তারই সুযোগ নিয়ে তখন এক বিদ্রোহ সংঘটিত করার চেষ্টা হয়। সে-বিষয়ে পরে আলোচনা করা হয়েছে।

আমরা যারা ট্রেনিংপ্রাপ্ত, তাদের ঐ জাহাজগুলিতে পাঠানো হবে। আমরাও ঠিক করলাম, ১৮ ফেব্রুয়ারির পূর্বে আমাদের পাঠাবার ব্যবস্থা হলে, যে-দিন পাঠানো হবে সেই দিনই ঐ প্রথম পর্যায়ের আন্দোলন শুরু করব এবং তা ঐ গোপন সংস্থাকে জানিয়ে দিয়ে তাদের মাধ্যমে অন্য দুই বাহিনীকেও জানিয়ে দেবার ব্যবস্থা করব।

ওদিকে আবার প্রচারিত হল যে, 'খাইবার' জাহাজ, সামরিক ভাষায় যাকে বলা হয়ে থাকে ক্রুজার, ১৯৪৩ সালের ১৬ আগস্ট ভূমধ্যসাগরের সুনীল জলরাশি কেটে কেটে এক বিরাট বহরের পুরোভাগে যাচ্ছিল। পিছনে তিনটি ব্রিটিশ জাহাজ 'নরফোক', 'গ্লোরি' আর 'গ্লস্টার' অনুসরণ করছে। বহর যাচ্ছে ইতালির উপকূলে জেনোয়া বন্দরের দিকে। 'খাইবারকে' সবার আগে রাখা হয়েছে। তার কারণ শত্রুপক্ষের আগ্নেয়াস্ত্র বড়ই দুর্ধর্ষ। কালা আদমি ভারতীয়দের উপর দিয়েই যাক না সেই দুর্ধর্ষ কামান-বন্দুকের অগ্নিবর্ষণ গোলা! 'কালা আদমি' আর 'সাদা আদমি'র রক্ত তো এক নয়! যুদ্ধক্ষেত্রে বরাবরই ব্রিটিশ অগ্রবর্তী-বাহিনীতে ভারতীয়দের রাখত। যুদ্ধের প্রথম চোট যাবে ভারতীয়দের উপর দিয়ে—এই ব্যবস্থা ব্রিটিশরা চিরস্থায়ী করে রেখেছিল। আরো একটা মজার ব্যাপার ছিল—যত জীর্ণ যত পুরনো জাহাজ বা কামান-বন্দুক ছিল তা দিয়েই ভারতীয় রেজিমেন্ট বা বহর তৈরি করা হত। ফলে ভারতীয়রা প্রাণ হারাতো অনেক বেশি সংখ্যায়। ভারতীয়দের প্রাণ আর ব্রিটিশের প্রাণ তো এক নয়! তাই এই নিয়ম।

এইচ এম আই এস 'খাইবার' অর্থাৎ হিজ ম্যাজেস্টিস ইণ্ডিয়ান শিপ 'খাইবার' ব্রিটিশ-সম্রাট ষষ্ঠ জর্জের পৈতৃক সম্পত্তি। আর জাহাজের প্রাণটুকু শুধু তার নাবিকেরা। অতি পুরাতন, অতি জীর্ণ এই জাহাজ। বেছে বেছে ভারতীয় নাবিকদের দেওয়া হত এই রকম মান্ধাতা আমলের ফেলে-দেওয়া বৃদ্ধ জাহাজ। *জাহাজের জঠরে বয়লার ঘরে আগুন জ্বলছে। ধুকপুক করছে জরাজীর্ণ 'খাইবার'-এর প্রাণ। সমাগত যুদ্ধের আশঙ্কায় কম্পিত 'খাইবার' জাহাজ। হঠাৎ ইতালিয়ান*

ভেস্ট্রিয়ার 'খাইবার'-এর ওপর আঘাত হানল। আগুন ধরে গেল এবং অবশেষে 'খাইবার' জাহাজ জলযুদ্ধে নিখোঁজ হল। অনেকে মনে করল আটলান্টিক মহাসাগরে জার্মান ডুবোজাহাজের আক্রমণে সলিল সমাধিই ঘটেছে। বোম্বাইয়ের ওয়াটার ফ্রন্ট এলাকায় বাস করে বহু নাবিকের পরিবারবর্গ। 'খাইবার'-এর নাবিকদের যারা নিকট-আত্মীয়, তারা ভেবে পায় না কোথায় গেল তাদের ছেলেরা! কান্নার রোল উঠল বস্তির প্রতি ঘরে। বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ল দেশের প্রতিটি কোণে।

১৯৪৩ সালের ডিসেম্বর মাস। জোর লড়াই চলছে সমস্ত ফ্রন্টেই। সারা পৃথিবীর পরিস্থিতি খুবই ঘোরালো। কে জেতে কে হারে, এনিয়ে সর্বত্র আলোচনা। কোনো কোনো ক্ষেত্রে মিত্রপক্ষ এগিয়ে যাচ্ছে। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে নাৎসিপক্ষ অগ্রগামী। সমস্ত পৃথিবীময় একটা উত্তেজনা চলছে। এই সংকটের মধ্যেই যে সুযোগ আছে তাও আমরা জানতাম। অগ্নিযুগের বিপ্লবীরা যেমন সুযোগ নিতেন, বিশেষ করে বিপ্লবী ঠাকুরসাহেব যা করতেন, তা আমাদের কাছে আদর্শ হয়ে আছে।

এখানে ঠাকুর সাহেবের প্রসঙ্গ এসে পড়ায় তাঁর বিষয় একটু আলোচিত হওয়া প্রয়োজন মনে করি। শ্রীঅরবিন্দও তাঁর (ঠাকুর সাহেবের) সঙ্গে একমত ছিলেন। কেউ কেউ বলে থাকেন, শ্রীঅরবিন্দ ঠাকুর সাহেবের কাছেই বিপ্লবীমন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিলেন। সে-যুগের সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা সম্পর্কে শ্রীঅরবিন্দ বলেন, 'At that time the military organisation of the great empires and their means of military action were not so overwhelming and apparently irresistible as they now are; the rifle was still the decisive weapon, air power had not been developed and the force of artillary was not so devastating as it afterwards became. India was disarmed, but Sri Aurobindo thought that with proper organisation and help from outside this difficulty might be overcome and in so vast a country as India and with the smallness of the regular British armies, even a guerrilla warfare accompanied by general resistance and revolt might be effective. There was also the possibility of a general revolt in Indian army.' [*Aurobindo on himself and Mother*; P. 39]

বরোদায় গুপ্তসমিতির নেতা ছিলেন ঠাকুর সাহেব। অবশ্য এই গুপ্তসমিতি হল ভারতের অগ্নিযুগের গোড়ার দিকের কথা। অনেকের ধারণা ঠাকুর সাহেব ছিলেন

রাজপুতনা বা মধ্যপ্রদেশের কোনো করদ রাজ্যের নরপতি। স্থির হয়েছিল, ভাবী নিখিল ভারত প্রজাতন্ত্রে ইনি হবেন দেশপতি অথবা প্রেসিডেণ্ট। মনে হয় তাঁরই আদর্শ নিয়ে মাস্টারদা সূর্য সেন চট্টগ্রামে রিপাবলিকান আর্মি তৈরি করেছিলেন এবং তাঁদের দ্বারাই অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করিয়েছিলেন। ঠাকুর সাহেবকেই কেন্দ্র করে কাজ চলছিল পশ্চিম ভারতের সর্বত্র। কর্মীদের নিকট তিনি ছিলেন এক অদৃশ্য রহস্যময় পুরুষ। তাঁর সংগঠনে সমস্ত পশ্চিম ভারত বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক সার্কেলের জন্য এক-একজন দেশপতি তিনি নির্ধারিত করতেন। শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন গুজরাট সার্কেলের সভাপতি। বাংলার সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের পর প্রমথ নাথ মিত্র বাংলার প্রদেশপতি নির্ধারিত হয়েছিলেন বলে জানা যায়।

ঠাকুর সাহেব প্রচ্ছন্ন হয়ে ছদ্মবেশে সর্বত্র ঘুরে বেড়াতেন। দাক্ষিণাত্য ও গুজরাটের বহুস্থানের সৈন্যবাহিনীতে তাঁর লোকজন ছিল। সংগঠনের বিপ্লবীদের সকলেরই ধারণা ছিল সমগ্র ভারতে ঠাকুর সাহেবের সংগঠনের শাখা রয়েছে আর পর্বতে অরণ্যে হাজার হাজার নাগা সাধু-সন্ন্যাসীর দল অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত হয়ে আছে। তাদের পেছনে রয়েছে ভারতের দেশীয় রাজন্যবর্গ। ইঙ্গিত পেলেই এক দিন তারা মহাসমরে ঝাঁপিয়ে পড়বে। ভারতে মহাবিপ্লব সফল হতে তখন আর কতক্ষণ!

ঠাকুর সাহেব সম্পর্কে শ্রীঅরবিন্দ আরো বলেন, 'The Rajput leader was not a prince but a noble of the Udaipur State with the title of Thakur. The Thakur was not a member of the (revolutionary) Council in Bombay; he stood above it as the leader of the whole movement while the Council helped him to organise Maharastra and Marhatta states. He himself worked principally upon the Indian Army of which he had already won over two or three regiments. Sri Aurobindo took a special journey into Central India to meet and speak with Indian sub-offices and men of one of this regiment.' [*Aurobindo on himself and Mother*, P. 29.]

তাই আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির সুযোগ নিয়েই প্রথম বিশ্বযুদ্ধে (১৯১৪-১৮) বিপ্লবীরা ভারতের বাইরের স্বাধীনতাপ্রিয় দেশগুলির সাহায্য এবং ভিতরের বিপ্লবী সংগঠনের মাধ্যমে সৈন্যবিভাগে বিদ্রোহ ঘটিয়ে ভারতবর্ষকে মুক্ত স্বাধীন করবার বাসনা নিয়ে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। এটা হল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। ভারত এখনো পরাধীন। '৪২ সালের আন্দোলনে যে-আঘাত ব্রিটিশকে দেওয়া হয়েছিল তার অন্তত চারগুণ বেশি আঘাত এবারে হানতে হবে—কেন্দ্রীয় গোপন সংস্থার এই ছিল প্রত্যাশা। ঠাকুর সাহেবের আদর্শও তাই তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন

—ব্রিটিশের ভারতীয় সৈন্যবাহিনীতে সংগঠন গড়ে তুলে সেখানে বিদ্রোহ ঘটানো। আগেও আলোচনা করেছি, আমরা সৈন্যবাহিনীতে বিদ্রোহ ঘটাতেই এখানে এসেছি। সে-সুযোগও উপস্থিত। বিশেষভাবেই বলতে পারা যায়, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি এ'ন আমাদের অনুকূলে। এর সদ্ব্যবহার করা একান্ত প্রয়োজন। আমরা সেই কাজেই এগোতে লাগলাম।

কাল সত্যিই আলেয়া। ১৯৪৩ সাল বিদায় নিল, এল ১৯৪৪ সাল। কত সুখকর স্বপ্ন দেখাতে লাগল। ভারত-জননী বোধহয় পাথরের আলমোড়া ছেড়ে চিন্ময়ী মূর্তিতে সচল হয়ে উঠলেন। আর, আমাদের যেন ডেকে বললেন, 'ওঠো—জাগো, জড়তা ঝেড়ে ফেলে আমার দিকে ফিরে তাকাও। আমি তো দক্ষিণ আয়ন ছেড়ে উত্তর আয়নে ফিরে আসছি। নতুন বছরের নতুন মাসে এসে পা রেখেছি। জানুয়ারি তো দুয়ার খুলেছে। হাতছানি দিয়ে ডাকছে।'

বিদ্রোহের প্রস্তুতিও চলতে লাগল। হুইস্‌পারিং ক্যামপেনও চলছে। মাঝে মাঝে গোপনে অতি সন্তর্পণে একটা দু'টো রাজনৈতিক শ্লোগান বড় বড় অক্ষরে লিখে দেয়ালে এঁটে দেওয়া হল। সর্বপ্রথম শ্লোগান হল—'ব্রিটিশ, তুমি ভারত ছাড়ো!' নৌবাহিনীতে এ-ঘটনা যে বিস্ময়কর! এর আগে কখনো কেউ চিন্তাও করতে পারে নি যে, সেনাবাহিনীতে এইভাবে রাজনৈতিক পোস্টার ব্যারাকের দেয়ালে কেউ মারতে পারে। নিরাপত্তাবাহিনী সতর্কতা অবলম্বন করল। গোপনে গোপনে খোঁজ নিতে লাগল, কারা এসব করছে। ভেতরের লোক করছে, না বাইরের লোকে গেটের পাহারাদারদের হাত করে ভেতরে এসে ঐ পোস্টার লাগাচ্ছে। খোঁজাখুজি চলছে। এরই মধ্যে হঠাৎ একদিন বিস্ফোরণের মত বিক্ষোভের সৃষ্টি হল। দিনটা ২৮ জানুয়ারি, সেদিন এম আর ব্যারাক্‌স-এর ব্রিজলাল ডোগ্রে তার উর্দি পোশাক বেশি দিনের পুরনো হওয়ায় এবং পোশাকের অনেক জায়গা ছিঁড়ে যাওয়ায় স্টোর-রুমে উর্দিটাকে পালটে নিতে গিয়েছিল। তখন পর্যন্ত নিয়ম ছিল, পোশাক পালটে নিতে হলে পুরনোটা জমা দিতে হবে। ব্রিজলাল নিয়মমতই করতে গিয়েছিল। কিন্তু তার অপরাধ হল, সে কেন শুধু তার আণ্ডারওয়্যার পরে গিয়েছিল উর্দিটাকে বগলদাবা করে স্টোর-রুমের অফিসারের সামনে? সেই অফিসার ছিলেন মিঃ ডেনহাম। তিনি সঙ্গে সঙ্গে ব্রিজলালকে ফল-ইন করিয়ে তাঁর সাহায্যকারী রেটিংকে আদেশ করলেন ব্রিজলালকে ব্যাটন চার্জ করতে। সেই রেটিং ছিল ভারতীয়, নাম গফুর মোল্লা। ব্রিজলালের অন্য কোনো পোশাক ছিল না, ঐ পুরনো উর্দি দু'টো ছাড়া। দু'টোই যখন পালটাতে হবে তখন একমাত্র থাকে তার পুরনো দু'টো আণ্ডারওয়্যার। তাই ঐ দুটো আণ্ডারওয়্যারের একটা পরে সে গিয়েছিল নিরুপায় হয়ে। 'ফল-ইন'

করানোর পরে ব্রিজলাল অনুনয় করে তার বক্তব্য বলতে চেয়েছিল। কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা! কে কার কথা শোনে! অফিসার ডেনহাম তা না-শুনেই ব্যাটন চার্জের আদেশ দিলেন। আর কুৎসিত ভাষায় গালাগালি দিলেন, 'ইউ আর সন্‌স অফ ব্লাডি জাংগল্‌স।' তাঁর সাহায্যকারী রেটিং গফুর মোল্লা আদেশ অমান্য করে দাঁড়িয়ে রইল, ব্যাটন চার্জ করতে এগিয়ে এল না। মিঃ ডেনহাম রাগে কাঁপতে কাঁপতে নিজে উঠে দাঁড়িয়ে টেবিলের ওপরে রাখা ব্যাটন হাতে নিয়ে ত্রস্ত পায়ে এগিয়ে গিয়ে গফুরের ওপরে ঝাঁপিয়ে কয়েক ঘা বসিয়ে দিতেই ব্রিজলাল তার ফল-ইন পজিশন নস্যাৎ করে ঝাঁপিয়ে পড়ল ক্ষুদে গোরা অফিসারের ওপর এবং কয়েক ঘা কিল-চড় কষে বসিয়ে দিল অফিসারের পিঠে। বেশ এক প্রস্থ মল্লযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। গফুর আর ব্রিজলাল একদিকে, অন্য দিকে একা শ্বেতাঙ্গ বীরপুঙ্গব। এমন অবস্থা চলতে থাকার সময় পাশের ঘরে ছিল শ্বেতকায় আর একজন অফিসার এবং জন-বারো ভারতীয় রেটিং। তারা ছুটে এল বিকট সোরগোল শুনে। তারা এসে ওদের ছাড়াবার চেষ্টা করল, কিন্তু কোনো ফল না-হওয়ায় ফোন করা হল কমাণ্ডিং অফিসে। সেখান থেকে ক্যাপ্টেন ইনিগো জোনস একদল গোরা সৈন্য নিয়ে হাজির হলেন স্টোর-রুমে। গোরা সৈন্যরা সমস্ত জায়গাটা ঘিরে ফেলে গ্রেপ্তার করল দোষী-নির্দোষ বিচার না করে সমস্ত ভারতীয় রেটিংদের—যারা ওখানে উপস্থিত ছিল। এম আর ব্যারাক্‌স-এর অন্যান্য ভারতীয় রেটিংরা এই ঘটনা শুনে বিক্ষুব্ধ হল। গুঞ্জরণ শুরু হল সর্বত্র। খবর পেয়ে এ্যাকশন কমিটির কয়েকজন সদস্য ছুটে এলেন এবং রেটিংদের বুঝিয়ে-সুজিয়ে আপাতত নিরস্ত করলেন। তাঁরা ভবিষ্যতের বৃহত্তর আন্দোলনের মাপকাঠিতে বিচার করে তখনকার মত বিচ্ছিন্ন বিক্ষোভকে হুইস্‌পারিং করে রেটিংদের মধ্যে ব্যাপক সংগ্রামের এক পদক্ষেপ বিশেষভাবে মনে করিয়ে দিতে লাগলেন এবং আপাতত ক্রোধকে প্রশমিত করে কোর্ট মার্শালের রায়ের অপেক্ষায় থাকতে অনুরোধ করলেন। এ্যাকশন কমিটির দৃষ্টিতে ঝড়ের পূর্বাভাস ধরা পড়ল।

দেখতে দেখতে ১৯৪৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাস এল। ৮ ফেব্রুয়ারি বড়লাট লর্ড ওয়াভেল ভারতের ঐক্যকে সমর্থন করতে গিয়ে বললেন, 'ভূগোলকে সংশোধন করা যায় না। প্রতিরক্ষা এবং আভ্যন্তরীণ ও বাইরের অর্থ নৈতিক সমস্যাবলীর দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যায় ভারত একটি স্বাভাবিক ঐক্যবদ্ধ খণ্ড।' এর এক বছর পরে তিনি ভারতের অচল অবস্থা দূরীকরণে প্রয়াসী হন। কিন্তু তাঁর ঘোষণায় দেশের বিশেষ করে জাতীয় নেতাদের মধ্যে এক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হল। দেশের রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে একপ্রকার রাজনৈতিক মোহ বিস্তার করল। অনেকেই তখন তাঁকে (লর্ড ওয়াভেলকে) 'নিজ পরিবারভুক্ত একজন' বলে মনে করতে থাকল। আমার মনে হয়, যারা আপসপন্থী তাদের মধ্যেই এই মোহ বিস্তার করেছিল।

আমরা কিন্তু এদিকে উদ্বিগ্নে দিন কাটাচ্ছি। কখন কী হয়, কখন কী হয়—এই ভেবে। হুইসপারিং ক্যাম্পেন ঠিকমতই চলছে। লক্ষ্য করা গেল, উচ্চপদস্থ অফিসারেরা পূর্বে যে-রকম আমাদের সাথে হেসে-খেলে কথা বলতেন, সে-রকম যেন তাঁরা আর কথা বলছেন না। উপরমহলে যেন একটা থমথমে ভাব। সব যেন গম্ভীর। বুঝতে পারলাম, কিছু একটা ঘটেছে। সন্দিগ্ধ মন, প্রশ্ন জাগে,—তবে কি আমাদের গোপন সিদ্ধান্ত ওদের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়েছে? সব কিছুই কি জেনে গেছে? নতুবা একটা কিছু জিজ্ঞেস করলে ওরা আমাদের এড়িয়ে যাবার লক্ষণ দেখাচ্ছে কেন? হবেও বা তাই! সামরিক বিভাগে যেভাবে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের সুদক্ষ গুপ্তচরবাহিনী তৎপর রয়েছে তাতে ওদের পক্ষে কোনো কিছুই অসম্ভব নয়। তাদের হাতে কি আমাদের কোনো গোপন তথ্য, লিখিত দলিল ধরা পড়েছে? এই ধরনের নানা প্রশ্ন মনে জাগতে থাকে। এমন সময় সুবলচন্দ্র ধর (যিনি নৌবাহিনীর গুপ্তসমিতিতে একজন সক্রিয় সদস্য) হন হন করে আমার কাছে এসে বললেন, 'মিঃ ভট্টাচারিয়া, (সৈন্যবাহিনীতে আমি পি বি ভট্টাচারিয়া নামে পরিচিত ছিলাম) দারুণ বিপদ, সবকিছুই বোধহয় ধরা পড়ে গেছে। ডব্লিউ আর আই এন এ-র (উইমেন্স রয়েল ইণ্ডিয়ান নেভি) উর্মিলা বাঙ্গ এবং অনুভা সেন গ্রেপ্তার হয়েছেন। আমাদের গোপন কাগজপত্র তো ওঁদের কাছেই থাকত। কেন্দ্রীয় গোপন সংস্থার মহিলা সদস্য কমলা ডোঙে এঁদের সাথে যোগাযোগ রাখতেন। তিনি আবার ছিলেন প্যারেল বস্তির মহিলা সমিতির নেত্রী।'

কী সর্বনাশ! মহাবিপদ! কিছুক্ষণ হতভম্ব থেকে ভাবতে থাকলাম। কিন্তু আগেও যে-সন্দেহ মনে জেগেছিল তা এখন সত্যে পরিণত হল। বিদ্রোহের প্রস্তুতিপর্বেই দুর্ঘটনা! মাথায় যেন বাজ পড়ল। কেবল চিন্তা করছি,—এ কী করে সম্ভব হল! অবশ্য কিছুক্ষণ বাদেই আবার সম্বিত ফিরে এল। ভাবলাম, মহৎ কাজের বিপদ থাকে অনেক। আমরা বিপ্লবী, বিপদ তো আমাদের থাকবেই। বাধা না থাকলে তো বিপ্লবই হত না। বিপ্লবের দায়িত্ব যখন নেওয়া হয়েছে তখন শত শত বাধা ঠেলেই এগোতে হবে। লড়াই করতেই হবে,—তাতে যা হয় হবে। মহাবিপদের মধ্যেই আবার মহান বিপ্লবী মাস্টারদা সূর্য সেনের কথা মনে পড়ে গেল। তিনি তাঁর ফাঁসি হওয়ার পূর্বে দেশের বিপ্লবীদের উদ্দেশে উদাত্তকণ্ঠে আহ্বান জানিয়ে বিপ্লবের পথরেখা টেনে বলেছিলেন, 'অভীষ্টে পৌঁছবার আগেই যদি মৃত্যুর হীমশীতল বাহুর স্পর্শ অনুভব করো, তাহলে তোমার কাজ তোমার সহকর্মীর হাতে তুলে দাও, যেমন আমি আজ করেছি। এগিয়ে চলো, আমার সহবন্ধুরা, এগিয়ে চলো। কখনো পিছিয়ে থেকো না।'

আমিও এগোবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলাম। ঠিক এই সময়ই সন্ধ্যার একটু পরেই কমাণ্ডার-ইন-চিফ মিঃ অচিনলেক-এর সতর্কবাণী শোনা গেল রেডিওর মাধ্যমে। তিনি বলছেন, 'মিঃ বোসের (সুভাষচন্দ্র বোস) কার্যকলাপের অনুপ্রবেশ

সেনাবাহিনীতে বরদাস্ত করা হবে না।' বোঝা গেল, মিলিটারি কর্তৃপক্ষ ধৃত মহিলাদ্বয়ের হেপাজত থেকে গুরুত্বপূর্ণ গোপন দলিল উদ্ধার করতে পেরেছে।

বিপদ যখন আসে তখন একা আসে না। সন্ধ্যাবেলায় আবার খবর পাওয়া গেল, আমাদের আফ্রিকার সীমান্তে পাঠানো হবে, সাথে থাকবে পাঁচখানা যুদ্ধ-জাহাজ। আরো জানা গেল, কর্তৃপক্ষ যাদের ওপরে নজর রাখছে এবং গভীর ভাবে সন্দেহ করে, তাদের সকলকে ঐ জাহাজগুলিতে নিয়ে মাঝ-সমুদ্রে জলে ডুবিয়ে মারবে, এবং পরে ঘোষণা করবে যে যুদ্ধে মারা গেছে। ১১ ফেব্রুয়ারি বেলা দু'টোয় জাহাজগুলো যাত্রা করবে। সঙ্গে সঙ্গেরাত্রি সাড়ে সাতটায় নৌবাহিনীর এ্যাকশন কমিটির সদস্যদের (মোট সদস্যসংখ্যা ছিল তের) খবরাখবর দিয়ে রাতে 'তলোয়ার' জাহাজে (বোম্বের সমুদ্রতীরে অবস্থিত সিগনাল স্কুল) জড় হলাম। সম্পাদক মদনলাল সাকসেনা সকলের সম্মতি নিয়ে সভার কাজ শুরু করলেন। এ্যাকশন কমিটির সমস্ত সদস্যই উপস্থিত ছিলেন। নির্বাচিত সভাপতি সুবলচন্দ্র ধর সভাপতির আসন গ্রহণ করলেন। আলোচ্য বিষয়সূচী ছিল: (১) নৌবাহিনীর বর্তমান পরিস্থিতির বিবরণ পেশ, (২) পরিস্থিতির ভিত্তিতে কার্যক্রম (কর্মপন্থা) গ্রহণ, (৩) বিবিধ।

সম্পাদক মদনলাল সাকসেনা নৌবাহিনীর বর্তমান পরিস্থিতির বিবরণ পেশ করতে গিয়ে বললেন, 'আমাদের এই রাজনৈতিক সংগঠন (এ্যাকশন কমিটি) বাস্তবে রূপ পেল গত ৯ আগস্ট ১৯৪৩ সালে। তার পরে আমরা আরো দু'বার মিলিত হয়েছিলাম। আজ আমরা তৃতীয়বার মিলিত হলাম। আজ আমাদের মিলনের হেতু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমি আমার বন্ধুদের অনুরোধ করব, তাঁরা যেন এর গুরুত্ব উপলব্ধি করে সম্মিলিতভাবে কোনো প্রকার সংশয় না-রেখে প্রয়োজনীয় কর্মপন্থা গ্রহণ করেন।

'পৃথিবীর সামগ্রিক পরিস্থিতি আজ অস্থির। ভারতবর্ষ যেহেতু পৃথিবীর একটি অংশ, সেহেতু ঐ অস্থিরতা ভারতবর্ষের প্রতিটি স্তরে আজ প্রতিফলিত হয়েছে। সমগ্র ভারতীয় সেনাবাহিনীর কর্তৃপক্ষের মধ্যেও সেই অস্থিরতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। কী হয়, কী হয় ভাব আজ সর্বত্র। অথচ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে মুঠোর মধ্যে রাখবার জন্যে বাইরে শক্তিদম্ভের প্রকাশ করছে আর প্রশাসনিক ক্ষেত্রে ভেদনীতির আশ্রয় নিচ্ছে। ভারতবর্ষ স্বাধীনতা চায়, কিন্তু ব্রিটিশ সরকার সে-সম্বন্ধে এ-যাবত যা কিছু প্রস্তাব উত্থাপন করেছে, তার মধ্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সুচতুর ভেদনীতি আমরা দেখিতে পাই। ভেদনীতির মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদকে রক্ষা করার চিরাচরিত নীতিই আমরা দেখে আসছি। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলনের চাপ এবং বিক্ষোভের তরঙ্গ ক্রমেই তুঙ্গতম পরিস্থিতি সৃষ্টি করছে। দেশে ক্রমবর্ধমান দুর্ভিক্ষের পরিস্থিতির পটভূমিকা এ-সময়ে আমাদের মনে রাখা একান্ত দরকার।

'ভারতীয় সেনাবাহিনীতেও ভেদনীতি চালাবার চেষ্টা হয়েছিল প্রবলভাবে,

কিন্তু তা ফলবতী হয় নি। ব্রিটিশ নিজের জালেই নিজে জড়িয়ে পড়েছে, গোরা সৈন্য আর ভারতীয় সৈন্যদের (কালা আদমি) মধ্যে পক্ষপাতমূলক বৈষম্য রেখে। আজ আর কোনো ভারতীয় সৈন্যই (স্থল, নৌ ও বিমানবাহিনীর সমগ্র সৈন্য) ব্রিটিশদের বা ব্রিটিশ সৈন্যদের নিজেদের বন্ধু বলে মনে করে না। নৌবাহিনীতে তো আমরা দেখতেই পাচ্ছি। অন্য দুই বাহিনীতেও এই একই দৃশ্য। ব্রিটিশ সৈন্যদের তো ব্যঙ্গ করে 'টমি' বলে ডাকা শুরু হয়েছে। লড়াই যেন বাধে আর কি!

'দুর্ভিক্ষের ছায়া যেমন সৈন্যবাহিনীর বাইরে দেশের সর্বত্র পরিদৃশ্যমান, সৈন্য-বাহিনীর ভেতরেও তার ব্যতিক্রম ঘটে নি। আমরা কী খাদ্য পাচ্ছি তা তো স্বচক্ষে দেখছি। যেমন অখাদ্য-কুখাদ্য, তেমনি তার স্বল্পতা। তা ছাড়া উর্দি পোশাকের টানাটানি, তা নিয়ে আবার বিক্ষোভ। টাকাকড়ির টানাটানি। ফলে বাড়ির পরিবার-পরিজন ঠিক সময়মত আমাদের মাসিক মহিনা বা ভাতা পাচ্ছে না। তাদের না খেয়ে থাকতে হচ্ছে,—এই বিষয়ে আমরা তো অহরহই বাড়ি থেকে চিঠি পাচ্ছি। ফলে গোটা ভারতীয় সৈন্যবাহিনীতে বিক্ষোভের এক প্রচণ্ড আগ্নেয়গিরিও সৃষ্টি হয়েছে। সামান্যতম ঘটনাকে কেন্দ্র করে ধূমায়িত অসন্তোষ ফেটে পড়তে শুরু করেছে। এখানে গত এপ্রিল থেকে আজ পর্যন্ত চার-পাঁচটা বিক্ষিপ্ত ঘটনা ঘটেছে। তার মধ্যে গত জানুয়ারি এবং এপ্রিল মাসে ঘটনার যে-চিত্র দেখা গেল, তাতে বোঝা যায় নৌবাহিনীতে বিদ্রোহের অবস্থা বিদ্যমান। এ-খবরও আমার কাছে আছে যে, অপর দুই বাহিনীও বিদ্রোহের পথে পা বাড়িয়েছে। তবে ভারতবর্ষকে স্বাধীন ও মুক্ত করার জন্যই আমরা বিদ্রোহের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে—এটা আমাদের সর্বদাই মনে রাখতে হবে। ভারতীয় সৈন্যবাহিনীতে বিদ্রোহ ঘটিয়ে ভারতীয় পরিস্থিতির বৈপ্লবিক রূপান্তর আনয়নের মধ্য দিয়ে যে-বিপ্লবী সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে, তারাই তখন সমগ্র ভারতকে সুখ ও সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে। ভারতের মানুষ স্বপ্ন সফল করতে সমর্থ হবে। এ-পথ আপসের পথ নয়, লড়াইয়ের পথ। তাই আমাদের আমৃত্যু লড়াইয়ের সংকল্প গ্রহণ করতে হবে এবং সেইমত কর্মসূচীও গ্রহণ করতে আমরা কালবিলম্ব যেন না করি।'

সাকসেনা আরো বললেন, 'সর্বভারতীয় গোপন সংস্থা আমাদের সামনে কতগুলি বাস্তব কর্মসূচী পূর্বেই রেখেছে। আমরা সেই মত আজো কাজ করে যাচ্ছি। অনেক কিছু আমরা করেছিও। তার ফলে সৈন্যবাহিনীর কর্মীরা দৈনন্দিন অভাব-অভিযোগকে এখন আর ব্যক্তিগত বলে মনে করছে না। সবই রাজনৈতিক আবর্তে আবর্তিত হচ্ছে তা তারা বুঝতে পারছে এবং এর মূল কারণ যে এদেশে ব্রিটিশের অবস্থান, তাও তারা বুঝতে পেরেছে। বুঝতে পেরেছে বলেই তো তারা আজ নিজেদের আজাদ হিন্দি (স্বাধীন ভারতীয়) বলে মনে করছে। ফলে সামরিক বিভাগে যে-কঠোর শৃঙ্খলা বিদ্যমান ছিল তা আজ অনেকাংশে শিথিল হয়ে

পড়েছে। আমরা কি এর আগে কল্পনাও করতে পেরেছি যে, ব্রিটিশ অফিসারকে একজন সাধারণ ভারতীয় সৈনিক মারধোর করতে পারে—যা ব্রিজলাল ও গফুর মোল্লা করেছে গত ২৮ জানুয়ারি? আরো লক্ষ্য করার বিষয় যে, হিন্দু-মুসলমান সৈনিক একত্র হয়ে হিন্দু-মুসলমান যে আলাদা জাতি নয়, ভারত-জননীর দুই সন্তান মাত্র, তাও আজ এই ঘটনার মধ্য দিয়ে প্রমাণ করল। তারা দুই সম্প্রদায় হতে পারে, কিন্তু দুই জাতি যে নয় তা প্রমাণিত হল। দ্বিজাতি-তত্ত্ব আজ আমাদের কাছে ভুয়া প্রমাণিত হল। তা ছাড়া সৈন্যবাহিনীর মধ্যে ব্যারাকের দেয়াল বা জাহাজের গায়ে রাজনৈতিক শ্লোগান লিখে পোস্টারিং করা পূর্বে কি কখনো কেউ কল্পনা করতে পেরেছি? আর একটি কথা আমাদের শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করা কর্তব্য যে, আমাদের পরমশ্রদ্ধেয়া দুই ভগ্নি, উর্মিলা বাঙ্গ এবং অমুভা সেন আজ দেশের জন্যে কারান্তরালে অশেষ নির্যাতন ভোগ করছেন। জানি না তাঁদের ভাগ্যে কী অপেক্ষা করছে! তবে এ-বিষয়ে আমরা নিশ্চিত যে, তাঁরা মহান ভারত-জননীর পায়ে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পিত-প্রাণ; প্রাণ থাকতে কোনো ভাবেই তাঁরা স্বীকারোক্তি করবেন না। আমাদের কর্তব্য হল, বিদ্রোহের চরম পর্যায়ে মুলন্দ বন্দিশিবির ভেঙে ব্রিটিশের কলংকিত হাত থেকে তাঁদের মুক্ত করা।'

এর পরে সাকসেনা পাঁচখানা যুদ্ধজাহাজ যা আগামীকাল আফ্রিকা সীমান্তের দিকে যাত্রা করবে তার বিষয়ে বক্তব্য রাখলেন। তিনি বললেন, 'আমরা যেন মনে না করি যে, ব্রিটিশ আন্তরিকতা সহকারে মিত্রপক্ষকে সাহায্য করার জন্যে ঐ জাহাজগুলোকে আফ্রিকার সীমান্তে পাঠাচ্ছে। ব্রিটিশের এ একটা চাল মাত্র। তারা এক ঢিলে দুই পাখি মারার ব্যবস্থা করছে। অর্থাৎ একদিকে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষ করে মিত্রপক্ষের দৃষ্টিতে সাহায্যের নামে সুনাম প্রতিষ্ঠা করা; সে-সাহায্য যতই মান্ধাতা আমলের অকেজো জরাজীর্ণ কামান-বন্দুক ও জাহাজ হোক না কেন। তারা শুধু দেখাতে চাইছে: আমি সাহায্যের জন্যে এগিয়ে এসেছি, তোমরা বীরত্ব সহকারে যুদ্ধ করো। অপরদিকে, ব্রিটিশ সুকৌশলে ভারতীয় সৈন্যদের, যারা ব্রিটিশের চোখে 'বিপজ্জনক' বলে চিহ্নিত হয়েছে, যুদ্ধ-ক্ষেত্রের অগ্রবর্তী বাহিনী করে পাঠানোর নামে সমুদ্রের মাঝদরিয়ায় নিয়ে গিয়ে ডুবিয়ে মারবার ব্যবস্থা পাকাপাকি করেছে। পরে প্রচার করা হবে যে, ঐ সৈন্যরা যুদ্ধক্ষেত্রে মারা গেছে। এই খবর গোপনপথে আমার কাছে এসেছে। এ-খবর সত্য। ব্রিটিশ বুঝতে পেরেছে, ভারতীয় সেনাবাহিনীতে ভারত মুক্তির রাজ-নৈতিক আদর্শ অনুপ্রবেশ করেছে। অতএব যেভাবেই হোক লোকচক্ষুর অন্তরালে ঐ সমস্ত সৈন্যদের খতম করে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীকে আবার নতুন করে সাজাতে হবে আদর্শবিহীন নিরেট ভাড়াটে সৈন্য হিসাবে। কেন না, এই সেনাবাহিনীই তো হল ব্রিটিশ সাম্রাজ্য রক্ষার মেরুদণ্ড, অতএব ব্রিটিশের এই অবাঞ্ছিত বাসনাকে আমাদের দেশের বৃহত্তর স্বার্থেই কঠোর লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে ভেঙে চুরমার করে

তাকে অতৃপ্ত বাসনায় রূপায়িত করবার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করতে হবে। আমার মনে হয়, বর্তমানে বিপ্লবীদের এই বোধহয় চরম কর্তব্য।'

তারপরে তিনি বর্তমান পরিস্থিতির ভিত্তিতে কতকগুলি কর্মসূচী গ্রহণের প্রস্তাব রাখলেন সদস্যদের সামনে। যদিও এই কর্মসূচী পূর্বেই এ্যাকশন কমিটিতে গ্রহণ করা হয়েছিল, তবুও আবার তাকে নতুন করে প্রস্তাব আকারে সভায় রাখা হল এই জন্যে যে, পূর্বে আমাদের প্রকাশ্য আন্দোলনের দিন ধার্য করা হয়েছিল ১৯৪৪ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি। এবারে তা আরম্ভ হচ্ছে ১১ ফেব্রুয়ারি। অবশ্য এও পূর্বে ঠিক হয়েছিল, যেদিনই আমাদের আফ্রিকা-সীমান্তে পাঠানো হবে সেই দিনই আমরা প্রকাশ্য আন্দোলনে নামব। সেখানে কোনো নির্দিষ্ট দিন ধার্য করা হয় নি। নতুনত্ব এইখানে যে, এবারে নির্দিষ্ট দিন ধার্য করা হল। ফলে সমগ্র সৈন্যবাহিনীতে (স্থল, নৌ ও বিমান) সর্বত্র কেন্দ্রীয় গোপন সংস্থার নেতৃত্বে আগামী ১৮ ফেব্রুয়ারি নির্দেশিত প্রকাশ্য আন্দোলনের দিন পরিবর্তন করে আগামী ১১ ফেব্রুয়ারি ধার্য করা হচ্ছে। যদিও এটা নৌবাহিনীর সিদ্ধান্ত, তবুও তা সমগ্র সৈন্যবাহিনীতে সিদ্ধান্ত মতই কার্যকরী হবে। কেন না পূর্বেই কেন্দ্রীয় গোপন সংস্থার অনুমোদিত সিদ্ধান্ত ছিল যে, যেদিন নৌবাহিনীর যুদ্ধজাহাজ আফ্রিকার সীমান্তে পাঠানো হবে, তা নির্দেশিত ১৮ ফেব্রুয়ারির পূর্বে হলেও, সেই দিনই প্রকাশ্য আন্দোলন আরম্ভ করতে হবে এবং তা পূর্বে গোপন সংস্থাকে জানিয়ে দিতে হবে, যাতে তাঁরা (কেন্দ্রীয় গোপন সংস্থা) প্রস্তুত হতে পারেন অন্য দুই বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে। তাই এই গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তুতি।

সাকসেনা প্রস্তাব রাখলেন, '১৯৪৪ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি প্রকাশ্য আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে সৈন্যরা সকালে তাদের চা-পান থেকেই খাদ্য-গ্রহণ বর্জন করবে। কারণ, ব্যারাক-জীবনের এমন এক বিষয়কে বেছে নেওয়া প্রয়োজন যাতে প্রত্যেকটি রেটিং বা সৈন্য জড়িত থাকে। যে-খাবার আমাদের দেওয়া হচ্ছে, সে তো শুধু খারাপই নয়, যেমনি অখাদ্য, তেমনি অরুচিকর। তার ওপরে রয়েছে খাবারের স্বল্পতা। এককথায় আমাদের খাবার নিকৃষ্ট, অপর্যাপ্ত। সুতরাং খাবার গ্রহণ অস্বীকার করতে হবে। তাহলে সামগ্রিকভাবেই সৈন্যদের মনে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে এক অনমনীয় ও তেজোদ্দীপ্ত সংগ্রামের স্পৃহা জাগবে। তার কারণ হল, তারা মনে করতে আরম্ভ করবে যে, খারাপ খাবার সরবরাহ করার মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকার তাদের (সৈন্যদের) কালা আদমি বলে ঘৃণা করে সামগ্রিকভাবে তাদের বিরুদ্ধে এক কঠোর শাস্তির বিধান করে রেখেছে। অতএব এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা একান্ত প্রয়োজন। সৈন্যরা যেহেতু খাবার গ্রহণ করবে না, সেইহেতু কোনো কাজও আর করবে না। তিনি এই ভিত্তিতে শ্লোগান রাখলেন, 'না ফুড, নো ওয়ার্ক', বা 'না খাবার না-কাজ'। দ্বিতীয় পর্যায়ে আমরা ধাপে ধাপে পুরোপুরি রাজনৈতিক আন্দোলনে নেমে পড়ব। প্রয়োজনবোধে, শুধুই প্রয়োজনবোধে নয়, প্রয়োজন হবেই ধরে নিতে

হচ্ছে, প্রথমদিকে ব্যারাকের স্টোর-রুম ভেঙে যে-সমস্ত অস্ত্র পাওয়া যাবে তা লুঠ করে সৈন্যদের হাতে তুলে দিতে হবে। পরে যখন আরো অস্ত্রের প্রয়োজন হবে তখন জাহাজগুলির এবং সমুদ্রতীরবর্তী অস্ত্রভাণ্ডার ভেঙে লুঠ করে সৈন্যদের এবং সমর্থিত জনগণের হাতে তা তুলে দেওয়া হবে বৃহত্তর বিপ্লবের জন্যে। বিশ্বাস রাখুন, জনগণ আমাদের সঙ্গে আছেন। এই পর্যায়ে এসে আমরা শ্লোগান তুলব—'ব্রিটিশ, তুমি ভারত ছাড়ো', 'কংগ্রেস লিগ এক হোক', 'এখনই বিদ্রোহ করো' 'আমরা সবাই আজাদ হিন্দি', 'গোরা সৈন্যদের হত্যা করো', 'দিল্লী চলো', 'স্বাধীন ভারত—জিন্দাবাদ', ইত্যাদি পুরোপুরি রাজনৈতিক শ্লোগান। অন্তর্ঘাতী কাজও চলবে সাথে সাথে।'

আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা লিপিবদ্ধ করে এবং সময়োচিত কর্মসূচীর প্রস্তাবগুলি গ্রহণের আবেদন রেখে সাকসেনা নিজ আসনে বসে পড়লেন। সভাপতি সুবল চন্দ্র ধর এবারে শেখ শাহাদত আলিকে আলোচনায় অংশগ্রহণের অনুরোধ জানালেন। শেখ শাহাদত আলি উঠে দাঁড়িয়ে খুবই সংক্ষেপে বললেন, 'মিঃ সাকসেনা (আমাদের এ্যাকশন কমিটির যিনি সম্পাদক অথবা আরো ভাল ভাবে বলা যায়, যিনি আমাদের নৌবাহিনীর রাজনৈতিক আন্দোলনের নেতা) যা বললেন, তার প্রতিটি কথা বা শব্দ শুধু আক্ষরিক অর্থেই নয়, মর্মার্থের দিক থেকেও খাঁটি সত্য। কর্মসূচীর প্রস্তাবগুলিও সময়োচিত গ্রহণযোগ্য। আমি কথা না বাড়িয়ে শুধু বলতে চাই যে, তাঁর সামগ্রিক বক্তব্যকে আমি সর্বান্তকরণে গ্রহণ করেছি এবং উপস্থিত সকলে আলোচনা করে সর্বান্তকরণে এবং সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করুন—এই আবেদন রাখছি। মনে রাখতে হবে এ-সংগ্রাম কিন্তু মৃত্যুঞ্জয়ী সংগ্রাম।'

শেখ শাহাদত আলি তাঁর সমর্থন জানাবার পর সভাপতি সকলের ব্যক্তিগত মত গ্রহণ করতে আরম্ভ করলেন। কেন না, তিনি জানেন, এই সংগ্রাম সাধারণ সংগ্রাম নয়, এই সংগ্রাম জীবন-মৃত্যুর সংগ্রাম। অতএব সকল সদস্যের ব্যক্তিগত মতামত জানা একান্ত প্রয়োজন। তিনি এও জানতেন, অনেকের ভাগ্যে হয়তো আজ রাত্রের মতই খাদ্য গ্রহণ শেষ হবে। আর হয়তো তাদের জীবনে খাওয়াই হবে না। তাই তিনি ভাল করে যাচাই করতে চাইলেন। আমরা সবাই ভালভাবে মৃত্যুর নিশানা জেনেই দু'হাত তুলে সর্বসম্মতিক্রমে সম্পাদকের প্রস্তাব গ্রহণ করলাম। কেননা মৃত্যু যেখানে নিশ্চিত, সেখানে বীরের মত মৃত্যুকে গ্রহণ করাই বুদ্ধিমানের কাজ। ভীরুতার সাথে মৃত্যু কলংকস্বরূপ। এ-কথা বলতে দ্বিধা নেই যে বিপদ সম্বন্ধে আমরা সকলেই সচেতন ছিলাম। এই লড়াইয়ের পরিণতি যে কী হতে পারে, তাও আমরা পূর্বাহ্নেই আঁচ করে নিয়েছিলাম। আমরা ঠিক করলাম, যা খাবার আজই খেয়ে নিতে হবে; আগামীকাল (১১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৪) সকাল থেকে আর খানা খাবো না—'খানা বন্ধ'।

বিবিধ কর্মসূচীতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল যে, আজ রাত সাড়ে বারোটার

মধ্যেই (আমাদের মিটিং চলেছিল রাত এগারোটা পর্যন্ত) আমাদের নৌবাহিনীর এ্যাকশন কমিটির নিজস্ব গোপন পথে কেন্দ্রীয় গোপন সংস্থাকে জানিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে আজ রাতের মধ্যেই কেন্দ্রীয় গোপন সংস্থার মাধ্যমে অন্য দুই বাহিনী (স্থল ও বিমান) ১১ ফেব্রুয়ারি একই দিনে একই সময়ে 'খানা বন্ধ'-এর কাজ শুরু করে। সঙ্গে সঙ্গে এ্যাকশন কমিটির গোপন যোগাযোগ ব্যবস্থা এই পরিকল্পনাকে রূপদান করল ১০ ফেব্রুয়ারি রাত সাড়ে এগারোটার মধ্যে কেন্দ্রীয় গোপন সংস্থাকে জানিয়ে দিয়ে। মনে হল ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহ ১৯৪৪ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি রাত্রি এগারোটায় এসে আমাদের কানে কানে যেন বলে গেল, 'আমি মরি নি—আবার এসেছি; ১১ ফেব্রুয়ারি সকাল থেকে নতুন মূর্তিতে মৃত্যুঞ্জয়ী সংগ্রামে লিপ্ত হব। এতদিন তোদের জন্যেই তো অপেক্ষা করছিলাম। তোরা আমার সাথী। এবারে আমি আমার সাথীদের ফিরে পেয়েছি। তাই, আজ আমার অফুরন্ত আনন্দ,—এ-আনন্দ স্বর্গীয় আনন্দ!'

স্বর্গ যেন নেমে এল আনন্দস্বরূপে ধরাধামে। কবিও যেন গেয়ে উঠল আমাদের সাথে:

'ফুটল রে ঐ সত্য-তপন অন্ধকারের পুঞ্জ নাশি,
বাজল দয়াল বিশ্বনাথের শাশ্বত ঐ মধুর বাঁশি॥
শিউরে ওঠে সপ্ত ভুবন অমৃত তাঁর দৃপ্ত স্বরে,
হাঁকছে প্রভু বংশীনাদে, আর তো আমি নই রে দূরে॥
কাঁদিস নে আর শংকা কিসের আর্ত কে রে দুঃখে ভোগে,
'ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে'॥

* * * *

সোনার সমাজ ডুবছে বলে দুঃখ কি তায় শংকা কি রে,
মগ্ন তো নয় সৃষ্টি হবার নবীন আভাস আসছে ফিরে॥
চলছে যে এক বিরাট সাধন বিশ্ব-হিয়ায় রাত্রি দিবা,
ক্ষিত্যপ্‌তেজমরুদ্ব্যোমে আসছি আবার শংকা কিবা॥
বিপন্ন কে আয় কোলে ক্ষুৎপিপাসায় দুঃখে ভোগে,
'ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে'॥'

১১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৪ সাল। নতুন প্রভাতে দেখা দিল নতুন সূর্য। আরব সাগর তখনো শান্ত। মৃদুমন্দ হাওয়ায় সে আনন্দ লহরী ছড়াচ্ছে। তার বুকে অবস্থানরত 'ধনৌজ', 'কুমাওন', 'আউধ,' 'মাদ্রাজ' এবং 'লরেন্স'—এই পাঁচখানা জাহাজ নিয়ে একটা স্কোয়াড্রন করে আফ্রিকাতে পাঠাবার ব্যবস্থা হচ্ছে। সকাল থেকেই উচ্চপদস্থ অফিসাররা তা নিয়ে ব্যস্ত। বেলা দু'টোয় ঐ স্কোয়াড্রন যাত্রা

করবে। গোপন সূত্রে ঐ পূর্ব-কথাও আবার শোনা গেল, যাদের নাম পাওয়া গেছে এবং যাদের কর্তৃপক্ষ 'বিপজ্জনক' বলে মনে করে, সেই সমস্ত ভারতীয় সৈন্যদের ঐ জাহাজগুলোতে নিয়ে মাঝ-সমুদ্রে ডুবিয়ে মারবে। পরে ঘোষণা করবে, যুদ্ধে মারা গেছে। আরো জানতে পারা গেল, আপাতত মোট ষোল হাজার সৈন্য আর চার হাজার ছোট-বড় অফিসার ঐ পাঁচখানা জাহাজে পাঠানো হবে। কামান-বন্দুক, গোলা-গুলি-বারুদের পরিমাণও একেবারে কম নয়, তবে তা বেশির ভাগই অকেজো। এই সংবাদে রেটিংদের মধ্যে প্রচণ্ড বিক্ষোভ ও আলোড়নের সৃষ্টি হল। এদিকে আমরা যা সিদ্ধান্ত নিয়েছি তার প্রতি অটল অনড় আস্থা রেখেই চলেছি। আজ সকাল থেকেই 'খানা বন্ধ্'-এর ডাক। কয়েক রাত ধরেই ঘুম হচ্ছে না। এ-ব্যারাক সে-ব্যারাক ঘুরেছি, অবশ্যই গা-ঢাকা দিয়ে। আরব সাগরে অবস্থিত জাহাজগুলোতে বেতারসংকেতে খবর পাঠানো হয়েছে। যে-পাঁচখানা জাহাজ আফ্রিকায় পাঠাবার ব্যবস্থা হচ্ছে সেগুলোতে অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপ চালানোর জন্যে সাতজন বিশ্বস্ত রেটিংকে নিয়োগ করা হল প্রয়োজন মত পূর্ব-নির্দেশিত পথে ধ্বংসাত্মক কাজগুলো সমাধানের জন্যে।

সকাল থেকেই আরম্ভ হয়েছে 'খানা বন্ধ্'-এর আন্দোলন। কেউ সকালের খাবার খেল না। রেটিংরা সবাই এ-আন্দোলনে যোগ দিল। পূর্বাহ্ণে কর্তৃপক্ষকে কোনো নোটিশ দিই নি আমরা। অতর্কিতে আরম্ভ করার কথা ছিল। কেননা, মিলিটারিতে সাধারণভাবেও কোনো যুক্ত বা ঐক্যবদ্ধ দাবি অথবা আবেদন রাখা, আর ঐক্যবদ্ধভাবে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে লড়াই করা—একই কথা। এটাকে মিলিটারি নিয়ম-কানুনে বিদ্রোহ বলেই আখ্যায়িত করা হয়। আমরা কিন্তু মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও সেই বিদ্রোহের দিকেই পা বাড়ালাম।

কর্তৃপক্ষের কানে গেল, আমরা সকালের চা পানে বিরত আছি। আমার র‍্যাংক ছিল পোর্ট অফিসার। অফিসারদের খাবারের জায়গা ছিল আলাদা। সেখানেও বেশির ভাগ ভারতীয় অফিসার চা পান করে নি। সমস্ত ব্যারাকগুলিতে এবং জাহাজগুলিতে ঐ একই দৃশ্য পরিলক্ষিত হল। সর্বত্রই যুদ্ধক্ষেত্রের পূর্বাবস্থা বিদ্যমান। আপাতত হাতে অস্ত্র নেই বটে, কিন্তু প্রয়োজনে তাও নেওয়া হবে—সে-প্রস্তুতিও নেওয়া হয়েছে। আরব সাগরের জাহাজগুলির রেটিংরাও বসে নেই। তারাও খানা বন্ধ্ করেছে। মহিলা ব্যারাকেও খানা বন্ধ্। বেতার সঙ্কেতে মদনলাল সাকসেনা করাচীকেও ব্যবস্থা নিতে বলে দিয়েছেন। খবর পাওয়া গেল, তারাও খানা বন্ধ্ করেছে। কর্তৃপক্ষ এবারে সম্মুখ সমরে নেমে পড়ল। প্রথমে জুনিয়র কম্যাণ্ডিং অফিসাররা ঘুরে ঘুরে সকলকে বোঝাবার চেষ্টা করল, কিন্তু কোনো ফল হল না। ব্রিটিশ অফিসাররা কেউ আসে নি। তারা পাঠিয়েছিল সেই সব ভারতীয় অফিসারদের (সংখ্যায় যারা খুবই কম), যারা নিজেদের ভবিষ্যৎ উন্নতি চেয়েছিল সৈন্যদের তথা সমগ্র দেশের স্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে। রেটিংরা ঘৃণাভরে তাদের

প্রত্যাখান করেছে। উলটে তারা জেনে গেল, নাবিকরা কোনো খাবার গ্রহণ করবে না, যতক্ষণ তাদের দাবিগুলো পূরণ না হচ্ছে। নাবিকদের দাবিগুলো কী—জানতে চাওয়ায় কয়েকজন নাবিক তাদের নিয়ে এল সাকসেনার কাছে। সাকসেনা এ্যাকশন কমিটির সম্পাদক হিসাবে তাদের সামনে লিখিতভাবে দাবিগুলো রাখলেন। দাবিগুলো হল :

১ ভারতীয় সৈন্যদের ব্রিটিশ সৈন্যের মত ভাল খাবার চাই।

২ ব্রিটিশ সৈন্যের মত ভাল পোশাক চাই।

৩ হেড কোয়ার্টার থেকে নিয়মিতভাবে প্রতিমাসের দু' তারিখের মধ্যে প্রত্যেক সৈন্যের বাড়িতে বেতন পাঠিয়ে দিতে হবে।

৪ ব্রিটিশ সৈন্যর সাথে পক্ষপাতমূলক এবং ভারতীয় সৈন্যদের প্রতি বৈষম্যমূলক ব্যবহার করা চলবে না।

৫ যে-দুই মহিলাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাঁদের অবিলম্বে বিনাসর্তে মুক্তি দিতে হবে বা নির্দোষ বলে ছেড়ে দিতে হবে।

৬ সৈন্যবাহিনীকে সর্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে—ইত্যাদি।

জুনিয়র কম্যাণ্ডিং অফিসাররা সহানুভূতিসূচক মনোভাব দেখিয়ে চলে গেল। অবশ্য সহানুভূতি না দেখিয়ে উপায়ও ছিল না। একে তো ভারতীয় অফিসার, তার উপরে আবার এসেছে ভারতীয় নাবিকদের আন্দোলনকে বুঝিয়ে-সুজিয়ে ভেঙে দিতে। ফলে নাবিকদের কাছে তারা দালালরূপে পরিগণিত হয়েছে। বর্তমানে নাবিকদের মনের যে-অবস্থা, তাতে যদি এতটুকুও বেফাঁস কথা বলত বা অন্য কোনোপ্রকার নাবিকদের স্বার্থবিরোধী কাজ হাতে-কলমে করত তাহলে নাবিকদের হাত থেকে তাদের পিঠ বাঁচানো দায় হয়ে উঠত। এমনকি সম্পাদকের কথাও নাবিকরা শুনত কি না সন্দেহ—বর্তমান অবস্থা দাঁড়িয়েছে এইরূপ।

দুপুর গড়িয়ে একটা বাজল। রান্না-করা খাবারগুলো পড়ে আছে। সকালের তৈরি চা এবং অন্য খাবারগুলোও ইতিপূর্বে নষ্ট হয়েছে। সবদিকেই একটা সাজ সাজ রব। সমুদ্রতীরবর্তী নৌবাহিনীর যতগুলো সংগঠন ছিল সমস্ত সংগঠনই এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছে। সকলেই খানা বন্ধ্ করেছে। চতুর্দিকেই যেন বহুদিনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ ফেটে পড়তে লাগল। ইতস্তত বিচ্ছিন্নভাবে যেখানেই গোরা সৈন্যদের বা ইউরোপিয় অফিসারদের দেখতে পেল সেখানেই সাধারণ রেটিংরা তাদের ব্যঙ্গ করে 'টমি' বলে উপহাস করতে লাগল। ফলে কিছুক্ষণ বাদে দেখা গেল, গোরা সৈন্যরা ক্রমে ক্রমে নিজ নিজ ব্যারাকের আস্তানায় যেন আত্মগোপন করে রয়েছে। এতে রেটিংদের মধ্যে আরো উৎসাহের সঞ্চার হল। এরই মধ্যে খবর পাওয়া গেল, কম্যাণ্ডিং অফিসার ক্যাপ্টেন ইনিগো জোনস একদল গোরা সৈন্য নিয়ে এম আর ব্যারাক্স-এ (সেখানেও খানা বন্ধ্-এর আন্দোলন চলছিল) কোনোপ্রকার সতর্ক না করে নিরস্ত্র ভারতীয় সৈন্যদের ওপরে

অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আক্রমণ চালিয়েছে। ভারতীয় সৈন্যরাও মরিয়া হয়ে ইট-পাটকেল ছুড়ে গোরা সৈন্যদের বাধা দিচ্ছে। ভারতীয় সৈন্যদের আক্রমণের কৌশল জোরালোই ছিল। ফলে সেখানে দু'জন গোরা সৈন্য আহত হয়েছে। লড়াই জোর কদমে চলছে। আরো জানা গেল, যে-দু'জন মহিলাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাঁদের কাছ থেকে গুপ্ত ষড়যন্ত্রের খবরাখবর বের করার জন্যে নির্মমভাবে তাঁদের ওপরে অত্যাচার চালাচ্ছে। তবুও তাঁরা কিছুই প্রকাশ করেন নি। তাঁরা নাকি বলেছেন. 'মরব তবু কিছুই বলব না।' শুনে ভাবলাম, সত্যিই তাঁরা আদর্শস্থানীয়া। তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধায় মাথা আপনা থেকেই নত হল। ক্রমে এই সংবাদও বায়ুর বেগে ছড়িয়ে পড়ল অন্যান্য ব্যারাকেও। সঙ্গে সঙ্গে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৈন্যদের মধ্য থেকে শ্লোগান উঠল, 'ভারত ছাড়ো'। দেখতে দেখতে রাজনৈতিক শ্লোগানও উচ্চারিত হল। ইংরাজদের প্রতিরোধের সব কিছুই যেন বেসামাল হয়ে পড়ল।

ওদিকে এম আর ব্যারাক্স-এর ওপরে গুলি চালাবার আদেশ হয়েছে এবং গুলি চলছে। ক্যাসেল ব্যারাকের ভারতীয় সৈন্যরা যখন শুনল, এম আর ব্যারাক্স-এর ওপরে গুলি চলেছে, তখন তারা দলবদ্ধভাবে ব্যারাক থেকে বেরিয়ে উচ্চৈঃস্বরে শ্লোগান দিতে দিতে এগিয়ে যেতে থাকল ক্যাসেল ব্যারাকের স্টোর-রুমের দিকে। শ্লোগান ছিল, 'ব্রিটিশ, তুমি ভারত ছাড়ো', 'গোরাদের হত্যা করো', 'অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করো' ইত্যাদি। সেখানে এসে স্টোররুম আক্রমণ করল। যদিও সেখানে খুব বেশি অস্ত্রশস্ত্র থাকত না, প্রয়োজনের তুলনায় সামান্যই, তবু যতটা পাওয়া যায় প্রথম পর্যায়ের সাথী হিসাবে। অবশ্য সবই পূর্ব-পরিকল্পিত ছিল। সেখানে বাইরে পাহারারত ভারতীয় সৈন্যরা দরজা খুলে দিলে বিদ্রোহী সৈন্যরা ভেতরে ঢুকে দু'জন পাহারারত গোরা সৈন্যকে হত্যা করে এবং সেখানে রক্ষিত সামান্য অস্ত্রশস্ত্র হাতে নিয়ে এম আর ব্যারাক্স-এর দিকে মারমুখো হয়ে ছুটে গিয়ে গোরা সৈন্যদের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে গুলি চালাতে থাকে। বেশ একটা খণ্ডযুদ্ধ শুরু হল। ভারতীয় রেটিংদের এরকম বেপরোয়া সাহসই ছিল উল্লেখযোগ্য। এতটা ঘটতে পারে তা ব্রিটিশরা কিন্তু কল্পনাও করে নি। তাই তারা একটু দিশেহারা হয়ে পড়ল। উভয় পক্ষেই কিছু হতাহত হল। ব্রিটিশ সৈন্য—এমন কি স্বয়ং ইনগো জোনস মনে করেছিলেন যে, তাঁদের পক্ষ থেকে সর্বপ্রথম আগ্নেয়াস্ত্র দ্বারা ভারতীয় সৈন্যদের ওপরে আক্রমণ চালালে ভীরু ভারতীয়রা অবিলম্বে আত্মসমর্পণ করবে। কিন্তু ভারতীয়দের রক্তেও যে লড়াইয়ের স্রোত বইছে তা মিঃ জোনস ভুলে গিয়ে-ছিলেন। তাঁর সেই ভুল ভাঙল ভারতীয়দের অদ্ভুত সাহস দেখে। এমন কি সাহস দেখে আক্রমণকারী উপহাসের পাত্র 'টমি'রাও প্রশংসা করতে বাধ্য হয়েছিল। পূর্বেও বলা হয়েছে যুদ্ধক্ষেত্রে বা কার্যক্ষেত্রে যোগ্যতায় ভারতীয় সৈন্যরা ব্রিটিশের তুলনায় অনেক বেশি পারদর্শিতা দেখাতে সক্ষম ছিল। এও তার একটি প্রমাণ। ক্যাপ্টেন ইনিগো জোনস রণনীতির কৌশলের বিচারে ঠিক করলেন, এম আর

ব্যারাক্স-এর গোরা সৈন্যদের ওপর থেকে ভারতীয় সৈন্যদের আক্রমণের চাপ কমাবার জন্যে আর একদল গোরা সৈন্য নিয়ে অন্যপথে এসে ক্যাসেল ব্যারাক আক্রমণ করবেন। আক্রমণ করলেনও। ক্যাসেল ব্যারাকে অবস্থানরত রেটিংদের কয়েকজন ছুটে গেল 'তলোয়ার' জাহাজের পরিবহণ সংস্থায় খবর দিতে। সেখান থেকে 'তলোয়ার' জাহাজে এবং তারপর সমুদ্রতীরের জাহাজ ও অন্যান্য সংগঠনে।

তারা লাউডস্পিকারের সাহায্যে ভারতীয় সৈনিকদের উদ্দেশে বলছিল, 'ভাই সকল, আমরা কেবল নিজেদের জন্যই এ-যুদ্ধ করছি না—করছি দেশের স্বাধীনতার জন্য—তাই এ-যুদ্ধ তোমাদের সকলের। ঝাঁপিয়ে পড়ো। কালবিলম্ব করো না। এম আর ব্যারাক্স ও ক্যাসেল ব্যারাক গোরা সৈন্যদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। সেখানে আমাদের ভাইয়েরা জোর লড়াই করছে। 'টমি'রা আমাদের অনেক ভাইকে সেখানে গুলি করে মেরে ফেলেছে। ভাইয়ের রক্ত ঝরছে সেখানে। আমরা কি চুপ করে থাকতে পারি! তাড়াতাড়ি ছুটে এসো। গোরাদের হত্যা করো। এই দেশ থেকে ব্রিটিশকে চিরতরে হটিয়ে দেবার সংকল্প গ্রহণ করো।'

ঠিক এই সময়েই সমুদ্রে অবস্থিত যে-পাঁচখানা যুদ্ধ-জাহাজ আফ্রিকায় যাবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিল সেই পাঁচখানা জাহাজেই হঠাৎ বিস্ফোরণে আগুন ধরে গেল। জাহাজ ক'টি দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। এতে অবস্থা আরো ভীষণ আকার ধারণ করল। রোষাগ্নি চরমে উঠল। ক্যাসেল ব্যারাকে অবস্থিত ভারতীয় সৈন্যরা তখন জোর কদমে লড়াই করছে। উভয় পক্ষ অস্ত্র ধারণ করেছে এবং জোরালো লড়াই চলছে। বড় রকমেরই এক লড়াই বাধল, অনেকে মারা গেল, অনেকে আহত হল। লোক-মারফৎ খবর পেয়ে 'তলোয়ার' জাহাজের পরিবহণ সংস্থার এবং অন্যান্য জাহাজের ও সংস্থার ভারতীয় সৈন্যরা ছুটে এসে, 'এ-যুদ্ধ স্বাধীনতার যুদ্ধ, এ-যুদ্ধ তাদের মুক্তির যুদ্ধ', মনে করে ঐক্যবদ্ধ হয়ে গোরা সৈন্যের তথা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে একত্রে লড়াই চালাতে লাগল, যার যা হাতে ছিল তা দিয়েই। ক্রমে ক্রমে সমুদ্রতীরের নৌবাহিনীর অন্যান্য সংগঠনগুলোতেও এই যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ল। বেতার-সংকেতে খবর পাওয়া গেল, একটু দূরে করাচীতেও থানা বন্ধ্-এর আন্দোলন এখন সশস্ত্র সংগ্রামে পরিণত হয়েছে। সেখানেও অনেক হতাহত হয়েছে। করাচীসহ গোটা নৌবাহিনী আজ রণক্ষেত্রে পরিণত। রক্তক্ষয়ী আন্দোলন চলছে সর্বত্র।

বিপ্লবীরা মনে করতেন, কংগ্রেসের গণ-অভ্যুত্থান আইন-অমান্য আন্দোলনের মধ্য দিয়েই দুর্বার ও দুর্জয় হয়ে উঠবে দেশ। আর বিপ্লবীরা সেই আইন অমান্যের ক্ষেত্রকে বৃহত্তর সশস্ত্র আন্দোলনের রূপ-রেখায় টেনে নিয়ে যাবে। এখানেও সেই পদ্ধতি প্রয়োগ করা হল থানা বন্ধ্-এর মধ্য দিয়ে। আর তার চরম পরিণতি লাভ করল সশস্ত্র সংগ্রামে। কিন্তু সংগ্রামের জন্য চাই গণসমর্থন ও স্বদেশপ্রেম। সংগ্রামের মধ্য দিয়েই তো গড়ে ওঠে সংগ্রামী মন ও সংগঠন। যারা চলে

তাদেরই পায়ের তলায় জেগে ওঠে পথ। সেই জেগে-ওঠা পথ ধরেই এগোতে লাগলাম আমরা। পথের শেষ কোথায় তা জানি না।

এর পরে ব্রিটিশ সৈন্যদের দেখা পাওয়া ভার হল। দেখলাম, পঁয়ত্রিশ জন গোরা সৈন্যের মৃতদেহ পড়ে আছে। আর আহত হয়ে পড়ে কাতরাচ্ছে তিনশ জন। ভারতীয় সৈন্যও মারা গেছে এগারো জন, আহত হয়েছে ২২৫ জন। এখন আর গোলা-গুলির বিকট আওয়াজ শোনা যাচ্ছে না। সর্বত্র স্তব্ধতা বিরাজ করছে। প্রকৃতিও যেন শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। অস্তমিত হল ১১ ফেব্রুয়ারির লাল সূর্য। আমরা (এ্যাকশন কমিটির সদস্যরা) আহত সৈন্যদের ব্যারাকে শুশ্রূষার ব্যবস্থা করলাম আর নিহতদের মরদেহ রেখে দেওয়া হল সনাক্ত করার জন্যে। স্বাধীনতা সংগ্রামী শহিদদের শ্রদ্ধা জানালাম নতজানু হয়ে, আর প্রতিজ্ঞা করলাম, দেশজননীর শৃঙ্খল মোচন করে পরাধীনতার অভিশাপ দূর করে এই শহিদদের অমর আত্মার শান্তি লাভ করাবো।

এর পরে আমরা পরবর্তী বৃহত্তম সংগ্রামের জন্যে প্রস্তুত হতে লাগলাম। কেননা বুঝতে পেরেছিলাম যুদ্ধক্ষেত্র থেকে গোরা সৈন্যদের উধাও হবার উদ্দেশ্য একটিই হতে পারে, তা হল বেশি করে শক্তি সঞ্চয় করে অতর্কিতে রাত্রির অন্ধকারে আমাদের ওপরে আক্রমণ করা। বর্তমান অবস্থায় আমরাই ছিলাম বেশি শক্তিশালী। সমস্ত ব্যারাক, জাহাজ এবং অন্যান্য সংগঠনগুলো তখন আমাদের করায়ত্বের মধ্যে। এক কথায় বলা যায় এখন আমরাই যেন সর্বেসর্বা। একটি ইংরাজেরও দেখা পাওয়া গেল না। আমরা ঠিকও করলাম, নিরাপত্তা বাহিনীকে এড়িয়ে যুদ্ধের জন্যে যে-সমস্ত জিনিসের প্রয়োজন, বিশেষ করে অস্ত্রশস্ত্রের এবং লোকবলের, তার জন্যে প্রস্তুতি চালাতে থাকব। সমুদ্রতীরে বড় বড় অস্ত্র-ভাণ্ডারগুলো এবং জাহাজের অস্ত্র-ভাণ্ডারগুলো লুঠ করে ভারতীয় সৈন্যদের হাতে তুলে দেবার পরে যা থাকবে তা সৈন্যবাহিনীর বাইরে. বিশেষ করে নৌবাহিনীর বাইরে যেসব জনসাধারণ আমাদের সমর্থন করেছে, তাদের হাতে গোপন সংস্থার মাধ্যমে যাচাই করে দেওয়া হবে, যাতে তারাও আমাদের সাথে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সশস্ত্র লড়াইয়ে সামিল হতে পারে। অস্ত্রভাণ্ডার লুঠের জন্যে বেশ বড় একটি বাছাই করা ভারতীয় সৈনিক দল ঠিক করা হল। আরো ঠিক হল, গভীর রাতে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আমরাই প্রথমে বড় একদল ভারতীয় সৈন্য দ্বারা অতর্কিতে ফ্ল্যাগশিপ আক্রমণ করে ফ্ল্যাগ-অফিসারসহ সমস্ত ইংরাজ অফিসার ও গোরা সৈন্যদের বন্দি করে ফেলব। পরে গোপন সংস্থার মাধ্যমে দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি বিচার করে অন্যান্য সিদ্ধান্ত নেব। কারণ, আমরা তখনো জানতাম, এই বিদ্রোহ শুধু নৌবাহিনীতেই হয় নি, বাকি বাহিনীতেও (স্থল ও বিমান) বিদ্রোহ হয়েছে একই দিনে। অতএব সেখানেও তো অনেক ইংরাজ অফিসার এবং সৈন্য বন্দি হবেই। তাই সমস্ত বন্দিদেরই বিচার হবে একসঙ্গে এবং তা হবে কেন্দ্রীয় গোপন

সংস্থার সিদ্ধান্ত মত। সর্বোপরি গোটা পরিকল্পনা রূপায়িত হবে কেন্দ্রীয় বিপ্লবী সরকারের দ্বারা যার রাষ্ট্রপ্রধান হবেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। এইভাবে আমরা পরবর্তী যুদ্ধের পরিকল্পনার প্রস্তুতি নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম ব্যারাকে ব্যারাকে, জাহাজে জাহাজে। অস্ত্রাগারগুলোর পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্যে ছুটে গেলেন মদনলাল সাকসেনা এবং সুবলচন্দ্র ধর।

কাল নিরবধি। আমাদের প্রস্তুতির অপেক্ষায় কাল বসে নেই। তার নিজস্ব নিয়ম মতই সে চলছে। ওদিকে সন্ধ্যার অন্ধকারে রিয়ার অ্যাডমিরাল র‍্যাটট্রে নৌবাহিনীর ভারতীয় সৈন্যদের বিদ্রোহের ঘটনার খবর পেয়ে এক বিরাট গোরা সৈন্যের বাহিনী নিয়ে ছুটে এলেন ক্যাসেল ব্যারাকের দিকে এবং এম আর ব্যারাক্সসহ সমস্ত ব্যারাকগুলি ঘিরে ফেললেন সৈন্যবাহিনী দ্বারা। কারো আর পালাবার পথ ছিল না। যাকে যেখানে যে-অবস্থায় পেয়েছিল, তাকে সেই অবস্থায়ই গ্রেপ্তার করল। করাচীতেও ঐ একই ঘটনা ঘটেছিল। ভারতীয় সৈন্য গ্রেপ্তার বরণ করল মোট ৫,৫০০ জন (বোম্বে এবং করাচী মিলিয়ে)। এবারে আমিও আর রেহাই পেলাম না। গ্রেপ্তার বরণ করতে বাধ্য হলাম। পর্যাপ্ত অস্ত্র তখনকার মত হাতের কাছে না থাকায় এই পরাজয় মেনে নিতে হল। বৃহত্তম যুদ্ধের প্রস্তুতিপর্বেই আমরা ধরা পড়ে গেলাম। যে-অস্ত্র প্রথমে পাওয়া গিয়েছিল তা পূর্বেই শেষ হয়ে গেছে। নতুন করে অস্ত্রভাণ্ডার ভাঙার সুযোগ না দিয়েই র‍্যাটট্রে অতর্কিতে ব্যারাক ও অস্ত্রভাণ্ডার-যুক্ত জাহাজগুলো ঘিরে ফেলেছিল। নতুবা পরিকল্পনা ছিল—ঐ স্তব্ধতার মধ্যে যখন কোনো ব্রিটিশের দেখা পাওয়া যাচ্ছে না,—এই সুযোগে অন্ধকারে প্রথমে বড় বড় দু'টো অস্ত্রভাণ্ডার লুঠ করা হবে। প্রয়োজনে বাকিগুলোকেও লুঠ করব। কিন্তু বিধি হলো বাম। সে-সুযোগ আর পাওয়া গেল না। ব্রিটিশের রণচাতুর্য অনুকরণীয়ও বটে!

রিয়ার অ্যাডমিরাল র‍্যাটট্রে বিচক্ষণ কূটনীতিবিদ। তিনি চাতুরির সাহায্যে ভান দেখিয়ে সর্বত্র শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্যে ক্যাপ্টেন ইনিগো জোনসকে বদলি করে সেখানে নিয়ে এলেন কম্যাণ্ডার কিং-কে। কারণ তিনি রেটিংদের দেখাতে চাইলেন, ক্যাপ্টেন ইনিগো জোনস কোনোরকম সতর্ক না করে প্রথমেই গুলি করার আদেশ দিয়ে অন্যায় করেছেন। তাই তাঁকে বদলি করে শাস্তি দেওয়া হল। র‍্যাটট্রে মন্তব্য করলেন যে ক্যাপ্টেন ইনিগো জোনস একদল সৈন্য নিয়ে এম আর ব্যারাক্স এবং ক্যাসেল ব্যারাকের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়েন। কোনোপ্রকার সতর্ক না করে গুলি চালাবার আদেশ দিলেন, গোরা সৈন্যরা আদেশ পালন করল বড় বড় ম্যাস্‌কেটিয় রাইফেলের গুলি ছুড়ে। রেটিংদের অসন্তোষ কিন্তু প্রশমিত হল না। বরং তা ক্রমেই বেড়ে চলল। তারা র‍্যাটট্রের চাতুরি বুঝতে পেরেছিল। কেননা, যে-দাবি তারা রেখেছিল কোনোটাই মেনে নেওয়া হল না, অন্যদিকে রেটিংদের শাস্তিদানের ব্যবস্থাই পাকা করা হল। প্রয়োজনীয় অস্ত্রের অভাবে সাময়িকভাবে পিছু হটলেও

ভারতীয় সৈন্যদের ক্ষোভ দমিত হল না। আবার সুযোগের অপেক্ষায় থাকতে হল। কেন্দ্রীয় গোপন সংস্থাও তার প্রতিপালনীয় কর্তব্য পালনে অগ্রসর হতে পারে নি—এই মন্তব্যও বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক নয়। কেননা, যে-সমস্ত দায়িত্ব তাদের ওপর অর্পিত হয়েছিল, তা তারা পালন করে নি, অবহেলাই দেখিয়েছে।

মুলন্দ বন্দিশিবির। আমার পোশাক থেকে পোর্ট-অফিসারের ব্যাজটি খুলে নেওয়া হল। আমি বিচারাধীন বন্দি। বিচার হচ্ছে কোর্ট মার্শালে। দিনের পর দিন চলল বিচারের নামে প্রহসন। আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনো সুযোগ নেই। মাঝে মাঝে কোনো উর্ধ্বতন অফিসার এসে আমাকে 'এটা করেছ, ওটা করেছ' বলে প্রশ্ন করেন। আমি কোনোকিছুই উত্তর না দিয়ে শুধু বলি, 'আমি আমার দেশকে ভালবাসতে জানি, অন্য কিছুই জানি নে।' এর পর তাঁরা বিফল মনোরথ হয়ে চলে যান। বাইরের কোনো খবর আর পাচ্ছি না। কোথায় কী হচ্ছে কিছুই জানতে পারছি না। তবে বন্দিশিবিরের যে-সেলে আছি, সেখানে এক ভারতীয় সৈন্য প্রহরী হয়ে এসেছে। তার কাছে জানতে পারলাম, খাবারের মেনু কিছুটা পালটানো হয়েছে। পূর্বের তুলনায় কিছুটা ভাল খাবার দেওয়া হচ্ছে। একটু সান্ত্বনা পেলাম এই ভেবে যে, আমরা কিছুটা জিতেছি। সম্মুখ-সমরে পিছু হটেছি বটে, কিন্তু আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে, তথা প্রশাসনিক পর্যায়ে ব্রিটিশের সামগ্রিক শাসনব্যবস্থায় এক প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি করতে পেরেছি—এ অতীব সত্য। এবং বলতে বাধা নেই যে, এই আলোড়নের পরিণতি যা হতে পারে তা দেশের সামগ্রিক স্বার্থে কম লাভজনক নয়। আমাদের জয় হল সেখানেই।

ইতিমধ্যে কর্তৃপক্ষ আমার অতীতের কার্যকলাপের খবর পেয়ে গেছে। তার প্রমাণ পেলাম গ্রেপ্তার হবার পনেরো দিন বাদে। ২৭.২.৪৪ তারিখে বেলা ৩টার সময়ে আমাকে কম্যাণ্ডার কিং-এর সামনে হাজির করা হল। তিনি আমাকে প্রশ্ন করলেন, 'You have done many things against On His Majesty's Service, i.e., Government of India, in the year 1935-1938, then 1942-1943 February; and, here also today. I see, it is your traditional growth—is it not true?' এই কথার উত্তরে আমি শুধু বলেছিলাম, 'Yes, I admit, my traditional growth is to love my beloved motherland, i.e., beloved India.' কী বুঝল জানি না, দেখলাম এর পর থেকেই ক্রমে যেন আমার ওপরে মারমুখো হয়ে উঠতে লাগল জেল কর্তৃপক্ষ, আমাকে যেন আর সহ্য করতে পারছে না।

১৯৪৪ সালের ৩১ মার্চ। হঠাৎ সকালবেলায় দেখা গেল আমার সেলের গারদ খুলে ডাণ্ডা-বেড়ি পরিয়ে আমাকে বাইরে নিয়ে আসা হল বন্দিশিবিরের মধ্যে খোলা মাঠে। বন্দিশিবিরের কাঁটা-তারের পেছনে আবার পাথরের দেওয়াল, দু'য়ের মাঝখানে যে-ফাঁকা জায়গা, সেখানে উঁচু পাটাতনে বন্দুকধারী গোরা

সৈন্য পাহারা দিচ্ছে। সার্চ-লাইট জ্বলছে দেওয়ালের ওপরে। তখনো খোলা মাঠে আরো অনেককে আনা হয়েছে বিভিন্ন সেল থেকে। তাদের মধ্যে মদনলাল সাকসেনা এবং সুবঙ্গচন্দ্র ধরকেও দেখতে পেলাম। আর ছিলেন সেই তেজস্বিনী মহিলাদ্বয়—উর্মিলা বাঙ্গ ও অমুভা সেন।

কিছুক্ষণ পরেই কম্যাণ্ডার কিং তাঁর সাঙ্গপাঙ্গদের নিয়ে হাজির হলেন। ডাণ্ডা-বেড়ি পরানো অবস্থায় আমাদের মার্চ করিয়ে লাইন করে দাঁড় করানো হল। কড়া পাহারা রাখা হয়েছে চারদিকে। 'ফল ইন'-এর সামনে কিছু দূরে উত্তর-পশ্চিম দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে কম্যাণ্ডার কিং। কিছু পরেই ক্যাপ্টেন ইনিগো জোনসও এসে উপস্থিত হলেন। র‍্যাটট্রের চাতুরি আরো পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারা গেল। তিনি পড়ে যেতে লাগলেন কোর্ট মার্শালের রায়। রায়ের মোদ্দা কথা হল—ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীতে বিদ্রোহ ঘটিয়ে ব্রিটিশ রাষ্ট্রকে উচ্ছেদ করার গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অপরাধে মহিলা দু'জনকে গুলি করে হত্যা করা হবে এবং আমাকে নিয়ে মোট এক হাজার পাঁচশ জনকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে। এই কারাদণ্ড চলবে মুলতান সামরিক জেলে। (বর্তমানে এই জেল পাকিস্তানে।)

বিস্ফোরণোন্মুখ বারুদের স্তূপের মত শান্ত, কালবৈশাখী আসার পূর্ব মুহূর্তের পৃথিবীর মত নিশ্চল, হিমালয়ের মত ধীর স্থির; অসম্ভব তাঁদের সংযম, অদ্ভুত তাদের মানসিক স্থৈর্য। এতদিন যে-স্বপ্নের সাধনায় তাঁরা বিনিদ্র রজনীর প্রহর গুণেছেন, নিজের জীবন ও জাতির ইতিহাসের পরাধীনতার গ্লানি থেকে মুক্ত করে ভীরুতার অপবাদ মুছে ফেলবার জন্য যে-সাধনায় যে-আরাধনায় জীবন-পণ প্রতীক্ষায় উদ্বেগ নিয়ে বসেছিলেন, জীবনের সেই পরম লগ্ন, সেই শুভক্ষণ বুঝি তাঁদের সমাগত। তাই বোধহয় তাঁদের—সেই পরম শ্রদ্ধার পাত্রী মহান দেশ-প্রেমিক বীরাঙ্গনা মহিলাদ্বয়ের অন্তরে-বাহিরে এই প্রশান্তি, এই তৃপ্তি। মনে হল, তাঁরা যেন হৃষ্টচিত্তেই উক্ত রায়কে গ্রহণ করলেন। দৃপ্ত কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন, 'আমাদের বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক।'

রায় পাঠ করার পাঁচ মিনিট পরেই এ্যাকশন শুরু হল। আমাদেরই সামনে চাঁদমারিতে নিষ্ঠুরভাবে এই দুই মহিলাকে চারজন গোরা সৈন্য একসাথে গুলি করে হত্যা করল। গুলির আঘাতে তাঁদের মরদেহ চাঁদমারির দেওয়ালের গায়ে লুটিয়ে পড়ল, তাজা রক্ত ফিনকি দিয়ে গড়ালো। তাঁদের মহান বীর আত্মা শান্তি লাভ করল অমর হয়ে। কিন্তু কী নিষ্ঠুর পরিহাস, আমরা কিছুই করতে পারলাম না! শুধু ভারতের স্বাধীনতার মহান যোদ্ধা হিসাবে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধায় মাথা নত করলাম। মহারাষ্ট্রের এবং পূর্ববাংলার (বর্তমান বাংলাদেশ) দুই মহিয়সী নারী আমাদের কাছ থেকে নীরবে বিদায় নিলেন। গুলিতে আত্মাহুতি দেবার পূর্ব মুহূর্তে উচ্চৈঃস্বরে শুধু বলেছিলেন, 'ভারতের বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক, জয় হিন্দ!' দুর্ভাগ্য আমার, এঁদের সঠিক ঠিকানা জানবার সুযোগ আমার ছিল

না। যেটুকু আমি পরিচয় জানি, তা আমার না-জানার মতই। যদিও আমি তখনকার সময়ের কেন্দ্রীয় গোপন সংস্থার একজন সদস্য ছিলাম, কিন্তু সংস্থার নির্দেশমত কেউ কারোর ব্যক্তিগত পরিচয় জানবার বা পরিচয় জানাবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করার অধিকার ছিল না। যেমনভাবে নির্দেশ ছিল অগ্নিযুগের বিপ্লবী কর্মীদের ক্ষেত্রে। বিশেষ করে মেয়েদের বেলায় তো কথাই নেই। সেখানে ছেলেরা মেয়েদের খোঁজখবর নিতে গেলে তখনকার দিনের বিপ্লবীদের হত মারাত্মক অপরাধ। অবশ্য নেতারা যদি খোঁজ করার নির্দেশ দিতেন তাতে কোনো অপরাধ হত না। এক্ষেত্রে একমাত্র কেন্দ্রীয় গোপন সংস্থার সদস্যা শ্রীমতী কমলা ভোণ্ডেই ওঁদের সবকিছু জানাবার বা জানবার অধিকারী ছিলেন। কিন্তু তিনিও তো আত্মদান করেছেন ১৯৪৬ সালের দ্বিতীয় নৌ বিদ্রোহের সময়ে।

১০ ফেব্রুয়ারি (১৯৪৪ সাল) বেলা দুটোর পরে গোপন সংস্থার মাধ্যমে আমরা খবর পেয়েছিলাম যে, পূর্বদিন অর্থাৎ ৯ ফেব্রুয়ারি বেলা ১১টার সময়ে পূর্ববাংলার অনুভা সেন এবং মহারাষ্ট্রের উর্মিলা বাঙ্গ গোপন কাগজপত্রসহ স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের গুপ্তচর বাহিনীর হাতে ধরা পড়েছিল। এঁরা ডব্লিউ আর আই এন অর্থাৎ উইমেন্স রয়েল ইণ্ডিয়ান নেভি শাখার কর্মী ছিলেন। তাঁদের কাজ করতে হত কখনো কখনো অফিস কেরানির, আবার কখনো কখনো নার্সিংয়ের। এ হল সাধারণ ভাবে, কিন্তু যাঁরা অর্থাৎ যে-সমস্ত মহিলারা রাজনীতির উদ্দেশ্য নিয়ে সামরিক বিভাগে ঢুকেছিলেন দেশের বৃহত্তর স্বার্থের প্রয়োজনে, তাদের আরো একটি কঠিন ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে হত। সে কাজটি হল—উচ্চ মহলের বড় বড় অফিসারদের মনোরঞ্জনের মধ্য দিয়ে রণসজ্জার অতি গোপন তথ্য সংগ্রহ করা। যতদূর জানতে পেরেছি, অনুভা সেন নেভিতে চাকরি নিয়েছিলেন ১৯৪২ সালের শেষের দিকে, আর উর্মিলা বাঙ্গ ১৯৪১ সালের মাঝামাঝি।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সর্বভারতীয় সেনাবাহিনীতে আমরা যে-বিদ্রোহের প্রস্তুতি চালাচ্ছিলাম এবং পেছনে যে নেতাজী সুভাষের নির্দেশ আছে, তা ব্রিটিশ সর্বপ্রথম জানতে পারল চতুর্থ মাদ্রাজ উপকূল রক্ষীবাহিনীর বিদ্রোহের পরে, ১৯৪৩ সালের গোড়ার দিকে। দ্বিতীয়বারে টের পেল নেভিতে এঁদের কাছে (অনুভা সেন ও উর্মিলা বাঙ্গ) যে-গোপন কাগজপত্র পেয়েছিল তার মধ্য দিয়ে ১৯৪৪ সালের ফেব্রুয়ারির গোড়ার দিকে। ফলে বিদ্রোহের পূর্ণাঙ্গ খবর পাবার আশায় এঁদের ওপরে অকথ্য অমানুষিক নির্যাতন চালানো হয়েছিল। তা আমরা বুঝতে পারলাম ৩১ মার্চ, ১৯৪৪ সালে সকাল বেলা, যখন আমাদের সকলকে মুলন্দ বন্দিশিবিরের মধ্যে খোলা চত্বরে এক জায়গায় জড় করা হল। আমি তাঁদের এই প্রথম এবং এই শেষ দেখা দেখলাম।

তাঁদের দেখে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল, কী-না অকথ্য অত্যাচার হয়েছে তাঁদের ওপরে! তাঁদের সমস্ত জামাকাপড় রক্তে ভেজা। কোনো কোনো স্থানে চাপ চাপ রক্ত শুকিয়েও আছে। নিম্নাঙ্গ থেকে পা বেয়ে তখনো রক্ত গড়াচ্ছিল। মুখমণ্ডলের প্রায় সর্বত্র দেখা গিয়েছিল বীভৎস কামড়ের চিহ্ন। কোনো কোনো স্থানের মাংসপিণ্ড ছিঁড়েও গিয়েছিল। তা দিয়েও রক্ত গড়াচ্ছিল। তাঁদের সুন্দর সুঠাম দেহের ওপরে পড়েছে নীল ছাপ। তবুও কিন্তু তাঁদের প্রখর দৃষ্টির মধ্যে একটা অনির্বচনীয় বজ্র-দৃঢ় প্রত্যাশা ছিল ; এবং তা ধরাও পড়ল তাঁদের উচ্চরবের ধ্বনির মধ্যে—'ভারতের বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক, আমাদের বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক।'

যাক, এবারে আমরা আবার পূর্ব কথায় ফিরে যাই। ওঁদের নিষ্ঠুরভাবে গুলি করে হত্যা করার পাঁচ মিনিট পরেই ডাণ্ডা-বেড়ি পরানো অবস্থায় সারিবদ্ধ ভাবে কড়া পাহাড়ায় মার্চ করিয়ে আমাদের নিয়ে যাওয়া হল রেল স্টেশনে। কাল-বিলম্ব না করে অপেক্ষমাণ একটি সামরিক ট্রেনে আমাদের নিয়ে গেল মুলতান সামরিক জেলে।

মুলতান সামরিক জেলকে যমপুরী আখ্যা দিলেও অত্যুক্তি হবে না। এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহ, .৯৪৪ সাল। এখানে দেখা পেলাম চন্দ্র সিং গাড়োয়ালের। আমার তিনদিন আগে তাঁকে এখানে পাঠানো হয়েছে। তাঁর কাছে শুনলাম, স্থল-বাহিনীতে তিনি সেই নির্দিষ্ট ১৮ ফেব্রুয়ারিতেই আন্দোলন শুরু করেন। তাতে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। অনেকেই সেই খণ্ডযুদ্ধে মারা গেছে। অবশেষে প্রবল শক্তির সাথে পাল্লা দিতে না পেরে এবং ভবিষ্যতে শক্তি অর্জন করে পুনরায় ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধজয়ের আশায় তাঁর অনুগত পাঁচশ সশস্ত্র সৈন্য নিয়ে তিনি হিমালয়ের গভীর জঙ্গলে পালিয়ে যান। গোপনসূত্রে খবর পেয়ে সেখানেও ব্রিটিশ সৈন্য তাঁর পিছু ধাওয়া করে এবং তাঁর অতি গোপন আস্তানা ঘেরাও করে ফেলে। ঐ গোপন আস্তানা প্রকাশ হয়ে পড়ায় গাড়োয়াল বাধ্য হলেন আবার সম্মুখযুদ্ধে দাঁড়াতে। সেখানেও এক বড় রকমের খণ্ডযুদ্ধ হল। অনাহার, অনিদ্রা, গুলি-গোলার অভাব, তার ওপরে খাদ্যদ্রব্যের অভাব থাকায় পরিশেষে তিনি আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলেন। সেই অনুগত পাঁচশ সৈন্যের মধ্যে শেষ পর্যন্ত মাত্র ছত্রিশ জন বেঁচে ছিল। আর সকলেই হিমালয়ের যুদ্ধে মারা গেছে। ঐ যুদ্ধে ইংরাজ পক্ষেরও একশ নিরানব্বই জন গোরা সৈন্য মারা যায়। গাড়োয়াল আরো বললেন, ঐ হিমালয়ের গভীর জঙ্গলে গোপন আস্তানার নিশানা ঠিক করে ব্রিটিশ পাইলটদের দিয়ে বোমারু বিমান থেকে বেশ কিছু ভারি বোমাও ফেলা হয়েছিল। তার ফলে সেখানে বড় বড় খাদের সৃষ্টি হয়েছে। লুইসগান ও মেশিনগান ব্যবহার তো করেছিলই। অদৃষ্টের পরিহাসে এমনই বিপর্যয় দেখা দিল যে, গাড়োয়ালের নিজের রাইফেলেও এমন একটিও গুলি ছিল না, যা দিয়ে তিনি আত্মহত্যা করতে পারেন। ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় বাধ্য হলেন ধরা দিতে। কোর্টমার্শালের রায়ে তিনি

এবং তাঁর সহযোগী ছত্রিশ জন বীর স্বাধীনতা-সংগ্রামী আজ মুলতান সামরিক জেলে এসেছেন বাকি জীবনটুকু যাপন করতে।

তিনি আক্ষেপ করে আবার বললেন, 'আমার মরতে আপত্তি নেই, যদি ভারতবর্ষকে ব্রিটিশের হাত থেকে মুক্ত করতে পারতাম। ১১ তারিখের নৌ-বিদ্রোহের সাথে আমরাও যদি যুদ্ধ শুরু করতে পারতাম, তাহলে ব্রিটিশ একসঙ্গে স্থল, নৌ ও বিমানবাহিনীতে গোরা সৈন্য নিয়ে আমাদের পরাজিত করতে পারত না। গোরা সৈন্যের মোট সংখ্যা সেই অনুপাতে কম ছিল। একসঙ্গে তিন বাহিনীতে গোরা সৈন্য নামানো সম্ভব হত না। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের, ১১ তারিখের যুদ্ধারম্ভের খবর গোপন সংস্থার মারফৎ আমরা পেলাম ১৮ ফেব্রুয়ারির সন্ধ্যা বেলায়। অথচ পূর্ব নির্দিষ্ট ১৮ ফেব্রুয়ারি সকালবেলা থেকেই থানা বন্ধ্-এর আন্দোলন আরম্ভ করায় আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলাম। নৌ-বিদ্রোহীদের দমন করে সেই গোরা সৈন্যদের কাজে লাগানো হল স্থল ও বিমানবাহিনীর বিরুদ্ধে। তার ফলে আমরা সবাই পরাজিত হলাম। নেমে এল মাথার ওপরে মৃত্যুর পরোয়ানা। এর জন্যে কে বা কারা দায়ী, সে-বিতর্কে না গিয়ে এইটুকু অবশ্যই বলা যায় যে, কেন্দ্রীয় গোপন সংস্থা থেকে ১১ ফেব্রুয়ারি সকাল থেকে আন্দোলনের প্রস্তাব ১০ ফেব্রুয়ারির গভীর রাতেই (নৌবাহিনীর ১১ ফেব্রুয়ারি সকাল থেকে আন্দোলন শুরু করার প্রস্তাব, ১০ ফেব্রুয়ারি রাত সাড়ে দশটার মধ্যে কেন্দ্রীয় গোপন সংস্থার অফিসে এসে যায়) ভুলাভাই দেশাইয়ের ওপরে স্থল ও বিমান-বাহিনীর অ্যাকশন কমিটির কছে গোপন পথে পৌছানোর দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল। কিন্তু তিনি খবর দিলেন ১৮ ফেব্রুয়ারির সন্ধ্যাবেলায়। আমাদের দায়িত্ববোধ যদি এইরূপ হয় তবে ভারতমাতা মুক্ত হবেন কী করে? আর যদিও বা তিনি মুক্ত হন কোনোও অজ্ঞাত কারণে, তাহলেও ভারতমাতা চির-সুখী হতে পারবেন না—এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস।'

বিমানবাহিনীর পি কোট্টায়ামের দেখাও পেলাম এখানে আসার সাতদিন পরে। শুধু তিনি নন, তাঁর সঙ্গে এসেছেন আরো পঞ্চাশ জন সহযোগী যোদ্ধা। সেখানেও ঐ নির্দিষ্ট ১৮ ফেব্রুয়ারি বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল। ১১ ফেব্রুয়ারির আন্দোলনের প্রস্তাব তাঁরা পেয়েছেন ১৮ ফেব্রুয়ারি বেলা ৩টার সময়। ফলে তাঁরাও আমাদের মত অকৃতকার্য হয়েছেন। পি কোট্টায়াম বললেন, 'আমরা, ভারতীয় পাইলটরা এবং গ্রাউণ্ড ইঞ্জিনিয়াররা ও অন্যান্য কর্মীরা, সবাই থানা বন্ধ্ করে জঙ্গী বিমানে বোমাসহ প্রস্তুত হয়ে ছিলাম। আশা ছিল, প্রয়োজনে কাজে লাগাবো। কেন্দ্রীয় গোপন সংস্থার যোগাযোগকারী সদস্য মহাশয় ১৮ ফেব্রুয়ারি বেলা ৩টা নাগাদ ১১ ফেব্রুয়ারির আন্দোলনের প্রস্তাবের অনুলিপি আমার হাতে দিয়ে বললেন, এই চিঠিটা পৌছতে দেরি হল বলে সে দুঃখিত। তবে নৌবাহিনীতে আন্দোলন হয়েছিল এবং তা মিটে গেছে। এখন সব শান্ত। আপনারাও আন্দোলন

-করছেন, ভালই হয়েছে। তবে খেয়াল রাখবেন, ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত হবেন না। অল্পের মধ্যেই মিটিয়ে ফেলার চেষ্টা করবেন।' পি কোট্টায়াম যেন প্রথমে অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন। তিনি অপ্রস্তুত হলেন দু'টি কারণে। তিনি বললেন, 'প্রথমতঃ ১১ ফেব্রুয়ারির আন্দোলনের খবর আজ (১৮ ফেব্রুয়ারি) পেলাম। প্রথম পরাজয় তো এখানেই হল। এখন আমাদের ওপরে আক্রমণের পালা। তাও বোধহয় কিছুক্ষণের মধ্যেই শুরু হয়ে যাবে। দ্বিতীয়তঃ, একজন কেন্দ্রীয় গোপন সংস্থার সদস্য হয়ে কী করে ঐ ধরনের প্রস্তাব আমার কাছে রাখলেন! বিশেষ করে আমি নিজে যেখানে সেই সংস্থার একজন সদস্য! তাছাড়া এই রকম গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হলে গোপন সংস্থার সদস্যদের মিলিত বৈঠকেই তো তা নেওয়া সমীচীন, এককভাবে কেন?' এইভাবে আক্ষেপ প্রকাশ করে আবার বললেন, 'আমরা এখনো অনেক পিছিয়ে আছি। দেশাত্মবোধ স্বপ্ন-বিলাস থেকে আসে না, কৃচ্ছ্রতার মধ্যেই তার জন্ম। আর তা জন্মগত বৈশিষ্ট্যও বটে।'

তাঁর কাছে শুনতে পেলাম, সন্ধ্যার অন্ধকারে অতর্কিতে গোরা সৈন্যের দল তাঁদের ওপরে বম্বার্ড-কার ও মেশিনগানসহ আক্রমণ চালায় এবং কোনোরকম অস্ত্রধারণের সুযোগ না দিয়ে ব্রিটিশ পাইলট দিয়ে বোমারু বিমান আকাশে উড়িয়ে দেওয়া হল আক্রমণের নিশানা দিয়ে। উপর থেকে বোমা ফেলাও হয়েছিল, তার ফলে ঘটনাস্থলেই পঁচাত্তর জন ভারতীয় গ্রাউণ্ড-কর্মী, সাতজন গ্রাউণ্ড-ইঞ্জিনিয়ার এবং পঁয়ত্রিশ জন পাইলট মারা যায়। এই ঘটনা ঘটে পুনাতে।

দুঃখের বিষয়, ইতিহাসে বা অন্যত্র, ১৯৪৪ সালের সমগ্র ভারতীয় সশস্ত্র সেনা-বাহিনীর বিদ্রোহের কাহিনী শুনতে পাওয়া যায় না। অথচ এরই প্রেরণায় আবার ১৯৪৫ সাল থেকে ১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সশস্ত্রবাহিনীতে (স্থল, নৌ ও বিমানবাহিনীতে) বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল। ১৯৪৪ সালের সশস্ত্র বিদ্রোহের ঘটনাকে এমনভাবে অপ্রকাশিত করে রাখা হয়েছিল যে কোনো জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র ঘটনা জানা সত্ত্বেও সংবাদ ছাপাতে পারে নি। তবুও 'ফ্রি প্রেস জার্নাল' 'নৌবাহিনীতে খাদ্য আন্দোলন' হেডিং দিয়ে সংক্ষিপ্ত কিছু খবর ছেপেছিল সাহস করে। তারিখটা ঠিক মনে করতে পারছি না, তবে অনেকদিন বাদে। তখনকার সময়ে পৃথিবীর সামগ্রিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কালোছায়ায় ঢাকা ব্রিটিশ সিংহরাজ তাঁর অর্ধভগ্ন নখদন্ত দিয়ে অতি সন্তর্পণে একদিকে যেমন 'ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে সূর্য অস্ত যায় না'—এই আত্মম্ভরী অহমিকার প্রবাদবাক্যকে রক্ষা করার আপ্রাণ প্রচেষ্টা করছিল, অন্যদিকে সোনার ভারতকে চিরদিন নিংড়ে লুঠ করার অসীম লালসাকে ছলে-বলে-কৌশলে আঁকড়ে রাখার বাসনায় নিজের এতটুকু দুর্বলতাকেও বাইরে প্রকাশ হতে দিতে নারাজ ছিল। তাই, এই বিদ্রোহের অমর ইতিহাসের ঘটনাপঞ্জীকে অতি কঠোর ও নিষ্ঠুরভাবে গলা টিপে মেরে ফেলার পাকা ব্যবস্থা করেছিল। কিন্তু হায়, ইতিহাস যে অমর তা বোধহয় সাময়িকভাবে হলেও

মদমত্ত ব্রিটিশ সিংহ ভুলে গিয়েছিল। কিন্তু দেওয়ালের লিখন আজ বাস্তবে রূপ পেতে চলেছে।

এদিকে সুবলচন্দ্র ধর এবং মদনলাল সাকসেনার কোনো খবর আর পাওয়া গেল না। তাঁদের মুলতান বন্দিশিবিরে আনা হয় নি। কী হল, কোথায় গেলেন, কিছুই জানতে পারলাম না। তবে শেখ শাহাদত আলি তখনো যে ধরা পড়েন নি তা জানতাম। এর পরেও বিভিন্ন স্থান থেকে আরো পাঁচ হাজার বিদ্রোহী সৈনিককে এখানে আনা হয়েছিল।

মুলতান জেলে দিন কাটাচ্ছি। এখানকার দৈনন্দিন জীবনযাপন আরো ভয়াবহ বর্ণনারও অতীত। মধ্যযুগীয় যে-বর্বরতাপূর্ণ অত্যাচারের কাহিনী শোনা যায় এ-যেন তাকেও হার মানিয়েছে। প্রতিদিন আমাদের ওপরে রুটিনমাফিক যে-অত্যাচার চলত তা অত্যন্ত ভয়াবহ।

প্রতিদিন ভোর চারটায় আমাদের ঘুম থেকে তুলে সেল থেকে নিয়ে যেত জেল-পাঁচিলের চৌহদ্দির মধ্যে খোলা মাঠের বধ্যভূমির এক কুঠরিতে। এরকম কুঠরি ওখানে সারিবদ্ধভাবে ছিল প্রায় আড়াই হাজার। প্রত্যেক কুঠরিতে একজন করে বন্দিকে হাতে-পায়ে ডাণ্ডা-বেড়ি পরিয়ে ওপরে কড়িকাঠের সঙ্গে হ্যাণ্ড-কাপে শিকল এঁটে ঝুলিয়ে দিত। পরে শঙ্কর মাছের (যার গায়ে অসংখ্য কাঁটা থাকে) চাবুক মারা হত। পাঠান সৈন্যদের ওপরে আদেশ ছিল প্রতিদিন ত্রিশ মিনিট চাবুক মারতে হবে। কেউ যদি ঐ ত্রিশ মিনিট পূর্ণ হবার মধ্যে অজ্ঞান হয়ে পড়ত, তাহলে তাকে নামিয়ে ইনজেকসন দিয়ে চাঙ্গা করে নিয়ে জহ্লাদেরা আবার ঝুলিয়ে দিত বাকি সময়টুকু পূর্ণ করার জন্যে। এই পাঠান সৈন্যরা কী রকম আইনের দাস তা ভাবলে অবাক হতে হয়! অবশ্য এটা স্বাভাবিক, কারণ, মিলিটারিতে যে-পরিবেশে সৈন্যদের রাখা হয় (বর্তমানে এর কিছুটা পরিবর্তন ঘটেছে) তাতে সুকুমার-বৃত্তির মানুষগুলোও পশুতে পরিণত হতে বাধ্য হয়। আমি প্রথম প্রথম অজ্ঞান হয়ে যেতাম। ঐ একই দাওয়াই দিয়ে আমাকে চাঙ্গা করে আবার ঝুলিয়ে চাবুক মারা হত। আধঘণ্টা চাবুক মারার পরে আমাদের নামিয়ে নিচে মাটিতে শুইয়ে দেওয়া হত। একঘণ্টা পরে তুলে নিয়ে গিয়ে মেথরের কাজ করানো হত। মেথরের কাজ শেষ হলে হাড়ি-বালতি, বাসন-কোসন ইত্যাদি মাজা-ঘষার কাজে লাগাতো। এ-কাজের শেষে রুট মার্চে নিয়ে যেত। একঘণ্টা রুট-মার্চ করার পরে আমাদের রান্না-বান্নার কাজ দিত। ভলে ভাল খাবার আমাদের দিয়ে তৈরি করানো হত বটে, তা আবার আমাদের দিয়েই ঐ জেলের মধ্যে অথবা জেলের বাইরে অফিসার এবং অন্যান্য কর্ম-চারীদের কোয়ার্টারে পৌছানো হত। প্রতিজনের সঙ্গে থাকত দু'জন করে রাইফেল-ধারী প্রহরী। কেউ ক্ষুধার্ত হয়ে যদি কোনো খাবার খাওয়ার চেষ্টা করত, তবে তাকে সঙ্গে সঙ্গে গুলি করে হত্যা করা হত। কী বীভৎস ব্যাপার! বেলা এগারোটায় আমাদের খেতে দেওয়া হত। সে-খাবার তৈরি হত অন্য জায়গায়। লুচির মাপের

পাতলা দু'টো আটার রুটি এবং এক মগ জল।

খাওয়া-দাওয়ার আধঘণ্টা পরে আবার রুট-মার্চে নিয়ে যেত, চলত বিকেল চারটে পর্যন্ত। বিকেল পাঁচটায় আবার খাবার দিত, তা ঐ বেলা এগারোটায় যা দিত তাই। সমস্ত দিনে অন্য কোনোপ্রকার জল আমরা পেতাম না। সমস্ত দিনে-রাত্রে খাবার জল দুই মগ মাত্র। স্নান করতে দেবে না, তা ওখানে নিষিদ্ধ। যে-পোশাক পরে জেলে গিয়েছিলাম, তা আর খুলতে দেয় নি। পায়খানা-প্রস্রাবে জল ব্যবহার নিষিদ্ধ ছিল। তেল, সাবান ব্যবহার বা দাড়ি কামানো তো ছিল কল্পনা-বিলাস। এ যেন কবির ভাষায় :

'পাপ-দানবীর অত্যাচারে ডাকছে যে নর ত্রাহি ত্রাহি,
চিহ্ন সে যে মোর প্রকটের সন্দেহ তায় বিন্দু নাহি।'

আমাদের দৈনন্দিন জীবনের এই ছিল রুটিন। অচিন্তনীয় অমানুষিক নির্যাতন! বিংশ শতাব্দীতে এই বর্বর অত্যাচার চিন্তারও অতীত। কিন্তু আশ্চর্য হতে হয় এই ভেবে যে, এও ঘটেছে। এই প্রসঙ্গে মুলতান সামরিক জেলের একটা বর্ণনা দেওয়া প্রয়োজন। সমস্ত জেলটি অনুমান প্রায় তিন বর্গমাইল জায়গা জুড়ে অবস্থিত। মাঝে মাঝে দু'একটা ছোট-বড় পাহাড়ের টিলাও আছে। মাঝখানে একটি চারতলা গম্বুজ। তাকে সেনট্রাল টাওয়ার বা গুমটি বলা হত। সেই গুমটিকে কেন্দ্র করে তার চারিদিকে যদি একটা বৃত্ত বা মণ্ডল আঁকা যায়, তাহলে সেটিকে মোটামুটি হিসাবে জেলের বহিঃপ্রাচীর বলা যেতে পারে। প্রাচীরগুলো সুউচ্চ, কমপক্ষে পঁচিশ হাত। কেন্দ্রস্থ গম্বুজ থেকে দশটি ঋজুরেখা বা ব্যাসার্ধ দশদিকে গিয়ে মণ্ডলটিকে ছুঁয়ে আছে। এই দশটি মহল বা ব্লক। এই-ই হল মুলতান জেল। গম্বুজটি যেমন চারতলা, তেমনি প্রত্যেক মহলও চারতলা। প্রত্যেক তলায় এক লাইনে ২৪০টি কুঠরি। প্রত্যেক কুঠরিতে একটি করে লোহার গরাদ আঁটা দরজা আছে, কিন্তু কপাট বা door leaf নেই। পেছনে সাড়ে চার হাত উঁচুতে যে-ছোট জানালাটি আছে তাও দু' ইঞ্চি ঘন গরাদে আঁটা। ঘরে আসবাবের মধ্যে একহাত চওড়া তিনখানা নারকেল দড়ির খাটিয়া, আর ঘরের কোণে একটি আলকাতরা-মাখা মাটির ভাঁড়। প্রত্যেক কুঠরিতে তিনজনের বেশি লোক ধরে না। কিন্তু আমাদের কোনো কোনো সময় পাঁচজন থেকে সাতজন করে রাখা হত। প্রত্যেককে খাটিয়া দেওয়া হত না, বা আলাদা আলাদা ভাঁড় দিত না। ঐ ভাঁড় দেওয়া হত যদি রাতে কেউ মলমূত্র ত্যাগ করে তার জন্য। যে-নারকেল দড়ির খাটিয়ার কথা বলা হত তাতে ঘুম হত খুব সজাগ থেকে। কারণ একটু অসাবধানে পাশ ফিরলেই মাথা ঠুকে গিয়ে ভূমিশয্যা নিতে হত।

কুঠরিগুলো অবস্থিত ছিল এক সারিতে। তাদের সামনে দিয়ে তিন-চার হাত চওড়া বারান্দা চলে গিয়েছে। বারান্দাটি গরাদে ঘেরা। তার মাঝে মাঝে থাম এবং থামগুলির গায়ে খিলানের মাঝে লোহার শিকের দরজা। এ-দরজা খুলবার

নয়, খিলানে আঁটা। সব দালানগুলির মুখ গুমটিতে গিয়ে যুক্ত হয়েছে। এখানে লাইনে বা করিডরে প্রবেশ করবার ফটক। রাত্রে এ-ফটক বন্ধ হয়ে যায়। কুঠরিগুলি বন্ধ হয় লোহার হুড়কায়। তালা দেবার স্থান বাইরে দেওয়ালের গায়ে, ভেতর থেকে তালা বা হুড়কার মুখ হাতে পাওয়া যায় না।

রাতে প্রতি লাইনে কুড়িজন করে ওয়ার্ডার-সৈন্য থাকে। এরাই প্রহরী। প্রতি তিনঘণ্টা অন্তর টর্চ হাতে চারজন করে লাইনের এমোড় থেকে ও-মোড়ে ঘুরতে থাকে এবং কুঠরির মানুষ-পশুগুলি কী করছে তা লক্ষ্য করে। সমস্ত জেলের দশটি ব্লকের চল্লিশটি লাইনে একসঙ্গে আটশ ওয়ার্ড বা সান্ত্রী এমনি ঘুরে ঘুরে নিজের পালা শেষ হলে অন্যকে জাগিয়ে দেয়। এইভাবে পালাক্রমে আটশ সান্ত্রী এই জেলে দুঃসাধ্য সাধনে নিশি ভোর করে। গুমটিতে চারজন সিপাহি টর্চ হাতে উপগ্রহের মত অবিশ্রান্ত ওপর নিচে ঘুরতে থাকে। তারা এক এক ব্লকের কাছে আসে আর সেই লাইনের ওয়ার্ডার হাঁক দিয়ে রিপোর্ট দেয়। এই পুলিশে ও লাইনের ওয়ার্ডারে ভক্ষ ভক্ষকের সম্বন্ধ। কারণ, ওয়ার্ডার কখনো দৈবাৎ ফাঁকি দিলে বা টর্চ মাটিতে রাখলে সান্ত্রীর (সামরিক পুলিশ) রিপোর্টে বা নালিশে তাকে শাস্তি ভোগ করতে হয়।

বিদ্রোহী বন্দি-কয়েদিদলকে নিয়ে জেলের গেট পার করিয়ে বাগানের কাছে সার করে দাঁড় করানো হল। এটাই ওখানকার নিয়ম। জেলার সাহেব প্রথমেই একবার কয়েদিদের দেখে রাখেন। অবশ্য এই প্রথম আর এই শেষ। তেরো মাসের মধ্যে আমি আর তাকে দেখতে পাই নি। নতুন কয়েদিরাই ভাগ্যবান, কেবলমাত্র তাদেরই তিনি দেখা দেন। জেলার সাহেব মিঃ হেনরি এখানে কয়েদিদের সামনে আবির্ভূত হলেন। এসেই এক লম্বা বক্তৃতা আরম্ভ করলেন, 'এই পাঁচিল দেখেছ, এ খুব উঁচু। কিন্তু এও অনেকে ডিঙিয়ে পালাবার চেষ্টা করে। ফলে তার মৃত্যু ঘটে। কখনো মনে করো না, এখান থেকে পালানো অত সোজা। চারদিকে অনেক মাইল পর্যন্ত ঘন বন-জঙ্গল ও বিপদসংকুল পাহাড়-পর্বত। আর আছে এই পাঁচিলেরই গায়ে বাইরের দিকে বড় বড় খাদ। বনে-জঙ্গলে হিংস্র পশু তো আছেই। মানুষ দেখলেই হত্যা করবে। আর আমাকে দেখতে পাচ্ছ তো? আমার নাম ডি হেনরি। ভাল মানুষের কাছে আমি খুবই ভাল, লোকের ভাল করতেই আমি চাই; কিন্তু বাঁকার কাছে আমি চারগুণ বাঁকা। যদি আমার অবাধ্য হও তাহলে ভগবান তোমাদের সহায় হতে পারেন, কিন্তু আমি যে হব না, সেটা স্থির জেনে রাখো। আর একটা কথা জেনে রাখো যে, এই মুলতান জেলের চার মাইলের মধ্যে ভগবান আসে না।'

এই জেলের চৌহদ্দির মধ্যে নির্যাতনে দীর্ঘ তের মাস কাটাবার পরে ১৯৪৫ সালের মে মাসের প্রথম সপ্তাহে আমি ছাড়া পেলাম বটে, কিন্তু বাঁচার কোনো আশাই ছিল না। বাঁচার আশা আর নেই জেনেই ওরা আমাকে ছেড়ে দিল, আমার

আমার পকেটে একটা ওয়ারেন্ট পাশ দিয়ে। গন্তব্যস্থল হাওড়া স্টেশন। কোন ট্রেনে তুলে দিল তাও জানবার অবস্থা আমার ছিল না। দীর্ঘ তের মাস ঐ অবস্থায় থেকে আমি একরকম অথর্ব জ্ঞানশূন্য হয়ে গিয়েছিলাম। কোনো কিছুই চিনতে পারতাম না, কোনোকিছুই বুঝতে পারতাম না। কেউ কাছে এলে তাকেও চিনতে পারতাম না। কেউ ডাকলে, তার স্বর আমার কানে ঢুকত না। মৃত্যুর পূর্ব-মুহূর্তের সমস্ত লক্ষণই দেখা দিয়েছিল। এই অবস্থায় কত লোক যে ওখানে প্রাণ হারিয়েছে তার হিসাব রাখা দুঃসাধ্য। যে-কেউ মারা গেলে তাকে উঁচু পাঁচিলের বাইরে খাদের মধ্যে ফেলে দিত। আর ঐ মৃতদেহ শিয়াল-কুকুর-শকুনে খেয়ে নিত, অথবা পচে গলে মাটি হয়ে যেত। আমার অনুমান, তিন হাজারের ওপর ভারতীয় সৈন্য ঐ সময়ে মারা গিয়েছিল। অবশ্য আমার যে-পর্যন্ত জ্ঞান ছিল সেই পর্যন্ত বলতে পারি। কবির ভাষায়:

'মৃত্যু-শ্মশান মাঝেতে আজি রে,
কে যেন স্বরগ-গীতি গায়।
মুখে গেছে তাই ভীষণ কালিমা,
দীপ্ত হইল বিশ্বময়।'

১৯৪৫ সালের মে মাসে আমি ছাড়া পেয়েছিলাম। শুধু আমিই নই, আমরা দেড় হাজার মৃত্যুপথ যাত্রী বিদ্রোহী ছাড়া পেয়েছিলাম। স্বীকার করতেই হবে, এর পিছনে ভারতের তখনকার দিনের যুব ছাত্রদের বিরাট অবদান আছে। চিরদিনই দেশের যুবসম্প্রদায় এবং ছাত্র সম্প্রদায় দেশের ও দশের সার্বিক মঙ্গলার্থে সর্বাগ্রে আত্মদান করেই দেশের ও দশের মঙ্গল আনয়ন করেছে। আমাদের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছিল।

পূর্বেই বলেছি, মুলতান সামরিক জেলে কোনো বন্দি মারা গেলে তাকে জেলের উঁচু পাঁচিলের বাইরে পাহাড়ের খাদের মধ্যে ফেলে দেওয়া হত। আর ঐ মৃতদেহ শিয়াল-কুকুর-শকুনে খেয়ে নিত, অথবা পচে গলে মাটি হয়ে যেত।

একদিন ঘটনাক্রমে মুলতানের কিছু ছাত্র পাহাড়ী খাদের ওপরে জেলের পাঁচিলের বিপরীত দিকে সরু পায়ে-হাঁটা রাস্তা দিয়ে কোনো কাজে অন্য কোথাও যাচ্ছিল। ঐ মৃতদেহ এবং পচা-গলা মাংসপিণ্ড হাড়গোড় দেখে তারা আঁতকে উঠল। প্রথমে তো হতবাক! পরে তাদের স্মরণে এল যে, অনেকদিন পূর্বে মিলিটারিতে যে-বিদ্রোহের কথা শুনতে পেয়েছিল, এ বোধহয় সেই সব বিদ্রোহী সৈনিকদেরই মৃতদেহ। তারা শুনেছিল ঐ বিদ্রোহী সৈন্যদের এই মুলতান মিলিটারি জেলেই রাখা হয়েছিল। ব্রিটিশ তাঁদের হত্যা করে এইভাবে পাহাড়ের খাদে ফেলে রেখেছে। জেলে নিশ্চয়ই এখনো অনেক বন্দি রয়েছে। এর প্রতিকার হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

ক্রমে ক্রমে এই ঘটনা মুলতান ছাড়িয়ে রাওয়ালপিণ্ডি হয়ে আছড়ে পড়ল

করাচীতে। সেখান থেকে ছাত্রদের উত্তাল বিক্ষোভের ঢেউ এসে লাগল বাংলা, পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, গুজরাট ও মধ্যপ্রদেশের ছাত্র ও যুবসমাজের গায়ে। গোটা ছাত্র ও যুবসমাজ ক্ষেপে গেল। সাবিক আন্দোলন শুরু হল। বহু ছাত্র ও যুবক গ্রেপ্তার হল। করাচী ও বোম্বাইতে তিনজন ছাত্র গুলিতে প্রাণ দিল। এ-ঘটনা গুরুত্ব পেল, গুলজারিলাল নন্দের মাসিক পত্রিকা 'লেবর' ও এস নটরাজনের 'ফ্রি প্রেস জার্নাল'-এ সম্পাদকীয় মন্তব্যসহ প্রকাশিত হওয়ায়। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে দাবি উঠল, সমস্ত রাজনৈতিক, বিশেষ করে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর বিদ্রোহী সৈনিকদের মুক্তি দিতে হবে। সারা দেশে খুবই চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হল। তখন ১৯৪৫ সাল, ফেব্রুয়ারি মাস।

একদিকে ভারতের বাইরে হতে নেতাজীর তীব্র আক্রমণ, অপরদিকে দেশের অভ্যন্তরে ব্রিটিশ-বিরোধী মারমুখো আন্দোলন। এরই মধ্যে ভারতীয় বাহিনীর বিদ্রোহ—ব্রিটিশরাজ তখন দিশেহারা। তখন চাপে পড়ে সামরিক কর্তৃপক্ষ ঠিক করল, যাদের মৃত্যু সুনিশ্চিত, তাদের ছেড়ে দিতে হবে। তারা ভাবল এখানে তো মারা যেতই, তা এখানে না-মরে বাড়ি গিয়ে বা বাইরে গিয়ে মরুক। তারা ভাবল, অনেকে হয়ত পথেই মারা যাবে, বাড়ি পর্যন্ত যাবার সুযোগটুকুও পাবে না। তাই ঐ অবস্থায় আমাদের দেড় হাজার বাছাই-করা বন্দির একটা দলকে ছেড়ে দেওয়া হল। জানিনা, কোথায় আমার পরিণতি! দেশের ছাত্র ও যুব সমাজের সেদিনের অশেষ বীরত্বপূর্ণ লড়াইয়ের প্রচেষ্টায় আমি এখনো বেঁচে আছি। তবে বেঁচে আছি অর্ধাহার অনাহার-জনিত হৃদরোগের রুগী হিসেবে।

বর্তমানে জানতে পেরেছি, ঐ ছাড়া-পাওয়া দেড় হাজার মৃত্যুপথ-যাত্রা বিদ্রোহী সৈনিকদের মধ্যে একমাত্র আমিই নাকি বেঁচে আছি। মনে হয়, একথা সত্য। কেননা যদি কেউ বেঁচেই থাকবেন, তাহলে ভারত সরকার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মাধ্যমে একমাত্র আমাকেই বা অনুরোধ জানালো কেন—ভারতের নৌ বিদ্রোহের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লিখতে?

আমার হাওড়া স্টেশনে এসে পৌছনোর পরের ঘটনা আরো অদ্ভুত এবং অবিশ্বাস্য। অবশ্য এসব ঘটনা আমি ভাল হবার পরে শুনেছি। যেসব মেথররা আমাকে পরে দেখতে এসেছিল—তাদের মুখেও শুনেছি।

হাওড়া স্টেশনে ট্রেন এসে পৌছলে সবাই নেমে গেল। ট্রেন তখন খালি, মেথররা ট্রেন পরিষ্কার করতে এসে দেখল সামরিক বাহিনীর জন্য নির্দিষ্ট কামরায় মিলিটারির ময়লা পোশাকপরা এক অর্ধমৃত রুগ্ন লোক মৃত্যুর অপেক্ষায় পড়ে আছে। তখন ওরা তিন-চারজন মিলে আমাকে ধরাধরি করে হাওড়া স্টেশনের মেন গেটের পাশে নিয়ে এসে একটা বড় থামের গায়ে ঠেস দিয়ে বসিয়ে রাখল। ওদের ধারণা ছিল, আমার কোনো আত্মীয়স্বজন হয়তো আসবে, তারাই নিয়ে যাবে। আর যদি কেউ না-আসে তাহলে আমাকে সামরিক

হাসপাতালে পাঠাবে। যা কিছু হবার সেখানেই হবে। ওরা নাকি বলাবলি করছিল, 'ওরে, মরে নি, প্রাণ এখনো আছে।' কিন্তু কী আশ্চর্যভাবে যোগাযোগ ঘটল, ভগবানের কি অসীম অনুগ্রহ, এই ঘটনার আধঘণ্টা পরে শ্রীরামপুরের একটা লোকাল ট্রেন এসে হাওড়া স্টেশনে থামল। এই ট্রেনে আমার মেজ ভাই হরিপদ ভট্টাচার্য শ্রীরামপুরের শিষ্যবাড়ি থেকে বাসায় ফিরছিলেন। তিনি মেন গেট দিয়ে হন হন করে বেরিয়ে বাসে ওঠার জন্যে ছুটছিলেন।

বেরিয়ে যাওয়ার সময়ে অযাচিতভাবে আমার দিকে একবার তাকিয়েছিলেন মাত্র। প্রথমে কিন্তু তাঁর কোনো প্রতিক্রিয়া হল না। কেননা তাঁরা সবাই যখন লোকমুখে শুনেছিলেন যে, নৌবাহিনীতে বিদ্রোহ হয়েছে তখন তাঁরা ধরে নিয়েছিলেন, আমাদের নিশ্চয়ই গুলি করে মেরে ফেলা হয়েছে। অতএব আমার বিষয়ে চিন্তা করা অবাস্তর। বিশেষতঃ আমি তো মৃত্যু জেনেই পথে পা বাড়িয়েছিলাম। কিন্তু কী যেন আবার তাঁর মনে উঁকি দিয়ে উঠল। তিনি ভাবলেন, যাই, দেখি একবার। সামরিক বিভাগের লোকটাকে গিয়ে একটু দেখি। মানুষ প্রকৃতির এই বোধহয় নিয়ম। বিশেষভাবে সমগোত্রীয় যখন কেউ থাকে তার নিকট-আত্মীয়। এখানে মেজদার এক ভাই, অর্থাৎ, আত্মীয় সামরিক কর্মচারী। তাই বোধহয় এই সামরিক বিভাগের লোকটাকে মুমূর্ষু অবস্থায় একটিবার দেখে তাঁর হৃদয়ে সমগোত্রীয় ভাবাদর্শের সমবেদনার সঞ্চার হয়েছিল। এখানেই মানুষের সুকুমার-বৃত্তিনিচয়ের পরিচয় মেলে। সে আবার ভাবল, তবে আমাদের 'ফণী' নয় নিশ্চয়ই! কী আর বলব! মেজদা আবার ফিরে এল এবং আমাকে নাকি তীক্ষ্ণভাবে নিরীক্ষণ করে চিনতে পেরে আমার মুখের ওপরে মুখ রেখে জোরে বলে উঠলেন, 'ওরে, তুই ফণী না?' আমি কোনো কথা বলতে পারি নি। শুধু একটা ক্ষীণ আওয়াজ আমার কানে এসেছিল। তাতে নাকি আমি শুধু দু'টো চোখ একটু মেলেছিলাম, তার পরের ঘটনা আর কিছুই জানি না। তারপরে জানতে পারলাম, মেজদা আর কোনো কথা না-বলে তাড়াতাড়ি একটা ট্যাকসি ডেকে আমাকে ধরাধরি করে তুলে নিয়ে সোজা বাসায় নিয়ে আসে এবং দীর্ঘদিন ধরে আমার চিকিৎসা করায়। ফলে, ভগবানের কৃপায় প্রাণে বেঁচে গেলাম এবং একটু মনুষ্যাকৃতি লাভ করলাম। কিন্তু আমার পূর্ব-স্বাস্থ্য আর ফিরে পেলাম না।

ভারতের নৌ বিদ্রোহের প্রথম অধ্যায়ের বর্ণনা প্রসঙ্গে একটা কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, ভারতীয় সশস্ত্রবাহিনীতে (স্থল, নৌ ও বিমানবাহিনীতে) কেন্দ্রীয় গোপন সংস্থার মাধ্যমে যে-সমস্ত দেশপ্রেমিক তরুণ (যাঁদের বয়স উনিশ থেকে পঁচিশের মধ্যে) প্রবেশ করেছিল সশস্ত্রবাহিনীতে বিদ্রোহ ঘটিয়ে দীর্ঘদিনের কলংকিত শৃঙ্খলিত ভারতমাতাকে মুক্ত করার মানসে, তাঁরা বেশির ভাগই ছিলেন কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি এবং ফরওয়ার্ড ব্লকের একনিষ্ঠ কর্মী। তবে ভারতীয়

কম্যুনিস্ট পার্টির কর্মীসংখ্যাও একেবারে কম ছিল না। এর পরের স্থানই হল কংগ্রেস ও মুসলিম লিগের। দেশের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা কিন্তু তখনো পূর্ণ হল না। তারা আশা পোষণ করতে লাগল :

'আনো নূতন প্রভাত, আনো নূতন জীবন ;
ভারতে ফিরিয়ে আনো নব বৃন্দাবন।'

দ্বিতীয় অধ্যায়

One step forward, two steps back.

মহান লেনিনের মহান নির্দেশ কার্য-পরম্পরায় আমাদের ওপরেও বর্তালো। আমরা আপাতত আন্দোলনের যে-পর্যায়ে এসে পৌঁছেছিলাম সেখান থেকে যাতে পিছিয়ে না পড়ি, যে-স্তরে এসে পা রেখেছি সেখানে যাতে দু'টো পা-ই শক্ত করে রাখতে পারি, এবং ভবিষ্যতে পায়ের তলায় মাটিকে দৃঢ় রেখে আবার যাতে শক্ত আঘাত হানা যায় তার জন্যে দেশের তথা সমগ্র পৃথিবীর পরিস্থিতি ভালভাবে নিরীক্ষণ ও গতিপ্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করে চলতে লাগলাম। আমি তখন পর্যন্ত অসুস্থই ছিলাম। কিন্তু অসুস্থ অবস্থায় থেকেও দেশের তথা সমগ্র পৃথিবীর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও বৈষয়িক সবরকম অবস্থার গতিপ্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করে চলা স্তব্ধ হল না। চলতে থাকল জ্ঞান-সাধনা। কারণ, ভারতে 'নতুন প্রভাত' আনবে যে-নবজাতক তাকে তো নবজন্ম লাভ করাতে হবে। তারই কর্মপ্রচেষ্টা চলতে থাকল দিকে দিকে। আপাতত সংগ্রামের হাতিয়ার তুলে রাখা হল জ্ঞানচর্চার নিমিত্তে।

এ-সময়েই হঠাৎ চার যায়গা থেকে চাকরির প্রস্তাব পেলাম। একেবারে সোজা-সুজি চাকরিতে যোগ দেওয়ার চিঠি। কিন্তু অবাক হলাম যে আমি কোথাও চাকরির জন্য দরখাস্ত করি নি। কারণ, আমার স্বাস্থ্য কাজ করার উপযুক্ত তখনো হয় নি এবং আমার বাড়ির শুভাকাঙ্ক্ষীরা চান নি যে আমি এরকম শারীরিক অবস্থায় চাকরি করি। একসঙ্গে চারটি বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানের চাকরির প্রস্তাব! কিন্তু এর কারণ কী? বড়দার কথাই ঠিক মনে হল। তিনি বলেছিলেন যে, এটি ইংরেজদের একটি সুচতুর কৌশল। আন্দোলন হতে বিমুখ করার জন্যই আমাকে এসব লোভনীয় প্রস্তাব দিচ্ছে। তাঁর পরামর্শমত আপাতত রেলওয়ের অফিসার পদ গ্রহণ করলাম। আরো অদ্ভুত ব্যাপার এই যে আমার জন্য তৎকালীন রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ চাকরির শর্তাবলী অনেক শিথিল করেছিল। হতে পারে, ইংরেজদের উদ্দেশ্য ছিল আমাকে রাজনীতি হতে দূরে সরিয়ে রাখার।

লর্ড ওয়াভেল ১৯৪৫ সালের মার্চ মাসে ব্রিটিশ সরকারের সাথে পরামর্শের জন্য লণ্ডন যান। তাঁর ভারতে প্রত্যাবর্তনের (১৯৪৫ সালের ৪ জুন) কয়েকদিন পরে (১৯৪৫ সালের ১৪ জুন) ভারত-সচিব অ্যামেরী কমন্স সভায় একটি বিবৃতি দেন। বিবৃতিতে বলা হয়, '১৯৪২ সালের মার্চ মাসের প্রস্তাব কোনোরূপ পরিবর্তন বা সর্তসাপেক্ষে না-রেখে পুরোপুরি বহাল থাকল।' নতুন সংবিধান রচনার আগে গভর্নর জেনারেলের শাসন পরিষদকে পুনর্গঠিত করার প্রস্তাব করা

হল। গভর্নর জেনারেল ও প্রধান সেনাপতি ব্যতীত (প্রধান সেনাপতি যুদ্ধ-সচিবের পদে বহাল থাকবেন) শাসন পরিষদের অন্য সদস্যগণ ভারতীয় রাজ-নৈতিক নেতৃবৃন্দের মধ্য থেকে সরকার কর্তৃক মনোনীত হবেন। শাসন পরিষদের সদস্য মনোনয়নে প্রধান প্রধান সম্প্রদায়ের সমভার প্রতিনিধিত্ব (balanced representation) থাকবে, এর মধ্যে মুসলমান ও বর্ণ হিন্দুদের আনুপাতিক হার হবে সমান সমান। বৈদেশিক দপ্তর গভর্নর জেনারেলের হাত থেকে শাসন পরিষদের একজন ভারতীয় সদস্যের হাতে দেওয়া হবে। তবে ভারতের প্রতি-রক্ষার অংশ হিসাবে উপজাতীয় ও সীমান্ত সম্পর্কিত বিষয়গুলি এই দপ্তরের অন্তর্ভুক্ত হবে না। বিবৃতিতে এইরূপ আশা প্রকাশ করা হল যে, কেন্দ্রের সহযোগিতার ছাপ প্রদেশগুলিতেও পড়বে এবং যে-সমস্ত প্রদেশে ৯৩ ধারায় (১৯৩৫ সালের আইনের) শাসন চলছে সেখানে প্রধান দলগুলির সহযোগিতার (qualition) ভিত্তিতে দায়িত্বশীল সরকার গঠিত হবে।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের মুক্তিদান করা হল ১৯৪৫ সালের ১৬ জুন এবং সেই বছরে জুন-জুলাই মাসে সিমলায় নেতৃবৃন্দের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত *হল। শাসন পরিষদের গঠন সম্পর্কে সম্মেলনে কোনো মতৈক্য হল না। কংগ্রেস* দু'জন কংগ্রেসী মুসলমানকে শাসন পরিষদের অন্তর্ভুক্ত করার দাবি তুললে জাতীয় সংগঠন হিসাবে শুধুমাত্র হিন্দুদের মনোনয়নের অধিকার গ্রহণ করতে কংগ্রেস স্বীকৃত হল না। মহম্মদ আলি জিন্না দাবি করলেন যে, পরিষদের সমস্ত মুসলিম লিগই নির্বাচন করবে। লর্ড ওয়াভেল ঘোষণা করলেন, সম্মেলন ব্যর্থকাম হয়েছে। তৎকালীন কংগ্রেস সভাপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ মন্তব্য করে-ছিলেন যে দেশের প্রগতিকে রুদ্ধ করতে মুসলিম লিগকে বড়লাটই সাহায্য করছেন।

সিমলা সম্মেলনের ব্যর্থতার পর, ব্রিটেনে শ্রমিক দল (Labour Party) ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ায় এবং যুদ্ধে পরবর্তীকালে আন্তর্জাতিক জটিলতা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে ভারত সম্পর্কে ব্রিটিশ-নীতির ধারার পরিবর্তন সূচিত হল। আজাদ হিন্দ ফৌজের কয়েকজন সেনানীর বিচারে জনগণ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। এই বীর যোদ্ধাদের আদর্শের প্রতি সম্পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করায় কংগ্রেসের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেল। স্থির হল, ১৯৪৫-৪৬ সালে শীতকালে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক বিধান-মণ্ডলীগুলির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ১৯৪৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে লর্ড ওয়াভেল ঘোষণা করলেন যে, নির্বাচন-পর্ব শেষ হলে একটি সংবিধান-রচনাকারী সংস্থা নিয়োগ করা হবে এবং প্রধান রাজনৈতিক দলগুলির সমর্থন নিয়ে বড়লাটের শাসন-পরিষদ পুনর্গঠিত হবে।

নির্বাচনের ফলাফলে দেখা গেল যে, সমস্ত প্রদেশেই অ-মুসলমান আসনগুলি এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের বেশির ভাগ মুসলমান আসন ও যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বিহার, আসামের কতকগুলি মুসলমান আসন কংগ্রেস লাভ করেছে।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ব্যতীত সমস্ত প্রদেশের বহু মুসলমান আসন মুসলিম লিগ পেল। বঙ্গদেশ ও সিন্ধুদেশ ব্যতীত অন্য সমস্ত প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠন করল। সর্বত্রই নিখাদ কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা গঠিত হল, কেবল পাঞ্জাবে কংগ্রেস, আকালী শিখ, ইউনিয়নিস্ট হিন্দু ও মুসলিম লিগ নিয়ে গঠিত হল যুক্তদলীয় মন্ত্রিসভা।

এই অবস্থার মধ্যে ১৯৪৫ সালের শীতকালে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের এক প্রতিনিধিদল ভারতে রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে সরাসরি অভিজ্ঞতা লাভের জন্য এদেশে আসেন, ফলে তখন দেশে এক বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি হয়। ভারতের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত স্বাধীনতার উদগ্র বাসনার অভিব্যক্তি ফেটে পড়ল। এই তরঙ্গের ধাক্কা দেশী-বিদেশী সরকারি-বেসরকারি সমস্ত সংগঠনের গায়ে লাগল; সেই আলোড়নের ঢেউ ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীতেও আলোড়ন তুলল। আবার শোনা গেল সাজ-সাজ রব। বলা-বাহুল্য, আমি যখন একটু সুস্থ হয়ে উঠি, তখন ঐ সেনাবাহিনীতে আন্দোলন শেষ হয় নি ভেবে আবার গোপন সংস্থার সাথে যোগাযোগ করবার চেষ্টা করি এবং সশস্ত্র বাহিনীর বাইরে থেকে ভেতরে আন্দোলন গড়ে তুলবার ইচ্ছা পোষণ করতে থাকি। ঐ সময়ে কেন্দ্রীয় গোপন সংস্থার অন্যতম সদস্য আর এস রুইকর আমার খোঁজে এলেন কলকাতায়। এখানে বলে রাখা প্রয়োজন, ১৯৪৫ সালের ভারতীয় সেনাবাহিনীতে বিদ্রোহ সাময়িক ভাবে ব্যর্থ হলেও কেন্দ্রীয় গোপন সংস্থা ভেঙ্গে যায় নি। যে-সকল সদস্য লড়াইয়ে মারা গেছে, কেবলমাত্র তাদের স্থলে নতুন সদস্য গ্রহণ করা হয়েছিল। যে ভাবেই হোক, রুইকর আমার খোঁজ পেয়ে একসময়ে এসে উপস্থিত হলেন কলকাতার নব্বই নম্বর বি টি রোডস্থ রেলওয়ে শ্রমিক সংগঠনের অফিসে। বিকেল তখন সাড়ে পাঁচটা। তিনি আমাকে ওই অবস্থায় দেখে খুব আনন্দ প্রকাশ করলেন। তাঁর ধারণা ছিল, আমি তখনো অসুস্থ অবস্থায় শুয়ে আছি।

সবিশেষ আলোচনার পরে, আমিও মনে করলাম, ওই সশস্ত্র সেনাবাহিনীতে এখনো আমাদের আন্দোলন শেষ হয় নি। অতএব, আবার গোপন সংস্থার সংগে যুক্ত থেকে আমার পুরনো কর্মক্ষেত্র বোম্বের মাটিতে দাঁড়িয়ে সশস্ত্র বাহিনীতে বিদ্রোহ ঘটানো আমার কর্তব্য। তবে তা বাহিনীর কর্মচারী হয়ে নয়, বাইরের সংগঠক হিসেবে। আমি রুইকরকে কথা দিলাম, আগামী নভেম্বর মাসে কলকাতা থেকে বোম্বের দিকে রওনা হব। তারপরে তিনি শ্রমিক-সংগঠনের কিছু কিছু কাজ-কর্ম দেখলেন এবং আনন্দও পেলেন। এরপরে তিনি তাঁর কলকাতার দলীয় অফিসে চলে গেলেন।

আবার এক গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করলাম দেশের ও দশের স্বার্থে। সার্বিক-হিতার্থে বলা যায় আমারও স্বার্থে। কারণ, দেশের স্বার্থ মানেই হল, আমারও স্বার্থ। দেশ স্বাধীন হলে আমরাও স্বাধীন হব। দেশ জাগলে আমিও জাগব। দেশ সুখী ও সমৃদ্ধিশালী হলে আমিও সুখী ও সমৃদ্ধ হব। এই তো নিয়ম। এইতো

প্রগতির ধারা। প্রকৃতি-জগতেও এই ধারা বর্তমান। প্রকৃতিতে যা ঘটছে, মানব-সমাজেও তা আবর্তিত হচ্ছে। আমরা সময়ে সময়ে অহমিকা বলে তা না বুঝে উলটো পথে চলতে থাকি। আর তার ফলেই আমাদের সামনে সামগ্রিক-ভাবে কখনো কখনো দেখা দেয় বিপদ! এই বিপদকেই জয় করতে হবে।

দায়িত্ব যখন নিয়েছি, তখন তা পালনও করতে হবে। ঠিক করলাম, আমার রেলওয়ের অফিস থেকে অন্তত তিন মাসের ছুটি নিতে হবে এবং তা আমি চাইলে, পেয়েও যাব বোধহয়। তবে একটু কিন্তু থেকে যাচ্ছে। সেই কিন্তুটি হল, সন্থ কেবল চাকরিতে ঢুকেছি, ভবিষ্যৎ বলা কঠিন। তবে চেষ্টা করব। ছুটি না-পেলে চাকরিটি খতম করেই যাব। তবু যেতেই হবে। এযে নিশির ডাক!

মধুপুরে হাওয়া বদলের অছিলায় ছুটির দরখাস্ত করলাম তিন মাস সময় চেয়ে। কিন্তু কী আশ্চর্য, সঙ্গে সঙ্গে ছুটি মঞ্জুর হয়ে গেল! সঙ্গে মধুপুর পর্যন্ত রেলওয়ে পাশও দিয়ে দিল!! আমিতো আনন্দে আটখানা। এবারে আমার 'যাত্রা হল শুরু।'

কিন্তু, এদিকে আর এক বিপদ দেখা দিল। এই বোম্বে যাবার ঘটনা সর্বতোভাবে গোপন রাখার চেষ্টা করা সত্ত্বেও যেভাবেই হোক আমার বাড়ির লোকজনেরা জানতে পেরেছিল। সবাই আমাকে বোম্বাই যাওয়ার ব্যাপারে নিবৃত্ত করবার চেষ্টা করল। যখন কিছুতেই কিছু হচ্ছে না, তখন তারা আমার মতামত না নিয়েই ৫ নভেম্বর হঠাৎ অস্বাভাবিকরূপে আমার বিয়ের ব্যবস্থা করল। অথচ ৭ নভেম্বর আমাকে বোম্বে যেতে হবে। মেয়ের বাবাও ছিলেন একটি বিপ্লবী দলের সদস্য এবং বড়দার বিশিষ্ট বন্ধু। তাঁরাও তাঁদের প্রস্তুতির কোনো সুযোগ না পেয়েও ওই অল্প সময়ের মধ্যেই বিয়ে দিতে রাজি হয়ে গেলেন। কী আর করব। কাউকেই উপেক্ষা করতে পারলাম না। শেষ পর্যন্ত বিয়ে করতেই হল।

৭ নভেম্বর। একদিকে বোম্বে, আর একদিকে পুষ্পশয্যা। একদিকে দেশের স্বার্থ, অন্যদিকে ব্যক্তিগত সুখস্বপ্ন আর আমোদ-আহ্লাদ। কোনটা বড়? দেশ না ব্যক্তি? ব্যক্তিকে নিয়েই দেশ—একথা ঠিক। কিন্তু সামগ্রিক স্বার্থে ব্যক্তি মিশে যায় দেশের মধ্যে। আমি একজন ব্যক্তি। কিন্তু বৃহৎ জগতে আমার পরিচিতি বা আত্মপ্রকাশ ঘটে থাকে বাঙালী তথা ভারতবাসী বলে। অতএব যার দ্বারা আমি পরিচিতি লাভ করলাম সেই-ই তো আমার কাছে বড়, সেই-ই তো আমার কাছে অতি প্রিয়। তাই বড় বা অতি প্রিয় যে-বস্তু, তার পেছনেই ছুটে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ। আর এটাই বোধহয় নিয়ম, এটাই বোধহয় শাশ্বত বিধি। ঠিক করলাম, যে ভাবেই হোক আমাকে নির্দিষ্ট তারিখে হাওড়া থেকে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার ট্রেন ধরতেই হবে।

সারা বাড়িতে তখন আনন্দ চলছে। আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব সবাই এসেছে। এই তো আমার সুযোগ। বাড়ির সবাই দারুণ ব্যস্ত। আমি সকলের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করে নিলাম। পরে অতি গোপনে মায়ের নামে একখানা চিঠি লিখে নতুন

বৌয়ের বালিশের নিচে চিঠিখানি রেখে দিলাম। পরে আবার সকলের সাথে নানারকম গল্পগুজব করে ঐ ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লাম। কাপড়-জামা যা পরা ছিল তা আর ছাড়লাম না। ছাড়লেই সন্দেহ হত। বরং একটা প্যান্ট ও একটা সার্ট সঙ্গে নিয়ে হাওড়ার দিকে ছুটলাম। কেউ-ই টের পেল না। হাওড়ায় এলাম সন্ধ্যা সাতটা পনের মিনিটে, আর পনের মিনিট মাত্র বাকি। বার বার ভাবছি, এর মধ্যে ধরা না পড়ি। অবশ্যই পুলিশের হাতে নয়, বাড়ির লোকদের হাতে।

কী আশ্চর্য, আর এস রুইকরও দেখছি এসে গেছেন। তাঁর তো অনেক আগেই চলে যাবার কথা ছিল। এদিকে আমাকে দেখে তিনিও খুব আনন্দ লাভ করলেন। নিজে থেকেই আমাকে বললেন যে, তিনি কলকাতায় সংগঠনের কাজে ব্যস্ত ছিলেন। তাই পূর্বের কার্যক্রম বাতিল করে দিয়েছিলেন এবং বোম্বের অফিসকে তা জানিয়েও দিয়েছেন। আজ সন্ধ্যায় বোম্বের উদ্দেশ্যে যে কলকাতা ত্যাগ করবেন, তাও জানিয়ে দিয়েছেন। মনে মনে ভাবলাম, আমার পক্ষে ভালই, হয়েছে। কারণ, এতদিন পরে বোম্বে যাচ্ছি। কাকে কোথায় পাব কি পাব না কিছুই ঠিক নেই। যদিও রুইকর তাঁদের বোম্বের দলীয় অফিসের (ফরওয়ার্ড ব্লক অফিসে) আমাকে উঠতে বলেছিলেন, তবুও তা তখন আমার কাছে নতুন বলেই মনে হয়েছে। কেননা আর যাই হোক আমি তো ফরওয়ার্ড ব্লক-এর সদস্য নই। ট্রেনের একই কামরায় দু'জনে চাপলাম। রুইকর একসঙ্গে দু'খানাই বোম্বের টিকিট কেটেছিলেন। পুরো টাকাটা তিনিই দিলেন। আমি আমার টিকিটের টাকাটা অন্তত দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তিনি তা না-নিয়ে উলটে বললেন, 'ওটা আপনার কাছেই রাখুন। আপনারই কাজে লাগবে। এমন সময় হয় তো আসবে, যখন অন্য কোথাও প্রয়োজন মত টাকা সংগ্রহ করতে পারবেন না, তখন এ-টাকা কাজে লাগাবেন। অবশ্য থাকা, খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় গোপন সংস্থাই করেছে। তবুও তো প্রয়োজন হতে পারে।'

রুইকর জানতেন, মুলতান মিলিটারি জেলে নিষ্ঠুর অত্যাচারের ফলে আমার শরীর একরকম ভেঙ্গেই গেছে। এই স্বাস্থ্য নিয়ে পূর্বের মত কেন্দ্রীয় গোপন সংস্থার সদস্য থেকে কঠোর পরিশ্রম (শারীরিক এবং মানসিক) করা আর সম্ভব নয়। তাই, তিনি আমাকে বললেন, '—এবারে আপনাকে কেবলমাত্র নৌবাহিনীর দায়িত্বই দেওয়া হবে, যাতে ভালভাবে আন্দোলন সংগঠিত করা যায়। বিশেষতঃ নৌবাহিনীতে একবার যখন আপনি আন্দোলন পরিচালনা করেছিলেন। অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন প্রচুর। আর এখন থেকে আপনার ছদ্মনাম রাখা হয়েছে—পি আপ্তে।'

এর পরে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমরা দু'জনে আলাপ-আলোচনায় মগ্ন হলাম। বিশ্বরাজনীতি, নেতাজীর রহস্যজনক অন্তর্ধান, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভরাডুবি, ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি, সবকিছু নিয়েই আলোচনা হল। পরিশেষে তিনি

বললেন, ভারতের সবকিছুই এখন নির্ভর করছে ব্রিটিশকে এখান থেকে তাড়ানোর ওপরে। কিন্তু কংগ্রেস ও লিগের সর্বতো ক্ষমতার গতি-প্রকৃতি বা মনোগতি খুবই উদ্বেগজনক। আরো অনেক প্রসঙ্গ আলোচনায় উঠল। এমন কি, আমি রেলওয়ে অথরিটিকে কি ভাবে ফাঁকি দিয়ে এলাম, তাও উঠল। অবশেষে ৯ নভেম্বর বোম্বে পৌঁছলাম। তারপরে ২ নম্বর হর্নবি রোডে ফরওয়ার্ড ব্লকের গোপন আড্ডায় আস্তানা গাড়লাম। একটি খাঁটি মহারাষ্ট্রীয় যুবক সাজলাম, নাম গ্রহণ করলাম পি আপ্তে।

১৯৪৫ সাল। নভেম্বর বিদায় নিচ্ছে। জাপান সাম্রাজ্যের পতন ঘটেছে। তার কয়েকদিন বাদে রহস্যময় পরিস্থিতিতে নেতাজীর জীবনের অবসান ঘটল (? ২৩ আগস্ট, ১৯৪৫)। মহামান্য ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালানো এবং ভারত সরকারের পতন ঘটানোর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অভিযোগে ব্রিটিশ কম্যাণ্ডার-ইন-চিফ অচিনলেক চেয়েছিলেন আই এন এ-র লোকদের বিচারের নামে ফাঁসি-কাঠে ঝোলাতে। ওদিকে যুদ্ধ চলাকালীন যে-সমস্ত বন্ধুরা (সৈনিক-বন্ধুরা, বিশেষ করে নৌবাহিনীর সৈন্যরা) পৃথিবীর বিভিন্ন দিকে চলে গিয়েছিল, যুদ্ধের শেষে নৌবাহিনীর 'তলোয়ার' জাহাজে এসে হাজির হতে লাগল সবাই। একদিন নৌ-ঘাঁটির বাইরে ফরওয়ার্ড ব্লকের গোপন আড্ডায় এস এম শ্যাম, যিনি মালয় থেকে সদ্য ফিরে এসেছেন, আজাদ হিন্দ বাহিনীর বিচিত্র কাহিনী বললেন। মালয় দখলকারী আজাদ হিন্দ বাহিনীর সৈন্যদের সাথে তাঁর যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছিল। তিনি প্রাক্তন আজাদ হিন্দ সরকারের কোনো কোনো সভ্যের কাছ থেকে চিঠি নিয়ে এসেছেন। সেই চিঠিগুলো ছিল পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এবং নেতাজীর জ্যেষ্ঠভ্রাতা শরৎচন্দ্র বসুর নিকট লেখা। তিনি কিছু কাগজপত্র এবং আলোকচিত্রও সঙ্গে এনেছিলেন। ঐ সমস্ত কাগজপত্র, চিঠি এবং আলোকচিত্র যথাস্থানে গোপন সংস্থার মাধ্যমে পৌঁছে দেওয়া হল।

এবারে নৌবাহিনীর ভেতরে অবস্থানরত দু'জন যোগ্য কর্মীকে ঠিক করা হল যারা নৌবাহিনীর বাইরে কেন্দ্রীয় গোপন সংস্থার শাখা সমিতির সঙ্গে যোগসূত্র রক্ষা করে চলবে। প্রত্যেক বড় বড় শহরে কেন্দ্রীয় গোপন সংস্থার শাখা সমিতি আছে। যদিও কেন্দ্রীয় গোপন সংস্থার কোনো কোনো সদস্য ১৯৪৪ সালের আন্দোলনে ধরা পড়ে জেলে গেছে ; তাতে কিন্তু কেন্দ্রীয় গোপন সংস্থা ভেঙে যায় নি বরং কয়েকজন নতুন সদস্য তাতে যুক্ত হয়েছে। (যেমন এস এম শ্যাম এবং বলাইচন্দ্র দত্ত। শেষোক্তজন ছিলেন আর আই এন এ-র B-21 Beach Signal Unit-এর বেতার-কর্মী। যুদ্ধের পরে এই ইউনিট ভেঙে দেওয়া হয়েছিল।) 'তলোয়ার' জাহাজে আজাদ হিন্দ ফৌজের আসন্ন বিচারের সংবাদে

নৌ-সেনারা বা রেটিংরা বিচলিত ও চঞ্চল হয়ে উঠল, ব্যারাকগুলোর আভ্যন্তরীণ অবস্থার চাপে পরিস্থিতি হয়ে উঠল আরো বেশি সংকটাপন্ন। যুদ্ধশেষে সামরিক কর্ম থেকে অব্যাহতি পাওয়া সৈন্যদের পুনঃ কর্ম-সংস্থানের বিষয়টির প্রতি ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের অবহেলা দেখা গেল। অতর্কিতে রেটিংরা বেকার হওয়ায় তাদের নির্মম বাস্তবতার সম্মুখীন হতে হল।

'তলোয়ার' জাহাজে আবার সেই খাবারের নিকৃষ্টতা নিয়ে গুঞ্জরন শুরু হয়েছে। অতীতে তাদের বন্ধুদের ওপরে কঠোর নির্যাতনের কথা তারা ভুলে যায় নি। তাই আবার আরম্ভ হল সেই কর্মসূচী, যা ১৯৪৪ সালের আন্দোলনে নেওয়া হয়েছিল। ১৯৪৪ সালের আন্দোলন তো ছাপ রেখে গেছে। চতুর্দিকে একটা ভাঙাগড়ার অবস্থা চলছে। যুদ্ধ শেষ হয়েছে, অবশ্য পুরোপুরি নয়। পুরোপুরি যুদ্ধ শেষ হয়েছিল ১৯৪৫ সালের ১৯ ডিসেম্বর। রেটিংদের মধ্য থেকে ছাঁটাই করা হয়েছে, আরো অনেকে ছাঁটাইয়ের সম্মুখীন, তারা নোটিশও পেয়ে গেছে। শুরু হল ছাঁটাই। অথচ বিকল্প ব্যবস্থা নেই। এখন সবাই বিকল্প চাকুরির ব্যবস্থার আবেদন নিয়ে ফ্ল্যাগ অফিসারের সামনে আবেদন রাখতে শুরু করেছে। পূর্বে যে-কঠোর শৃঙ্খলা বিদ্যমান ছিল তা যেন এখন অনেকটা ঢিলে হয়ে গেছে।

পৃথিবীর সামগ্রিক পরিস্থিতিও ব্রিটিশকে অনেকটা পঙ্গু করে ফেলেছে। দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থায় সর্বত্র অসন্তোষ, বিক্ষোভ যেন আত্মপ্রকাশ করতে চাইছে। এই অবস্থার মধ্যে কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করলেন, ১৯৪৫ সালের ১ ডিসেম্বর 'নৌ দিবস' হিসাবে পালন করা হবে। এবারে এই সর্বপ্রথম নৌ দিবসে দেশের অসামরিক জনগণকে আমন্ত্রণ জানানো হল আরব সাগরের তীরবর্তী নৌবাহিনীর প্রতিষ্ঠানগুলো এবং সুসজ্জিত জাহাজগুলো দেখার জন্যে। কর্তৃপক্ষ চেয়েছিলেন শিক্ষিত ভদ্রসন্তান দ্বারা গঠিত এক নাবিকগোষ্ঠী, পতাকা এবং অন্যান্য উপাদানে সুসজ্জিত জাহাজ-সমষ্টি দেখাতে। আভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থাও কঠোরভাবে রক্ষা করার প্রতি নজর রাখা হল। কিন্তু রেটিংরাও চুপ করে বসে নেই। তারাও গোপনে, অতি-সন্তর্পণে এই যোগাযোগের সুযোগ নেবার চেষ্টা করতে থাকল। তারা মনে করল, অসামরিক জনগণকে দেখাতে হবে যে, তারাও দেশের জনগণের সাথে একত্র হয়ে ব্রিটিশকে তাড়াতে বদ্ধপরিকর। তাই তারা পূর্বদিন সমস্ত রাত জেগে কঠোর পরিশ্রম করে সেই সজ্জিত প্রদর্শনীকে আগুনে পুড়িয়ে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করল।

ভোরবেলায় দেখা গেল 'তলোয়ার'-এর এখানে-সেখানে বিক্ষিপ্ত পোড়া পতাকা এবং পতাকার পোড়ানো কাপড়ে প্যারেড-গ্রাউণ্ড জঞ্জালে পরিণত হয়েছে। এমন কি ঝাঁটাগুলো ও বালতিগুলো পর্যন্ত রাখা হয়েছে একেবারে সামনে—প্রবেশপথে। প্রত্যেক দেয়ালে বড় বড় অক্ষরে রাজনৈতিক শ্লোগান লিখে রাখা হয়েছে, 'ভারত ছাড়ো', 'ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক', 'এখনই বিদ্রোহ করো', 'গোরাদের হত্যা করো' ইত্যাদি—সেই পূর্বের শ্লোগান।

কর্তৃপক্ষ ভোরবেলায় ঐসব দেখে একেবারে দিশেহারা হয়ে চেষ্টা করল তাড়াতাড়ি জায়গাটা পরিষ্কার করতে। ফলে রেটিংরা হল উত্তেজিত। ঠিক এই সময়েই একজন নৌ সেনা আর কে সিং তার পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দিল নৌ-কর্তৃপক্ষের কাছে, যেটা খোলাখুলিভাবে ব্রিটিশ-রাজকে অগ্রাহ্য করার মনোভাব। আমাদের মত ষড়যন্ত্রমূলক কার্যক্রমের ওপরে তিনি আস্থাশীল নন। এইভাবে আর আই এন থেকে বেরিয়ে যাওয়ার মধ্য দিয়ে তিনি চেয়েছিলেন রেটিংদের বিদ্রোহে সাহায্য করতে। তিনি একটু ভাবপ্রবণ ছিলেন; কিন্তু তাঁর বিশিষ্টতা স্বীকার করতেই হবে। এই সব ঘটনায় 'নৌ দিবস' উৎসব এবং তার উদ্দেশ্য পণ্ড হল। নিমন্ত্রিত জনগণকে কর্তৃপক্ষ মাইক্রোফোনে ঘোষণা করতে থাকেন, 'আজ নৌ-দিবস উৎসব অনিবার্য কারণবশত স্থগিত রাখা হল। পরবর্তী কোনো সময়ে আবার উৎসবের দিন ঘোষণা করা হবে।'

অবশ্য আসল কারণ জনগণ কিছু সময়ের মধ্যেই জানতে পেরেছিল। এদিকে যখন মিঃ সিংকে কম্যাণ্ডিং অফিসারের সামনে আনা হল, তখন মিঃ সিং মাথার টুপি খুলে ছুঁড়ে মারলেন মাটিতে। তারপর পা দিয়ে লাথি মারলেন। প্রকাশ করলেন রাজমুকুট এবং রাজার সৈনিকের প্রতি তাঁর প্রকৃত ঘৃণা ও অবজ্ঞা। ফলে, অন্যান্য রেটিংরা তা দেখে গর্বে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। কিন্তু ব্রিটিশ অফিসাররা হল উত্তেজিত। তাঁরা মিঃ সিংকে তিনমাসের সশ্রম কারাদণ্ড দিল। রেটিংদের কাছে মিঃ সিং একজন 'বীর নায়ক' নামে খ্যাত হলেন। তখন অনেকেই তাঁকে অনুকরণ করতে আগ্রহ প্রকাশ করতে লাগল।

দিন দিন রেটিংদের সাহস আরো বেড়ে যেতে লাগল। ছোটখাটো আরো অনেক ঘটনা ঘটতে থাকল। ওদিকে কতৃপক্ষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরো বেশি জোরদার করল। রেটিংদের মধ্যে যাদের ওপরে কর্তৃপক্ষের সন্দেহ ছিল, এবারে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাদের ছাঁটাই করতে আরম্ভ করল। ফলে ক্রমে ক্রমে নৌ-সেনারা উত্তেজিত হয়ে উঠল। ঠিক এই সময়ই জানাজানি হল যে, নেতাজীর আই এন এ বাহিনীর সৈন্যদের বন্দি করে দিল্লীর লালকেল্লায় বিচারের জন্যে আনা হয়েছে। তার কারণ, তারা নেতাজীর নেতৃত্বে ব্রিটিশের এবং তার সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছে। অতএব তাদের শাস্তি দিতে হবে। বিচার তো প্রহসন মাত্র। এসব ঘটনা রেটিংদের প্রচণ্ড উত্তেজিত করল। তার কিছুটা প্রকাশ পেল ১৯৪৬ সালের ২ ফেব্রুয়ারি যখন কমাণ্ডার-ইন-চিফ অচিনলেক সর্বপ্রথম 'তলোয়ার' পরিদর্শন করতে আসবেন—এই খবর প্রচার হওয়ার পরের ঘটনায়। রেটিংরা ঠিক করল, নৌদিবস উপলক্ষে যেভাবে বিদ্রোহ সংগঠিত করা হয়েছিল, তার চেয়ে আরো ভালোভাবে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে হবে।

এদিকে কর্তৃপক্ষও চুপ করে বসে নেই। কোনো প্রকার অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপ যাতে না ঘটতে পারে তার জন্যে সর্বপ্রকার পাকা ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। এই

সতর্কতার মধ্যেও বলাই দত্ত কয়েকজন সাথী নিয়ে যে-বেদির ওপরে দাঁড়িয়ে কম্যাণ্ডার-ইন-চিফ অভিবাদন গ্রহণ করবে, সেই বেদির গায়ে বড় বড় অক্ষরে লিখে রাখল, 'জয়হিন্দ', 'ভারত ছাড়ো'—এই শ্লোগান দু'টো। আর বেশি কিছু করা সম্ভব ছিল না। একে তো কড়া গার্ডের ব্যবস্থা ছিল, তার ওপরে অর্ডার ছিল বেদির কাছে কাউকে ঘোরা-ফেরা করতে দেখলে সঙ্গে সঙ্গে তাকে গুলি করে মারার। তবে একটা প্রবাদ-বাক্য আছে—'যত যেখানে কড়া তত সেখানে ঢিলা।'

এখানেও তাই ঘটল। যে-নিরাপত্তা বাহিনী ছিল কঠোরভাবে পর্যবেক্ষণ করার নিমিত্তে, সেই নিরাপত্তা বাহিনীর মধ্যেই ছিল আমাদের সক্রিয় কর্মী। ঐ সরষের মধ্যেই ছিল ভূত। তাই ঐ কঠোরতার মধ্যেই যতটুকু সম্ভব করা হল। রাতের পাহারা তীব্রতর থাকায় আমাদের কর্মীরা বেশিদূর অগ্রসর হতে না পেরে দু'টো শ্লোগান ছাড়া ব্যারাকের দেয়ালে আরো কিছু শ্লোগান লিখে এবং কিছু রাজদ্রোহী প্রচারপত্র সেঁটে দিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে বাধ্য হল। ভোলবেলায় প্রহরীরা এসে আবিষ্কার করল সেইগুলো। সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র ব্যারাকগুলিকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সার্চ করার আদেশ দেওয়া হল।

অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপ পরিচালনা করতে গিয়ে বলাই দত্ত রাতের পর রাত না ঘুমিয়ে কাটিয়েছেন; ফলে তিনি ছিলেন ক্লান্ত, অবসন্ন। যে-সময়ে তাঁর কাজ শেষ হয়েছিল তখন সবে ভোর হয়েছে। সূর্যের আলো ফুটে উঠেছে। তাঁর পক্ষে সব জিনিসগুলো লুকিয়ে ফেলা বা হাত সম্পূর্ণ ধুয়ে ফেলে পাহারাদারদের সম্পূর্ণ ফাঁকি দেওয়া সম্ভব হল না। তিনি এতই শ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন যে, অসাবধানতাবশত একাধিক সূত্র পেছনে ফেলে এসেছেন। ফলে, সেই পেছনে-ফেলে-আসা সূত্র ধরে অতি সত্বর গুপ্তসন্ধানী রক্ষীবাহিনী তাঁর সন্ধান পেয়ে গেল। তাঁর ঘর সার্চ করে সমাজতান্ত্রিক নেতা অশোক মেটার লিখিত 'ভারতীয় বিদ্রোহ : ১৮৫৭' এক কপি বই, কতকগুলো দোষারোপ করা কাগজপত্র এবং তাঁর নিজের ডায়েরি পেয়ে গেল। তাঁকে গ্রেপ্তার করা হল।

ঠিক ঐ একই সময়ে গ্রেপ্তার হল এস এম শ্যাম। গোপন সংস্থার যোগাযোগকারী দু'জন কর্মীই ধরা পড়ল। মনে হয়, উন্মাদনার আতিশয্যে তাঁরা আত্মপ্রসাদের মাত্রা পূর্বাহ্নেই একটু বাড়িয়ে ফেলেছিলেন। তাঁরা যে গোপন সংস্থার যোগাযোগকারী কর্মী তা সাময়িকভাবে হলেও ভুলে গিয়েছিলেন। নতুন করে আবার লোক খুঁজতে হচ্ছে। ঐ সময়ে আরো অনেক সক্রিয় কর্মী ধরা পড়ে বন্দি শিবিরে গেলেন। গোপন সংস্থার সাথে যোগাযোগ করার জন্যে ভেতরের অন্য আর একজনকে ঠিক করা হল, তিনি হলেন বিজয়কুমার ভট্টাচার্য—এইচ এম এস উলফ শিপ-এর গার্নার, নম্বর ১৮৮৩১। নৌবাহিনীর ভেতরে তিনি সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করলেন।

২ ফেব্রুয়ারির অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপের সংবাদ বোম্বাইয়ের সংবাদপত্রগুলিতে

ছাপা হয়েছিল। ফলে কম্যাণ্ডার-ইন-চিফ সেখানে এলেন ছ'ঘণ্টা পরে। এই ঘটনায় রেটিংদের মধ্যে এবং অন্যান্য জাহাজগুলিতে অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপের উৎসাহ আরো বেড়ে গেল। গোপন কার্যাদি পুরোদমে চলতে থাকল। কম্যাণ্ডার কিং হয়ে পড়লেন অধৈর্য।

এদিকে ধৃত বলাই দত্তকে পায়ে হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হল কম্যাণ্ডিং অফিসারের অফিসে। 'তলোয়ার'-এর সমস্ত অফিসারই সমবেত হয়েছিল সেখানে। অনেক কিছুই বলাই দত্তের কপালে আছে—এই ভাবখানা দেখিয়ে মিঃ কিং বলল, 'তা হলে তুমিই সেই লোক!' ওরা সবাই ধরে নিয়েছিল, এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যে শ্রীদত্ত মিথ্যার আশ্রয় নেবেন। কিন্তু তা না করে তিনি তাঁর সংকল্পে অবিচলিত থেকে গেলেন। মিঃ কিং গর্জে উঠে বললেন, 'তোমার কার্যকলাপের পরিণতি কী, তা জানো?' বলাই দত্ত সদম্ভে উত্তর দিলেন, 'শান্ত থাকো, তোমার গোলাবর্ষণকারী দলের সম্মুখীন হতে আমি প্রস্তুত।'

স্বাধীন ভারতের একজন সৈনিকের পক্ষে শত্রুর সম্মুখে দাঁড়িয়ে যতটা নির্ভীক-ভাবে বলা সম্ভব ততটা নির্ভীকভাবেই তিনি ঐ কথাগুলো বলেছিলেন। নিয়মকে নস্যাৎ করে শান্তভাবে তিনি একটা চেয়ার টেনে নিয়ে ওদের সামনেই বসে পড়লেন। পরিস্থিতিটা চলে গেল নৌবাহিনীর নিয়মধারায় বাইরে। এটা ছিল একান্তই কল্পনাতীত। দৃশ্যত প্রত্যেকেই হতবুদ্ধি এবং চূড়ান্ত অপমানিত হল। অফিসাররা বুঝতে পারল না এরপর কোন ভূমিকা তারা গ্রহণ করবে। আর আই এন-এর মধ্যে নিজ হাতে একটি শহিদ তৈরি করার মত সাহস মিঃ কিংয়ের ছিল না। তাই তিনি স্থির করলেন, ব্যাপারটা উচ্চতর নৌ-কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করবেন। তাই তাঁকে আবার বন্দিশিবিরের সেলে পাঠিয়ে দেওয়া হল। দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিও ছিল তখন ঘোরালো।

পরের দিন বলাই দত্তের গ্রেপ্তারের খবর বোম্বাইয়ের সংবাদপত্রগুলির প্রথম পাতায় প্রকাশ পেল। কম্যাণ্ডিং অফিসারের সম্মুখে তাঁর বীরত্বের কাহিনীর অতিরঞ্জিত বর্ণনা 'তলোয়ার'-এর আরো অনেক রেটিংকে অন্তর্ঘাতী কার্য করার অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল। তাঁর কয়েকজন সঙ্গী, যারা তখনো 'তলোয়ার'-এ উপস্থিত ছিল, তারা গোপন আন্দোলনকে আরো সুবিধাজনকভাবে জোরদার করার সুযোগ পেয়েছিল। সর্বত্রই স্লোগান লিখিতভাবে দেখতে পাওয়া গেল।

একদিন 'তলোয়ার'-এর কয়েকটি গাড়িকে অসাবধানতাবশত চারপাশে চকচকে ব্রিটিশ-বিরোধী স্লোগান বহন করেই শহরের ভেতর দিয়ে চলতে দেখা গেল। এতে কর্তৃপক্ষ হয়ে উঠল খুবই উদ্বিগ্ন। এই গাড়িগুলো সাধারণত সকালের দিকে বেরিয়ে আসত শহরের বাইরের ডিপোগুলোতে এবং সেখানে থেকে দুধ ও রেশনের জিনিস নিয়ে যেত 'তলোয়ার'-এ। স্লোগানগুলো লেখা হয়েছিল রাতেই। এমন কি কম্যাণ্ডার কিংয়ের গাড়িও নজরের বাইরে যেতে পারে নি। সে-গাড়ির গায়েও স্থান

গেল ব্রিটিশ-বিরোধী স্লোগান।

দেশের পরিস্থিতি অনুসারে বুদ্ধিমান লোক হলে সে হয়তো চেষ্টা করত কৌশলের সাহায্যে নৌ-বিভাগে নিয়মশৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনে পরিস্থিতি সামলে নিতে। কিন্তু কিং ছিলেন পুরাতনপন্থী। যুদ্ধ-পূর্ব নৌ-বিভাগের কর্মী, লম্বা জমকালো জবরদস্ত কিং ছিলেন বেশ দক্ষ অফিসার। সে-সময়কার অশিক্ষিত রেটিংদ্বারা পুষ্ট নৌ-বিভাগের আবহাওয়ায় তিনি ছিলেন একজন বেশ মানানসই অফিসার। তাঁদের মত লোকই ছিলেন আগেকার ব্রিটিশ-ভারতের যুদ্ধ-বিভাগের মেরুদণ্ড। তাঁরাই ছিলেন কিপলিং কথিত একগুঁয়ে রোদে-পোড়া তামাটে বর্ণের অবিচল নিয়মশৃঙ্খলা রক্ষাকারীদের প্রতীক—তাঁরাই গর্ব বোধ করতেন ভারতের ব্যাপারে সর্বজ্ঞ বলে। তাঁরা এ-দেশকে ভালবাসতেন নিজেদের কায়দায়, কিন্তু তাঁরা জানতে চান নি দেশের লোকদের। নতুন রাজনৈতিক জ্ঞানসম্পন্ন ভারতবাসী ছিল কিংয়ের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত। আমাদের ভাষা জানার মত ধৈর্য ছিল না তাঁর, আমাদের চিন্তাধারার তাৎপর্য উপলব্ধি-করা ছিল তাঁর পক্ষে আরো দুঃসাধ্য।

১৯৪৬ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি, যখন কিং মহিলা ব্যারাকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, তখন কয়েকজন তাকে (মিঃ কিংকে) উপহাস করে বেড়ালের ডাক ডাকতে থাকে। কিং রাগে জ্ঞানশূন্য হয়ে ব্যারাকের ভেতরে ঢুকে চাবুক মারতে থাকে এবং বলতে থাকে, 'তোমরা মাদী কুকুরের বাচ্চা, অসভ্য জংলীর বাচ্চা!'

রেটিংরা এতে চুপ করে থাকল না। সকলে মিলে হৈ-হৈ করে তাকে তাড়া করল। কিং সম্মান বাঁচাবার জন্যে কোনোরকমে পালিয়ে গেল। এর প্রতিবাদে চৌদ্দজন রেটিং সংঘবদ্ধভাবে (যদিও তা সামরিক আইনে বিদ্রোহ) অভিযোগ পেশ করল এক্‌জিকিউটিভ অফিসার লেফটেন্যাণ্ট কম্যাণ্ডার শ-এর নিকট। তিনি আবার তা পাঠিয়ে দিলেন কিংয়ের কাছে।

মিঃ শ পরিস্থিতির গুরুত্ব ভালভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন। ব্যক্তিগত এক চিঠিতে তিনি চেয়েছিলেন মিঃ কিং-কে সচেতন করতে। কিন্তু কিং তা গ্রাহ্যই করলেন না। শুনানীটা স্থগিত রেখে দিলেন প্রার্থনা-শুনানীর নিয়মমাফিক দিন পর্যন্ত। ১৬ ফেব্রুয়ারি যখন অফিসের কানুনমাফিক তাদের (সৈন্যদের) অভিযোগ শুনলেন, তখন তিনি (মিঃ শ) সৈন্যদের উলটে দোষী সাব্যস্ত করে ছাড়লেন এই বলে যে, 'তোমরা মিথ্যে অভিযোগ দায়ের করেছ।' সৈন্যদের (রেটিংদের) বিবেচনা করার জন্যে চব্বিশ ঘণ্টার সময় দেওয়া হল। রেটিংরা তাঁর উপদেশ গ্রহণ করল ভীতি-প্রদর্শন বলে।

অন্যদিকে লালকেল্লায় আই এন এ-র যুদ্ধবন্দিদের বিচার আরম্ভ হয়েছে। কংগ্রেস এদের সমর্থনে এগিয়ে এসেছে এবং সুপ্রসিদ্ধ ব্যবহারজীবীদের দ্বারা তাঁদের পক্ষ সমর্থন করাচ্ছে। রেটিংরাও এই কাজে নেমে পড়ল কেন্দ্রীয় গোপন সংস্থার নির্দেশমত। কেননা, এই কাজের মধ্য দিয়ে সৈন্যদের মধ্যে সংহতি এবং বিপ্লব-

চেতনাকে ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করবে। তাই রেটিংরা ঐ বন্দিদের খালাশ করে নিয়ে আসার জন্যে ব্যারাকে ব্যারাকে, জাহাজে জাহাজে ঘুরে ঘুরে চাঁদা তুলতে আরম্ভ করেছে। এই ফাঁকে ফাঁকে বিদ্রোহাত্মক কার্যকলাপও চালানো হচ্ছে। বলা বাহুল্য এ-সবই হচ্ছিল কেন্দ্রীয় গোপন সংস্থার মাধ্যমে, তাদেরই নির্দেশে। কর্তৃপক্ষ কিন্তু যা-হোক চোখ বুঁজে আছে, দেখেও যেন দেখছে না, বুঝেও যেন না বোঝার ভান। এই আবহাওয়ায় অনেক কাজের সুযোগ এসে গেল। ১৭ ফেব্রুয়ারির রাতে এক গোপন সভা করার প্রস্তাব নেওয়া হল। সেই সভায় সংগ্রামের খসড়া তৈরি হবে।

১৭ ফেব্রুয়ারির রাত। সকলে মিলিত হয়ে স্থির করল একটা কাজের ধারা। সবাই এসেছিল সেই 'তলোয়ার' জাহাজে। স্মরণীয় সেই ১৮ ফেব্রুয়ারি সমাগত। এই দিনেই বিদ্রোহ শুরু করার জন্যে কেন্দ্রীয় গোপন সংস্থা ১৯৪৪ সালে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। বিদ্রোহ হয়েও ছিল। কিন্তু কোনো এক সদস্যের গাফিলতির ফলে ঠিক সময়ে যোগাযোগের অভাবে তা সফলতা লাভ করতে পারে নি। সেই দিনকে স্মরণে রেখে ১৯৪৬ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি উদ্‌যাপনের মধ্য দিয়ে আবার বিদ্রোহ শুরু করা হবে। ১৯৪৪ সালের তুলনায় ১৯৪৬ সাল অনেক বেশি উপযুক্ত। রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিদ্রোহের অনুকূলে। ১৯৪৫ সালে এই সুযোগ গ্রহণ করা যায় নি। তখন নৌ, স্থল ও বিমানবাহিনীতে একটা ভাঙা-গড়ার অবস্থায় সেনানীদের মানসিক প্রস্তুতি গড়ে তোলা যায় নি। কিন্তু যুদ্ধ-শেষে যখন পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে সেনানীরা নতুন নতুন অভিজ্ঞতা ও প্রেরণা নিয়ে নিজ নিজ ব্যারাকে ফিরে এল, তখন আবার সেই সংঘবদ্ধ আদর্শ নিয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করতে থাকে। মাঝে মাঝে তার পরীক্ষাও হয়ে গেছে। তাতে তারা কিছুটা সফলতাও লাভ করেছে। তার কারণ, পূর্বের তুলনায় সামগ্রিকভাবে ব্রিটিশরাজ এখন দুর্বল হয়ে পড়েছে। এই সময়ে যদি সঠিকভাবে আঘাত করা যায় তবে তাকে হঠানো অসম্ভব হবে না। তাই এই '১৮ ফেব্রুয়ারি' উদ্‌যাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হল।

ঠিক হল, ১৯৪৪ সালে এই তারিখেই নিকৃষ্ট খাবার খাবে না বলে আন্দোলনের যে-ডাক দেওয়া হয়েছিল, এখনো সেই নিকৃষ্ট খাবার দেওয়া হচ্ছে। বরং পূর্বের তুলনায় এখন খাবার নিকৃষ্টতর। অতএব রেটিংরা ঐ খাবার গ্রহণ করবে না। অর্থাৎ আবার সেই 'খানা বন্ধ' অর্থাৎ 'না-খাবার, না-কাজ' আন্দোলন শুরু করা হবে। নতুনভাবে নৌবাহিনীতে কেন্দ্রীয় ধর্মঘট কমিটি তৈরি করা হল আন্দোলন পরিচালনার জন্য। স্থল ও বিমানবাহিনীতেও অনুরূপভাবে কর্মপন্থা গ্রহণ করা হল কেন্দ্রীয় গোপন সংস্থার মাধ্যমে।

দেশের সামগ্রিক জনগণের মনে আস্থা অটুট রাখার জন্যে [illegible] মুসলমান এম এস খানকে (নৌবাহিনীর একজন প্রধান সিগন্যাল[illegible] এবং পাঞ্জাবী শিখ মদন সিংকে (নৌবাহিনীর একজন টেলি[illegible]

করে হিন্দু-মুসলমানে সমন্বয় সাধন দ্বারা ছত্রিশ জনের সদস্য নিয়ে এক ধর্মঘট কমিটি গঠিত হল। সংক্ষেপে নামকরণ করা হল—এন সি এস সি (সেন্ট্রাল সেন্ট্রাল স্ট্রাইক কমিটি)। কেন্দ্রীয়-গোপন সংস্থা যথারীতি এই নবগঠিত কমিটির সাথে সংযোগ রক্ষা করে চলতে থাকল। পরে জানতে পেরেছিলাম, অন্য দুই স্থল ও বিমানবাহিনীতেও অনুরূপভাবে ধর্মঘট কমিটি গঠন করা হয়েছিল।

পূর্বেই বলা হয়েছে, এইবারে যেহেতু আমি শারীরিক দিক দিয়ে দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম, সেই হেতু আমাকে গোপন সংস্থার সমগ্র কাজে যুক্ত না রেখে সীমাবদ্ধভাবে নৌবাহিনীতে তার সংগঠনের সঙ্গেই যুক্ত রাখা হয়েছিল। তাই অন্য দুই ধর্মঘট কমিটির (স্থল ও বিমান) নেতৃস্থানীয়দের নাম জানার সুযোগ আমার হয় নি। নৌবাহিনীর কথাই তাই বলতে পারি। অবশেষে আমরা আবার বিদ্রোহের দিকে এগোতে লাগলাম।

১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৬। নিয়মমাফিক ভোর পাঁচটায় এইচ এম আই এস. (হিজ ম্যাজেস্টিস ইণ্ডিয়ান শিপ) 'তলোয়ার'-এর রেটিংদের জাগিয়ে তোলা হল। সকাল ৮ টায় তারা চলে গেল প্রাতরাশের জন্য মেসের কামরাগুলোতে। সংখ্যায় তারা দেড় হাজারেরও বেশি। হঠাৎ একটা চাপা গুঞ্জন উঠল। শীঘ্রই চারিদিকে একটা সোরগোল পড়ে গেল। কয়েক মিনিটের মধ্যে লোকগুলো বেরিয়ে এল মেস-হলের বাইরে। খাবার খাবে না তারা—খাবার নিকৃষ্ট, অপর্যাপ্ত। শ্লোগান উঠল—'না-খাবার, না-কাজ।' রাজনৈতিক ধাপে উঠবার পূর্ব ধাপ।

সিদ্ধান্তমত খানা বন্ধ শুরু হয়ে গেল। কেউ খাবার গ্রহণ করছে না। কর্তৃপক্ষ হতভম্ব। পূর্বের মত জুনিয়ার অফিসাররা এসে রেটিংদের বোঝাতে লাগল। কিন্তু ব্যর্থ হল তাদের প্রচেষ্টা। কর্তৃপক্ষের মনেও ১৯৪৪ সালের ঘটনা বার বার উঁকি দিচ্ছিল। মনের দিক দিয়ে ধাক্কাও যে খাচ্ছিল না, তা বলা যায় না। নিরাশ হয়ে তারা চলে গেল। পুরো পাঁচঘণ্টা কেটে গেল। রেটিংরা দলবদ্ধ হয়ে এখানে-সেখানে জটলা করতে লাগল। রাজনৈতিক পর্যায়ে আলোচনা শুরু হল। এখন প্রতিটি মুহূর্তই মূল্যবান। 'তলোয়ার'-এর রেটিংরা এবারে অবাধ্য উদ্ধত হয়ে উঠল।

দুপুর প্রায় ১টার সময়ে ফ্ল্যাগ অফিসার রিয়ার অ্যাডমিরাল র‍্যাটট্রে ছুটে এলেন 'তলোয়ার'-এ। ইনি এখন বোম্বাইয়ের নৌবাহিনীর সবচেয়ে উচ্চপদস্থ কর্মচারী। ১৯৪৪ সালের আন্দোলনকে চাতুরীর দ্বারা কৌশলে দমন করার পরেই তাঁর এই পদোন্নতি ঘটেছিল। রেটিংদের কাছে তিনি এসে সোজাসুজিই প্রস্তাব রাখলেন, কম্যাণ্ডার কিং-কে বদলি করে আনবেন ক্যাপ্টেন ইনিগো জোনসকে; এমনকি খাবারের প্রশ্নও সহানুভূতি সহকারে শুনতে চাইলেন।

কিন্তু রেটিংরা ক্যাপ্টেন ইনিগো জোনস-এর নাম শুনেই আঁতকে উঠল। এই জোনস সাহেবই তো ১৯৪৪ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি এম আর ব্যারাকস এবং ক্যাসেল ব্যারাকে নিরস্ত্র রেটিংদের গুলি করে মেরেছিল। করাচীসহ মোট ৫,৫০০ জন

রেটিংকে বন্দি করে কোর্ট-মার্শালের আইনে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়ে মুলতান সামরিক জেলে পাঠিয়েছিল তিলে তিলে মৃত্যুবরণ করতে। বহু রেটিং বা সৈন্য সেখানে প্রাণ হারিয়েছে। সর্বোপরি দুই বীরাঙ্গনা নারীকে তারাই তো ষড়যন্ত্র করে নিষ্ঠুরভাবে গুলি করে হত্যা করেছে। তখনো এই র‍্যাটট্রে সাহেব স্তোকবাক্য দিয়ে বলেছিলেন, ক্যাপ্টেন ইনিগো জোনস অন্যায়ভাবে গুলি চালিয়েছিল ; সুতরাং তাকে শাস্তিস্বরূপ বদলি করে কমাণ্ডার কিং-কে এখানে আনা হল। আজ আবার বলছেন, কমাণ্ডার কিং-কে বদলি করে ক্যাপ্টেন ইনিগো জোনসকে এখানে আনবেন। বলিহারি তাঁর চাতুরীর খেলা।

রেটিংদের কাছে তাঁর ধাপ্পা অতি সহজেই ধরা পড়ে গেল। রেটিংরা বুঝল ইনিগো জোনস বা কমাণ্ডার কিং উভয়েই এক। ছুরির এপিঠ আর ওপিঠ মাত্র। নামের কোনো মূল্য নেই। তাই রেটিংরা চিৎকার করে স্তব্ধ করে দিল তাঁর প্রস্তাব, আর সঙ্গে সঙ্গে স্লোগান উঠল সমস্বরে, 'ভারত ছাড়ো!' স্লোগান অনুরণিত হতে থাকল বাতাসের তালে তালে। র‍্যাটট্রে বেগতিক বুঝে তাঁর ফ্ল্যাগশিপে ফিরে গেলেন। ১৮ ফেব্রুয়ারি সমস্ত দিন-রাত কেটে গেল, খাবারগুলো পড়ে থেকে নষ্ট হল। 'তলোয়ার'-এ একটি ইংরাজেরও পাত্তা পাওয়া গেল না।

যে-ঝুঁকি নেওয়া হয়েছিল, তার ফলাফলের বিষয়ে আমাদের মনে কোনো সন্দেহের অবকাশ ছিল না। সৈন্য-বিভাগের মধ্যে জাতীয় আন্দোলন সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে আমরা সবাই যুদ্ধ করছিলাম। সফলতা আসুক বা ব্যর্থতাই আসুক আমাদের চেষ্টা কিছুটা ফলবতী হতে বাধ্য। কিছু কিছু ভারতীয় অফিসার কাজ করছিল। কারণ, পদমর্যাদা এবং সামান্য একটু সুযোগ-সুবিধাই ছিল তাদের কাছে আকাঙ্ক্ষার বস্তু। তাদের মধ্যে অনেকেই স্বাধীনতার সমর্থক ছিলেন। কিন্তু ব্রিটিশদের সঙ্গে প্রকাশ্যে বিবাদ করতে গেলে যে অনেক বেশি ত্যাগ স্বীকার করতে হয়! তাদের মধ্যে দু'-একজন যুক্তি দেখিয়ে বলেছিল, 'জাতীয়তাবাদী নেতারা আর জাতীয়তাবাদী সংবাদ-সংস্থাই তো স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করে চলেছে। এই ব্যাপারটা তারাই আমাদের চেয়ে ভাল জানে। আমরা কেন রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ব?' এই ধরনের বক্তা-অফিসারদের মধ্যে কোনো একজন বাঙালী অফিসার ব্রিটিশের পদলেহন করে ক্রমে ক্রমে ভাইস অ্যাডমিরাল পদে উন্নীত হয়ে বর্তমানে কর্মভার থেকে অবসর গ্রহণ করেছে।

আরব সাগরে তখন সূর্য অস্তমিত। 'তলোয়ার'-এ ধর্মঘট কমিটির সভা বসেছে। আলোচনা করে প্রথমে দাবি তোলা হল, 'আমাদের উন্নত ধরনের চাকুরির ব্যবস্থা আর উন্নত ধরনের খাদ্য দিতে হবে। এর সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে তৈরি করা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের ফিরিস্তিসহ আরো একপ্রস্থ দাবি তোলা হল, 'আই এন এ-র বন্দিসমেত সমস্ত রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তি চাই', 'ইন্দোনেশিয়া থেকে সমস্ত ভারতীয় সৈন্য সরিয়ে আনো', 'কিং-কে শাস্তি দেওয়া হোক', 'ভারত

ছাড়ো' ইত্যাদি। দেশবাসীকে এই গুরুত্বপূর্ণ খবর জানাবার জন্যে সন্ধ্যা ৭টায় প্রস্তুত হলাম আমরা।

এ-খবর বোম্বাই প্রেসের কাছে যখন পৌঁছে দেওয়া হল, বলতে গেলে তখন তারাও হতবুদ্ধি হয়ে পড়ল। দৃঢ় জাতীয়তাবাদী মতের ঐতিহ্যবহনকারী দৈনিক 'ফ্রি প্রেস জার্নাল' সংবাদপত্রের সম্পাদক এস নটরাজন এই চাঞ্চল্যকর সংবাদের গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন। সাহসে ভর করে তাঁর সংবাদপত্রের কলমের সদ্ব্যবহার করতে রেটিংদের আমন্ত্রণ জানালেন। সংবাদপত্রে সাধারণত সরকার-প্রকাশিত সংবাদই প্রচারিত হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম আছে বৈকি। ১৮ ফেব্রুয়ারি বাকি সমস্ত জাতীয়তাবাদী সংস্থার মধ্যে কেউ-বা আমাদের করলেন অবিশ্বাস, কেউ-বা সরকারের বিরাগভাজন হওয়ার ঝুঁকি নিতে সাহস করল না। 'ফ্রি প্রেস জার্নাল' আমাদের প্রচারের মাধ্যম হয়ে উঠল। পরবর্তীকালে বিদ্রোহের খবরের জন্য তন্ন-তন্ন করে খুঁজে দেখা হয়েছিল ঐ সংবাদপত্রের তৎকালীন সমস্ত খবর।

১৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৬। অতি ভোরে ক্যাসেল ব্যারাকে খবর পৌঁছল 'তলোয়ার'-এর ওপরে গুলি চালানো হয়েছে। ক্যাসেল ব্যারাকসহ সমস্ত ব্যারাকগুলো 'খানা বন্ধ'-এর আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল। কিন্তু তথনো তা ছিল নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে, যদিও সামরিক পরিভাষায় তা 'বিদ্রোহ' হিসাবে পরিগণিত। এবারে গুলি চালনার ঘটনায় ফল হল মারাত্মক। 'তলোয়ার'-এর সৈন্যদের গুলি করে মেরে ফেলছে'—এ-সংবাদে সবাই ক্ষিপ্ত হল। তখন সকলেই মারমুখো হয়ে ছুটে আসতে লাগল 'তলোয়ার'-এর দিকে। 'তলোয়ার' কিন্তু তখনো স্বাধীন। ব্রিটিশরা তো আগেই পালিয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছে। হয়তো বা মনেও ভয় ঢুকেছিল, ১৯৪৪ সালের প্রতিশোধ ভারতীয়রা এবারে নেবে।

১৯ ফেব্রুয়ারির সূর্য অস্তমিত। 'তলোয়ার' এখন আর একা নয়। বোম্বাইয়ের তীরে এগারোটি প্রতিষ্ঠানের প্রায় কুড়ি হাজার রেটিং মিলিত হয়েছে। পোতাশ্রয়ের সব জাহাজ থেকে নামিয়ে ফেলা হয়েছে ইউনিয়ন জ্যাক। আটচল্লিশ ঘণ্টা বাদে পরের দিন সকালে ভারতীয় নৌ-সেনার সকল সংস্থা থেকেই ব্রিটিশরা তাঁদের প্রভুত্ব হারিয়ে ফেলল। ধর্মঘট ছড়িয়ে পড়ল চুয়াল্লিশটি জাহাজে, চারটি মেজর বেস্-এ, চারটি ফ্লোটিলাতে এবং কুড়িটি সমুদ্র-তীরবর্তী অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ থেমে গেছে ১৯৪৫ সালের ১৯ ডিসেম্বর। 'খাইবার' জাহাজ তখনো নিখোঁজ। সেই 'খাইবার' জাহাজও এবারে এইদিনে বোম্বাইতে এসে গেছে। যুদ্ধের সময়ে জার্মান টর্পেডোর আঘাতে জখম হয়ে জাহাজ ভাসতে ভাসতে গিয়েছিল ফ্রান্সের উপকূলে। সেখানে জার্মান নাৎসিরা ঐ জাহাজসুদ্ধ সবাইকে বন্দি করে রাখে। যুদ্ধশেষে ছাড়া পেয়ে এবারে তারা ভারতে ফিরে এল।

বোম্বাইয়ে 'তলোয়ার' জাহাজ হল নাবিকদের সংগ্রামী কমিটির ঘাঁটি। সেখান থেকে সাংকেতিক বেতার-বার্তায় নির্দেশ ছুটল প্রতিটি জাহাজের প্রতিটি নাবিকের

কাছে, 'যদি দেশকে ভালবাসো, যদি সাম্রাজ্যবাদকে ঘৃণা করো তবে ১৯৪৬ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি নৌবহরের হরতালে সামিল হও।' 'খাইবার' জাহাজ তখন ছিল আরব সাগরের মাঝখানে, যাচ্ছিল করাচী। সংকেত পেয়ে ছুটে এল বোম্বাইয়ে। নাবিকদের আনন্দ আর ধরে না। একে তো গেল-যুদ্ধে 'খাইবার' নিখোঁজ হয়েছিল, তার ওপরে যখন সে বন্দিদশা থেকে মুক্ত হয়ে দেশে ফিরেছে তখন কর্তৃপক্ষ তাকে বলেছিল করাচী যেতে। কারণ অতি পরিষ্কার। কর্তৃপক্ষ জানত 'খাইবার'-এর অতীত বীরত্বের কথা। তাই সে যাতে বর্তমান নৌ বিদ্রোহে যোগদান করতে না পারে তার জন্যই তাকে নির্দেশ দিয়েছিল করাচী যেতে।

কিন্তু কর্তৃপক্ষের কী দুর্ভাগ্য, তখনো পর্যন্ত তারা জানত না যে, করাচীও আন্দোলনে নেমে পড়েছে। তাই, 'খাইবার' যখন বেতারসংকেতে জানতে পারল যে বোম্বাইয়ের সমস্ত জাহাজ, ব্যারাক এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলো একযোগে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে, ব্রিটিশ সৈন্য তাদের ওপরে গুলি চালিয়ে অনেককে হত্যা করেছে, তখন জাহাজের ভারতীয় নাবিকেরা ইংরাজ অফিসার ও গোরা সৈন্যদের বন্দি করে রেখে নিজেরা জাহাজ চালিয়ে নিয়ে এল বোম্বাইয়ে। 'খাইবার'ও যোগ দিল আন্দোলনে।

এদিকে ক্যাসেল ব্যারাকে একদল ভারতীয় রেটিং উদাত্তকণ্ঠে বলতে লাগল, 'হে ক্যাসেল ব্যারাকের বন্ধুগণ, তোমরা তোমাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ বছরগুলো খুইয়েছ তোমাদের বিদেশী প্রভুদের হয়ে যুদ্ধ করে। এখন তোমাদের ভাইদের রক্ত ঝরিয়ে ওরা তার পুরস্কার দিয়েছে। 'তলোয়ার'-এর ওপরে গুলি করে ব্রিটিশ টমিরা বেয়নেটের খোঁচায় মেরে ফেলছে তোমাদের ভাইদের। আর মূর্খের মতন দাঁড়িয়ে থেকো না—চলে এসো দেশ মুক্ত করার কাজে, স্বাধীনতার কাজে।'

এই আহ্বানে রেটিংরা পাগলের মত দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হল এবং সংবাদ বাহকরা ছুটে বেরিয়ে গেলে তাদের অনুসরণ করল। বিদেশীদের যা-কিছু চোখে পড়ল তা দেখে তাদের মনে ক্রোধের সঞ্চার হল। শহরের বড় বড় সড়ক দিয়ে যেতে যেতে বিদেশীদের দেখতে পেয়েই তখনই তাদের তাড়া করল, তাদের দিকে পাথর ছুড়তে লাগল। বিশেষ করে বিদেশী মালিকদের দোকানগুলোর ওপরে পাথর পড়তে লাগল। টেনে নামিয়ে ফেলা হল ইউ এস আই এস লাইব্রেরির পতাকা। চিৎকার করতে লাগল শ্লোগান দিয়ে 'ইনক্লাব জিন্দাবাদ!' ব্রিটিশ মালিকানায় সমস্ত সান্ধ্য সংবাদপত্রে বড় বড় হরফে আর্তনাদ প্রকাশিত হল, 'নৌ-সৈন্যরা খুনের নেশায় মেতেছে।'

এবারের আন্দোলনে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে অনেক ভারতীয় অফিসার রেটিংদের সঙ্গে যোগদান করল। এ-যুদ্ধে শুধু বোম্বাইয়ের নৌ-সেনারা নয়, করাচীর 'হিন্দুস্থান' জাহাজও যোগ দিয়েছে। তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে 'বাহাদুর', হিমালয়', 'চম্পক', এবং করভেট 'ত্রিবাঙ্কুর'। সর্বোপরি করাচীতে আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন

বিশ্যা সিং। আজ করাচীও উত্তাল-উদ্দাম।

কলকাতাও অবশ্য চুপ করে ছিল না। স্থল ও বিমানবাহিনীতেও আলোড়নের সৃষ্টি হল। কেন্দ্রীয় গোপন সংস্থার গুপ্ত জাল চতুর্দিকে ছড়ানো ছিল বলেই সুশৃঙ্খলভাবে আন্দোলন পরিচালিত হচ্ছিল। সব জাহাজে, ব্যারাকে এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে একই ধরনের ব্যাপক বিদ্রোহ পরিলক্ষিত হল। তা ছাড়া স্থল ও বিমানবাহিনীও যে পা বাড়িয়েছিল এবং দেশের ব্যাপক জনগণও যে এই বিদ্রোহের অংশীদার হয়েছিল, তাও ঐ গুপ্ত সংস্থার প্রচেষ্টায়। নতুবা বিস্তৃত বিদ্রোহ না হলে ভারত সরকার তথা ব্রিটিশ সরকার কেঁপে উঠবে কেন?

ঘন ঘন কেন্দ্রীয় ধর্মঘট সমিতির মিটিং বসছে। তাঁরা এবার সিদ্ধান্ত নিলেন আর আই এন এ-র এখন থেকে নতুন নামকরণ করা হল, 'ভারতীয় জাতীয় নৌবহর' (Indian National Navy)। তাঁরা আরো সিদ্ধান্ত নিলেন, এখন থেকে কেবলমাত্র জাতীয় নেতাদের কাছ থেকেই আর আই এন-এর রেটিংদের নির্দেশ নিতে হবে। এই বিদ্রোহের সংবাদ এবং প্রস্তাবগুলিও 'ফ্রি প্রেস জার্নাল'-এর দৃঢ়চেতা জাতীয়তাবাদী সম্পাদক এস নটরাজন বিশেষ গুরুত্বসহকারে প্রকাশ করলেন। তিনি এবারে সত্য চাপা দিলেন না, যা তিনি চাপা দিতে বাধ্য হয়েছিলেন ১৯৪৪ সালের ১১ ফেব্রুয়ারির সামরিক অভ্যুত্থানের পরে। ঐ সময়ে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল বোম্বাইয়ে ছিলেন। তিনিও সংবাদ পড়লেন এবং গুরুত্বও দিলেন। তিনি চেষ্টা করতে থাকলেন, বামপন্থীদলগুলোকে বাদ দিয়ে কিছু একটা করা যায় কিনা। কিন্তু ঘটনার গতি নিয়ে গেল অন্য দিকে। সংবাদপত্রে প্রকাশিত হল যে সমস্ত নৌবহর ভারতীয় সৈন্যরা দখল করে নিয়েছে। স্থল ও বিমানবাহিনীও বিদ্রোহের পথে পা বাড়িয়েছে। এই সংবাদ 'ফ্রি প্রেস জার্নালে' প্রকাশিত হওয়ায় অন্যান্য সংবাদ সংস্থাগুলি এবং অল ইণ্ডিয়া রেডিও বাধ্য হল ঘটনাকে তাদের সংবাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে।

আমাদের উদ্দেশ্য ভালভাবেই প্রচার লাভ করল, তবুও জাতীয় নেতাদের মধ্যে কোনো একজনকেও দেখা গেল না রেটিংদের জন্য অভিনন্দন পাঠাতে বা তাদের নির্দেশ দেবার জন্য কোনোরকম উত্তম প্রকাশ করতে। এর মূল কারণ ভারতে ব্রিটিশের প্রধান শক্তি যে-সামরিক বাহিনী সেই সামরিক বাহিনীতে বিদ্রোহ দেখা দেওয়ায় ব্রিটিশরাজ তার সাম্রাজ্যের শেষ আশা ছেড়ে দিয়ে ক্রুর পথে পণ্ডিত জওহরলালকে লোভ দেখালো ভারতের প্রধান মন্ত্রিত্বের পদ গ্রহণ করবার। এর উদ্দেশ্য ছিল দুটো। প্রথমত, ঐ প্রস্তাবিত ভারতের প্রধান মন্ত্রিত্বের পদ গ্রহণ করলে আপসের মধ্য দিয়ে পণ্ডিতজীর সহায়তায় ব্রিটিশরাজ তার সেই ঔপনিবেশিক অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যকে স্থায়ীভাবে বজায় রাখতে সক্ষম হবে এবং পর্দার আড়ালে থেকে তাদের সাম্রাজ্যের কাঠামোকে শোষণের মাপকাঠিতে ঠিক রেখে এগিয়ে যেতে পারবে।

অন্যদিকে তার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হল, পণ্ডিতজীকে প্রধান মন্ত্রিত্ব দেওয়ার মানেই হল ভারতে রাজনৈতিক সংগঠন হিসাবে কংগ্রেসকে বড় আসন দেওয়া। অর্থাৎ কংগ্রেসের হাতে ভারতের রাষ্ট্র কাঠামোর কর্তৃত্ব অর্পণ। ফলে মুসলিম লিগ ক্ষেপে যাবে। জিন্না সাহেব জেহাদ ঘোষণা করবে। হিন্দু-মুসলমানে দ্বন্দ্ব চরম পর্যায়ে এসে উপস্থিত হবে। তখন ভাগ-বাঁটোয়ারার মধ্য দিয়ে ব্রিটিশ তার চির-স্বার্থ অর্থনৈতিক-বুনিয়াদী-কাঠামোকে স্থায়ী আয়ের একটা পথ করে নিতে সক্ষম হবে। আর ভারতে বিপ্লবীদের বিপ্লবাত্মক কর্মপ্রচেষ্টা সাময়িকভাবে হলেও স্তব্ধ করে দেওয়া যাবে। পণ্ডিতজী তথা কংগ্রেস সবকিছু জেনেশুনেই সেই ফাঁদে পা দিলেন। খবর পড়ে কিন্তু ভারতের জনগণ (কোনো কোনো নেতা বাদে) আনন্দে দু'হাত তুলে ভারতীয় নৌ-সেনানীদের আশীর্বাদ করতে থাকে। বহুদিন ধরে জনগণের আশা ব্রিটিশ তাড়ানোর কাজ এবারে সফল হবে।

এই সময়ে নৌবাহিনীর ধর্মঘট কমিটির পক্ষ থেকে ভারতের সমস্ত রাজনৈতিক নেতাদের আমন্ত্রণ জানানো হল বিদ্রোহীদের প্রধান ঘাঁটি 'তলোয়ার'-এ আসতে। আর বীরত্বের ও দেশপ্রেমের পূর্ণ নেতৃত্ব দিয়েছিল 'খাইবার'। এই 'খাইবার' জাহাজই আবার বীরত্বের পূর্ণ প্রকাশ দেখিয়েছিল গত ১৯৭১ সালের ভারত ও পাকিস্তানের যুদ্ধে। ধর্মঘট কমিটি এবারে তাঁদের দাবিগুলো ঠিক করে নিলেন নেতাদের দেখাবার জন্যে। দাবিগুলো হল :

১ সমস্ত রাজনৈতিক বন্দির মুক্তি চাই। আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রতিটি সৈন্যের মুক্তি চাই।

২ 'তলোয়ার' জাহাজের নায়ক কম্যাণ্ডার কিং-এর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা চাই।

৩ অস্থায়ী সামরিক কর্মচারীদের বিকল্প চাকুরির ব্যবস্থা চাই।

৪ ব্রিটিশ নাবিকদের সমান অনুপাতে ভারতীয় নাবিকদেরও ভাতা দিতে হবে।

৫ ক্যান্টিনে ইংরাজ ও ভারতীয় নাবিকদের মধ্যে বৈষম্য চলবে না।

৬ খাবারের মান উন্নত করতে হবে।

৭ নৌবহর ছেড়ে যাওয়ার সময়ে পোশাক ফেরত নেওয়া চলবে না।

৮ ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরুদ্ধে ভারতীয় ফৌজ ব্যবহার করা চলবে না—ইত্যাদি।

গোপন সংস্থা থেকে যা ঠিক করে দিয়েছিল তাই রাখা হল। স্থল ও বিমান-বাহিনীতেও অনুরূপভাবে দাবি রাখা হয়েছিল। শুধু 'নৌবাহিনীর' স্থলে 'স্থল' ও 'বিমানবাহিনী' ব্যবহার করার নির্দেশ ছিল। এই ব্যাপারে প্রাথমিকভাবে নৌ, স্থল ও বিমানবাহিনীর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আপস-আলোচনার পথ খোলা রাখা হয়েছিল।

রেটিংদের উদ্দেশ্য ভালভাবেই প্রচারলাভ করলেও জাতীয় নেতারা বা তাঁদের মধ্যে কাউকেই দেখা গেল না রেটিংদের জন্য অভিনন্দন পাঠাতে বা তাদের নির্দেশ দেবার জন্য কোনোরকম উদ্যম প্রকাশ করতে। তবে কি রেটিংরা ভুল করেছে? জাতীয় নেতারা নীরব কেন? রেটিংদের কাছ থেকে জাতীয় নেতারা কী আশা করেছিলেন? তাঁদের কাছে গিয়ে শুধু শ্রদ্ধা নিবেদন! এই চিন্তায় রেটিংরা মনের দিক থেকে সংশয় প্রকাশ করতে থাকে। নৌবিভাগও ছিল তাদের কবজার মধ্যে। স্থলবাহিনী এবং বিমানবাহিনীও তাদের সঙ্গে রয়েছে।

গতকাল বোম্বাইয়ের ফ্ল্যাগ অফিসার রিয়ার অ্যাডমিরাল র‍্যাটক্রের ফ্ল্যাগশিপে ছয় ঘন্টাব্যাপী আপস আলোচনা চলে। গডফ্রে সাহেবও উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু ফল কিছুই হল না। আটটি দাবির একটিও তাঁরা মানলেন না। ওরা বললেন যে নৌবহরে হরতাল মানে বিদ্রোহ।

এদিকে বোম্বাইয়ের বন্দরে যত জাহাজ ছিল, সব জাহাজ থেকে উড়ছে কংগ্রেস-লিগ-কম্যুনিস্ট পার্টির পতাকা রজ্জুবদ্ধ ঐক্যের প্রতীক হয়ে। সেখানে ছিল, 'বেরার', 'মোতি', 'নীলম', 'যমুনা', 'কুমাওন', 'আউধ', 'মাদ্রাজ', 'সিনধ', 'মারাঠা', 'তীর', 'ধনৌজ', 'আসাম', 'নর্মদা', 'ক্লাইভ' এবং 'লরেন্স' ইত্যাদি মোট ৭৪টি জাহাজ। উপকূলে ফোর্ট ব্যারাকে, এম আর ব্যারাক্‌সে এবং ক্যাসেল ব্যারাকেও উড়ছে স্বাধীনতার পতাকা। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলোতেও স্বাধীনতার পতাকা উড়ছিল। কিন্তু তবুও দেখা গেল, কোনো নেতাই এলেন না রেটিংদের সঙ্গে কথা বলতে। অথচ রেটিংরা মনে করত ভারতীয়দের সাধারণ শত্রু ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সমগ্র ভারতবাসীর একতাবদ্ধ হয়ে (যেমন রেটিংরা করেছেন সর্বধর্মের, সর্বজাতির, সর্বরকম রাজনৈতিক মতবাদের সমন্বয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়ে) দাঁড়ানো একান্ত প্রয়োজন।

নৌ-বিভাগ দখল করা হয়েছে সবার প্রয়োজনে। নেতারা যে আসেন নি, তার মূল কারণ হল, তাঁরা তখনো পর্যন্ত চেয়েছিলেন রেটিংরা নৌ-কর্তৃপক্ষের সঙ্গেই একটা যুদ্ধ-বিরতির চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করুক, নিজেদের মধ্যে গণ্ডগোল মিটিয়ে নিক। বিশেষ করে তাঁরা তখন ১৯৪৬ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি ব্রিটিশ সরকার পার্লামেন্টে একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করেন, তাই নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন। এই ঘোষণায় কিছু নতুনত্বের সন্ধান ছিল বলেই তাঁরা (নেতারা) ওদিকে ঝুঁকে পড়েন বলা যায়, নৌ-বিদ্রোহের গুরুত্বকে কতকটা উপেক্ষা করেই তাঁরা চলছিলেন। ঐ ঘোষণায় ছিল, 'ভারতসচিব (লর্ড প্যাথিক লরেন্স), বোর্ড অব ট্রেডের সভাপতি (স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস) এবং ফার্স্ট লর্ড অব দি অ্যাডমিরালটি-কে (এ ভি অ্যালেকজাণ্ডার) নিয়ে গঠিত মন্ত্রিসভার সদস্যদের এক বিশেষ মিশনকে সংবিধান গঠনকারী সংস্থা নিয়োগ এবং প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর সমর্থনপুষ্ট শাসন পরিষদ গঠনের জন্য ভারতের নেতাদের সহিত আলোচনার্থে প্রেরণ করা হবে।

মন্ত্রিসভার এই সদস্যগণ বড়লাটের সাথে একযোগে কাজ করবেন।' এই ঘোষণাই 'ক্যাবিনেট মিশন'-এর সৃষ্টি করল।

এই ঘোষণার সঙ্গেই ১৯৪২ সালের ২২ মার্চ স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস দিল্লীতে এসে ১৩ এপ্রিল করাচী হয়ে লণ্ডন যাত্রার পূর্বে ব্রিটিশ সরকারের যে-খসড়া ঘোষণার প্রস্তাবগুলো পেশ করেছিলেন, তার সঙ্গে তুলনামূলকভাবে বিচার করে দেখতেই দেশের নেতারা ব্যস্ত ছিলেন। সেই খসড়া ঘোষণার প্রস্তাবগুলো ছিল এইরূপ :

১ যুদ্ধ বন্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতের নতুন সংবিধান রচনার জন্যে একটা নির্বাচিত সংস্থা গঠনের ব্যবস্থা করা হবে।

২ সংবিধান রচনাকারী সংস্থায় দেশীয় রাজ্যগুলোর প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করা হবে।

৩ সর্তসাপেক্ষে ব্রিটিশ সরকার উক্ত সংস্থা কর্তৃক প্রণীত সংবিধানটিকে স্বীকার ও অবিলম্বে কার্যকরী করবে।

৪ প্রাদেশিক বিধানমণ্ডলীর (Lower Houses) সদস্যগণ কর্তৃক আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে সংবিধান রচনাকারী সংস্থা নির্বাচিত হবে।

৫ নতুন সংবিধান রচনা না হওয়া পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকার ভারতের প্রতিরক্ষার জন্য দায়ী থাকবে। কিন্তু স্বদেশ, কমনওয়েলথ ও জাতিসংঘের সম্পর্কীয় সমস্ত ব্যাপারে ভারতের জনসাধারণের মুখ্য অংশগুলোর নেতৃবর্গের অবিলম্বে কার্যকরী অংশ গ্রহণ করাই ব্রিটিশ সরকারের কাম্য ও বাঞ্ছনীয়। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয়, পরবর্তী নতুন ঘোষণা (১৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৬) নতুনত্ব নিয়ে কেন এইরূপ সর্তহীন-ভাবে আগমন করল—নৌ বিদ্রোহ যখন তুঙ্গে আরোহণ করেছে এবং স্থল ও বিমান বাহিনী যখন বিদ্রোহের দ্বিতীয় ধাপে পা দিয়েছে। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, তবে কি ব্রিটিশ-সিংহ ভীত সন্ত্রস্ত হয়েই 'ছেড়ে দে মা, কেঁদে বাঁচি' বলে ত্রাহি-ত্রাহি ডাক ছেড়েছিল? তবে নেতারা যে বিভ্রান্ত হয়েছিলেন এবং বিদ্রোহীদের ভুল পথে পরিচালনা করেছিলেন, তাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

অনেকেই আশা করেছিল ইংরাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীদের এই সংগ্রামে অরুণা আসফ আলি বিদ্রোহের নেতৃত্ব গ্রহণ করবেন। কেননা, '৪২-এর আন্দোলনে তিনি তো ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈয়ের মত ঐতিহাসিক নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তাঁর পক্ষেই সম্ভব এগিয়ে আসা। কিন্তু দুর্ভাগ্য বিদ্রোহীদের! তিনি শুধু উপদেশ দিলেন, 'শান্ত থাকো'। তাঁর কথা যেন [illegible] লাগল মহাত্মা গান্ধীর প্রতিধ্বনি হয়ে। নৌ-বিভাগ ছিল নাবিকদের কব্জার মধ্যে। সৈন্যবাহিনী (স্থল ও বিমান) ছিল তাদের সঙ্গে। এমনি সংকট ও সুযোগের সন্ধিক্ষণে আসফ আলি নাবিকদের দাবিগুলির মধ্যে আইনের ছিদ্রের ব্যাখ্যা করতে বললেন।

তাঁর মতে প্রথমত নাবিকদের চাকুরির অভিযোগগুলি নাবিকরা গুলিয়ে ফেলেছে

রাজনৈতিক দাবির সঙ্গে। সুতরাং তিনি নাবিকদের অনুরোধ করলেন, ঐ দু'টোকে পৃথক করে ফেলতে ও চাকুরির দাবিগুলো নৌ-বিভাগের কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করতে। নাবিকরা বলল যে এখন নৌ-বিভাগের কর্তৃপক্ষ তো তারা। আসফ আলি বুঝতে পারলেন নাবিকরা তাদের দাবির খসড়া তৈরির সুবাদে তাঁর কাছে উপদেশ নিতে আসে নি। এসেছে রাজনৈতিক নেতৃত্ব পাবার আশায়।

তাই তাড়াতাড়ি তিনি নাবিকদের নির্দেশ দিলেন বোম্বাইয়ের কংগ্রেসের সর্বোচ্চ কর্তা সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের সঙ্গে দেখা করতে। আসফ আলি তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে পরে সংবাদপত্রে পরিষ্কার করে বলেছিলেন, 'ওরা (রেটিংরা) যা চেয়েছিল সেটা হচ্ছে, জাতীয় রাজনৈতিক শক্তিগুলোর কাছ থেকে ওদের ন্যায্য সমর্থন লাভ করা।' তাঁর হাতে আরো জরুরী (এই বিদ্রোহের চেয়েও জরুরী !) কাজ থাকায় তাঁকে এরপরে শীঘ্রই বোম্বাই ছেড়ে চলে যেতে হয়। কিন্তু তিনি বেচারী রেটিংদের জন্যে উমেদারী করে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুকে একটা টেলিগ্রাম করলেন এই বলে যে, তখন বোম্বাইয়ে নেহরুজীর উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন, একমাত্র তিনিই পারেন বোম্বাইকে বাঁচাতে, বোম্বাইকে রক্ষা করতে। পরবর্তী ঘটনাগুলো থেকে বুঝতে পারা গেল নেতারা নাবিকদের প্রচেষ্টাকে কী দৃষ্টিতে দেখেছিলেন। সেই তারবার্তা তারই এক পরিচ্ছন্ন সংক্ষিপ্তসার।

২০ ফেব্রুয়ারি বিকেল সাড়ে তিনটায় সামরিক পুলিশের গাড়ি এসে তুলে নিতে লাগল রেটিংদের, যে যেখানে ছিল সেখান থেকেই। সন্ধ্যাবেলায় যে-ছবি দেখা গেল তা ভয়াবহ। এদিকে ব্যারাকে এবং জাহাজগুলোতে খাদ্যের ভীষণ অভাব দেখা দিয়েছে। নানারকম গণ্ডগোলের মধ্যে খাদ্য মজুত করার দিকে লক্ষ্য ছিল কম। বিদ্রোহীরা চিন্তা করেছিলেন, দেশের নেতাদের ওপরেই যখন সব দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়া হয়েছে তখন খাদ্যের ব্যাপারেও তাঁরা উদাসীন থাকবেন না। কিন্তু কেন্দ্রীয় গোপন সংস্থার নেতৃত্ব তখনো তো বর্তমান ছিল। তাঁদেরও কি পরমুখাপেক্ষী হয়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকা ঠিক হয়েছে? আর যাই হোক কংগ্রেস নেতৃত্ব তো বিপ্লবী সংগঠন নয়। কেন্দ্রীয় গোপন সংস্থায় তো বেশিরভাগই ছিলেন অকংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ। কংগ্রেস নেতৃত্ব সব ঠিক করে দেবে—এ-আশা করলেন বা কী করে?

কিন্তু বর্তমান অবস্থায় খাদ্যের ভীষণ টানাটানি দেখা দিল। মাঝে মাঝে প্যারেল বস্তি (ওয়াটার ফ্রন্ট বস্তি) থেকে গোপনে কিছু কিছু খাদ্য পাঠিয়ে দেওয়া হত বটে, তবে তা প্রয়োজনের তুলনায় অতীব নগণ্য। অথচ যুদ্ধ করতে হলে খেতেও তো হবে। না খেয়ে কতদিন যুদ্ধ করা যায়? ওদিকে বোম্বাইয়ের রাস্তায় রাস্তায় রক্ত-গঙ্গা বইছে। বোম্বাইয়ের জনগণ নৌবিদ্রোহের সমর্থনে সর্বত্র দু'দিনের হরতাল পালন করার নির্দেশ পেয়েছে। ২১ ও ২২ ফেব্রুয়ারি সেই হরতাল পালনের দিন ধার্য হয়েছে। এই হরতালের আহ্বান করেছে বোম্বাইয়ের শ্রমিক সংস্থাগুলি। জনগণ

তাই রাস্তায় রাস্তায় নেমে পড়েছে। গোরা সৈন্য তাদের মেশিনগান ও বোম্বার্ড-কার সহ গুলি দিয়ে তার মোকাবিলা করছে।

অ্যাডমিরাল র‍্যাটট্রে জাতীয় নেতাদের মনোভাব বুঝতে পেরেছেন। বিদ্রোহীদের ডাকে যখন নেতারা এলেন না তখন র‍্যাটট্রে বোম্বাইয়ের সর্বত্র মার্শাল ল জারি করে গডফ্রের (নৌ বাহিনীর সর্বোচ্চ অফিসার) নির্দেশমত গুলি চালাবার আদেশ দিলেন। এই আদেশ করাচীতেও বর্তালো। বোম্বাই ও করাচীতে বহু লোক গুলিতে প্রাণ দিল। সবচেয়ে বেশি নৃশংস হত্যালীলা চালিয়েছিল বোম্বাইয়ের প্যারেল বস্তিতে এবং ডকইয়ার্ডে, যেখানে জাহাজের নাবিকদের পরিবার-পরিজন বাস করত। তারা বেশিরভাগই ছিল মহারাষ্ট্র এবং বোম্বাইয়ের অধিবাসী। বিশেষভাবে বলা যায় 'খাইবার' জাহাজের সৈনিকদের আত্মীয়স্বজন ঐ বস্তিগুলোতেই ছিল বেশি। বোম্বা-ইয়ের রাস্তায় এবং ঐ সমস্ত বস্তিতে আনুমানিক প্রায় সাড়ে সাত হাজার লোক প্রাণ হারালো অগ্নিবর্ষী গোলার আঘাতে। ঐ বস্তিতেই মহিলা সমিতির প্রধান নেত্রী কমলা ডোঙের দেহ গোরা সৈন্যদের শত সহস্র গুলিতে এবং বোমার আঘাতে ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে পথের ধুলায় মিশে গিয়েছিল।

এই ঘটনায় 'খাইবার' এবং 'নর্মদা' জাহাজদ্বয় চুপ করে থাকল না, থাকার কথাও নয়। তাদের হাতে প্রচুর অস্ত্র ছিল, এবারে তারা তা ব্যবহার করতে আরম্ভ করল। 'খাইবার' ঢুকেছিল খাঁড়ির ভেতরে সংকীর্ণ প্রণালীতে ক্যাসেল ব্যারাকের আক্রান্ত সহযোদ্ধাদের সাহায্য করতে। ব্রিটিশ নাবিকরা অতি দক্ষতা দেখাতে গিয়ে তৎক্ষণাৎ পাঁচটি শক্তিশালী যুদ্ধজাহাজ দিয়ে বন্ধ করবার চেষ্টা করল প্রণালীর মুখটি। উপকূল ঘিরে রেখেছে কিংস রয়েল রাইফেলস, ডারহাম লাইট ইনফেনট্রি, শ্রপসায়ার লাইট ইনফেনট্রি, আর ইলেভেনথ শিখ রেজিমেন্টের ফৌজ, যারা সাঁজোয়া গাড়ি, হালকা কামান আর মেশিনগান নিয়ে আক্রমণ চালাচ্ছিল। একমাত্র ওয়াটার ফ্রন্ট বস্তির কিয়দংশ ছাড়া সেই লৌহ যবনিকায় কোনোই ছিদ্র ছিল না। তারই মধ্য দিয়ে কামান দাগিয়ে এগোতে থাকে 'খাইবার।'

বোম্বাইয়ের সমুদ্রতীরে যেখানে ইংরাজরা বাস করত, বিশেষভাবেই সেখানে তীক্ষ্ণ নজর রেখে দূরপাল্লার কামান দাগতে থাকল। বিশেষ করে ক্যাসেল ব্যারাকের যে-দিকটায় ইংরাজরা থাকত সেখানটা দূরপাল্লার কামান দাগিয়ে একরকম উড়িয়ে দেওয়া হল।

এদিকে তীরে এবং শহরের মধ্যে জনতা বিক্ষোভ দেখাতে গিয়ে পথে মৃতদেহ-গুলি দেখে ক্রমেই হিংস্র হয়ে উঠল। তারা বোম্বাইয়ের হর্নবি রোডের যত ইংরাজ ব্যবসায়ীর দোকান ছিল, সবগুলো আক্রমণ করে আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে বিধ্বস্ত করল। সেখানেও অনেক ইংরাজকে হত্যা করা হল। এক কথায় বোম্বাই তখন বিদ্রোহী জাহাজীদের সম্পূর্ণ দখলে এসেছে। যে-সমস্ত ইংরাজ ছিল, তারা সবাই পালিয়ে প্রাণ বাঁচালো।

এই সময়ে বোম্বাইয়ের সর্বোচ্চ কংগ্রেস নেতা এক বিবৃতিতে বলেছিলেন, 'বন্ধুগণ, বোম্বাইয়ের নাগরিকবৃন্দ, নৌবহরের বীর জাহাজী ভাইরা, আমাদের অতি প্রিয় বোম্বাই শহরে আজ এক নিদারুণ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। গত ১৮ তারিখ থেকে দেশপ্রেমিক জাহাজীরা এক অভূতপূর্ব হরতাল আরম্ভ করেছেন। খাদ্য-বস্ত্র-ন্যায়বিচারের জন্য তাদের এই বীরত্বপূর্ণ ও শান্তিপূর্ণ সংগ্রাম ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে সন্ত্রস্ত করে তুলেছে। তাঁদের আশু দাবি-দাওয়ার প্রতি ভারতের জাতীয় কংগ্রেস পূর্ণ, সক্রিয় ও সর্তহীন সমর্থন জানাচ্ছে এবং এ-আশ্বাস আমি প্রতিটি জাহাজী ভাইকে দিচ্ছি যে, তাঁদের দাবি পূরণ না-করে অত্যাচারী ব্রিটিশ সরকারের কোনো উপায় নেই।

'কিন্তু কংগ্রেস গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছে, জাহাজীদের মধ্যে কেউ কেউ এই সংগ্রামকে এমন একটা জঘন্য সহিংস রক্তারক্তির রূপ দিতে চেষ্টা করছে যে, তাতে জাহাজীদের দাবি আদায়ের পথই রুদ্ধ হতে বসেছে। যেমন আজ ভোরবেলায় 'খাইবার' নামক জাহাজের অতর্কিত অবিমৃষ্যকারিতায় বহু নিরীহ ব্রিটিশ সৈনিক প্রাণ হারিয়েছে ক্যাসেল ব্যারাক এলাকায়। জাহাজী ভাইদের কাছে কংগ্রেসের আবেদন, অহিংস প্রতিরোধের পথ ত্যাগ করে সর্বনাশ ডাকবেন না। কংগ্রেস আরো লক্ষ্য করছে, বোম্বাই শহরে কম্যুনিস্ট ও অন্যান্য বামপন্থী দলগুলি জাহাজীদের ন্যায্য দাবিগুলির সুযোগ গ্রহণ করে চরম বিশৃঙ্খল সৃষ্টি করছে।

'আজ তারা অতর্কিতে সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিল, মিছিল বার করে হর্নবি রোডের যত ইংরাজ দোকান আছে সবগুলো আক্রমণ করে বিধ্বস্ত করেছে। আজ সন্ধ্যার মুখে ফ্লোরা ফাউন্টেন এলাকায় পুলিশ মিছিলের গতিরোধ করায় বামপন্থী সুযোগসন্ধানীরা পুলিশের ওপর ইট-পাথর নিয়ে হামলা চালায়। ফলে পুলিশ গুলিবর্ষণ করে।

'তারপর থেকে এখন পর্যন্ত পুরো বোম্বাই শহরে চরম অরাজকতা বিরাজ করছে। বিশেষ করে শ্রমিক এলাকাগুলি ও জাহাজী অধ্যুষিত ওয়াটার ফ্রন্ট এলাকায় খুন-জখম অগ্নিসংযোগ ও রাহাজানি এক কলংকময় আকার পরিগ্রহ করেছে। বামপন্থীরা আবার কালকেও সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে। প্রত্যুত্তরে আজ সন্ধ্যা সাতটা থেকে সরকার সারা বোম্বাইয়ে সামরিক আইন জারি করেছেন। আমার আবেদন কংগ্রেসের আবেদন, সাধারণ ধর্মঘট থেকে দূরে থাকুন। শান্তিপূর্ণ অবস্থা ফিরিয়ে আনুন। বামপন্থীদের সর্বনাশা ফাঁদে পা দেবেন না।'

র‍্যাটট্রে সাহেবের বাংলোতে ব্রিটিশ অফিসাররা অতঃপর মিলিত হয়েছেন। জনগণের উপরে যে-আক্রমণ করা হয়েছে তার পর্যালোচনা করা হচ্ছে। জনগণের পক্ষ থেকে কী ধরনের প্রতিরোধ হচ্ছে তাও আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল। র‍্যাটট্রে আদেশ দিলেন গুলি চালাবার, আর অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনার প্রয়োজন নেই। এখন থেকে আগে সতর্ক করে তারপর গুলি চালাবার প্রয়োজন নেই। যেখানেই একটু

হাঙ্গামা দেখা দেবে সেখানেই গুলি চালাতে হবে। তিনি মনে করিয়ে দিলেন, ওয়াটার ফ্রন্ট বস্তির লোকগুলো রাইফেল গ্রেনেড পিস্তল নিয়ে লড়ছে। তিনি মন্তব্য করলেন, 'আমি জানি পুরো বোম্বাই শহরে আগুন জ্বলছে। কিন্তু ঐ ওয়াটার ফ্রন্ট বস্তিকে ঠাণ্ডা না-করলে 'খাইবার'-এ খাবার সরবরাহ বন্ধ করা যাবে না। আশ্চর্য, আটশ' ব্রিটিশ সৈন্য মেশিনগান দিয়ে একটা বস্তিকে সামলাতে পারছে না!'

এর উত্তরে আর্মস্ট্রং বললেন, 'স্যার, একটা কথা বলি। সরাসরি আক্রমণ করে কোনো লাভ নেই। ওরা গলি-ঘুঁজিতে লুকিয়ে থেকে লড়ে যাচ্ছে। ব্যারিকেড করে আর্মার্ড কারের রাস্তা বন্ধ করে দিচ্ছে।' তারপর ডেনহামকে বললেন, 'এই দেখুন স্যার, একটা সাধারণ বোতলের মধ্যে অ্যাসিড আর লোহার কুচি দিয়ে কী মারাত্মক বোমা তৈরি করেছে।

ডেনহাম বললেন, 'এটা তো মলোটভ ককেটল-এর ভারতীয় সংস্করণ।' র‍্যাটট্রে মলোটভ ককটেল জিনিসটা কি তা জানতে চাইলেন। ডেনহাম বললেন, 'গেল মহাযুদ্ধে রাশিয়ার পার্টিজনরা জার্মান ফৌজের বিরুদ্ধে মলোটভ ককটেল বোমা ব্যবহার করেছিল।' র‍্যাটট্রের মনে সন্দেহ জাগল এই ভেবে যে, এই নৌ বিদ্রোহের পেছনে রুশদের কোনো কারসাজি আছে কিনা। পরে বললেন, 'বোতলটা দেশী, কিন্তু বোমা তৈরি করতে শেখাচ্ছে কে? আপনারা জানেন না, রাশিয়ানরা কি বিরাট চক্রান্ত করছে। চীনে কম্যুনিস্টদের মুক্ত এলাকা শক্তিশালী হয়ে উঠেছে ইয়েনানে। মালয়ে, ভিয়েতনামে, বর্মায়, ইন্দোনেশিয়ায়—সব জায়গায় কম্যুনিস্ট ষড়যন্ত্র। আপনারা কি বলতে চান ভারতকে ওরা ছেড়ে দেবে? এশিয়া রাশিয়ানদের খপ্পরে চলে যাচ্ছে।'

এর পরেই তিনি বোম্বাইয়ের পুলিশ কমিশনারকে ফোনে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কম্যুনিস্ট পার্টির সবকটা অফিস দখল করা হয়েছে কি? ক'টাকে অ্যারেস্ট করেছেন? কি বললেন? বি টি রনদিভে? গা-ঢাকা দিয়েছে? খুঁজুন। বার করুন প্রত্যেককে। ওরাই যে সবচেয়ে অ্যাগ্রেসিভ, এটা তো বুঝতে পারছেন। আর শুনুন, একজন রুশ, নাম থি খাই লভস্কি, টাস সংবাদ প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, সে-ব্যাটা আজ আমার সঙ্গে একটা সাক্ষাৎকারের অনুমতি চেয়েছে। সেই রেড বাস্টার্ডকে গ্রেপ্তার করুন। কি বললেন? ঠিকানা? ঠিকানা আমি জানব কি করে? ওর ঠিকানা আপনার জানবার কথা, আমার নয়!'

তার পরেই তিনি প্রেস বিজ্ঞপ্তি দেবার জন্য তাঁর নিজস্ব সচিবকে ডিকটেসন দিলেন। ডিকটেসন হল—তিনি হাতে-নাতে প্রমাণ পেয়েছেন যে, বোম্বাইয়ে যে-কুৎসিত রক্তপাত ও দাঙ্গা চলছে তার পেছনে রুশ কম্যুনিস্ট গুপ্তচরের হাত আছে। সরকার দেশবাসীকে জানাতে চান—ভারতের স্বাধীনতার প্রশ্ন তাঁরা শীতল মস্তিষ্কে বিবেচনা করতে সর্বদা প্রস্তুত। কিছুতেই এদেশকে তাঁরা সর্ববিধ্বংসী ধর্মদ্বেষী কম্যুনিস্টদের হাতে তুলে দিতে রাজি নন।

এই আলোচনা এবং প্রেস-বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ,বুঝতে পারা যায় আমাদের দেশের ব্যাপারে ব্রিটিশের দৃষ্টিভঙ্গি কি রকম এবং কোন ধরনের ছিল। এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে, একজন ভারতীয় সামরিক অফিসার, ক্যাপটেন এস কে সেন ঐ আলোচনা-সভায় ব্যাটরের বাংলোতে উপস্থিত ছিলেন। তিনি ছিলেন গুপ্ত সংস্থার একজন সদস্য। তাঁর কাছেই এই সব আলোচনার বিষয়বস্তু সংগ্রহ করা হয়েছে।

গভর্নরের চাতুর্য সম্বন্ধে রেটিংদের সন্দেহ ছিল না। তখন তাঁর এমন অবস্থা ছিল না যে, রেটিংদের ওপরে আক্রমণ শুরু করতে পারেন। কাজেই চলছিল নিপুণ কৌশলের খেলা। তিনি চেষ্টা করতে থাকলেন রেটিংদের ঐক্যে ফাটল ধরিয়ে বিভেদ সৃষ্টি করতে। জাতীয় নেতাদের সহানুভূতির ওপরে তিনি ভরসা করেছিলেন। কেননা ১৯ ফেব্রুয়ারি সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল বোম্বাইয়ে চৌপাটির (সমুদ্রতীরে অবস্থিত) এক সাধারণ সভায় রেটিংদের বিষয়ে এমন সব মন্তব্য করেছিলেন যে, রেটিংরা হল একদল উগ্রমস্তিষ্ক যুবক, যারা অত্যন্ত অশোভনভাবে জগাখিচুড়ি পাকাচ্ছে এমন সব ব্যাপারে, যাতে তাদের অর্থাৎ রেটিংদের নাক গলাবার কথা নয় (···bunch of young hotheads messing with things they had no business in···)।

মুসলমান, হিন্দু অথবা শিখ নেতারা তখন কনফারেন্স টেবিলে মত্ত। তাঁদের কাছে রেটিংরা ছিল শূন্যলোক থেকে আসা মূর্খ, যারা তাঁদের কাছে নেতৃত্ব আশা করছে। রাজনীতিতে রেটিংরা এমনই অবোধ শিশুর মত ছিল যে, একটা সাধারণ বাস্তব তথ্য তাদের খেয়ালে আসে নি। পরে অবশ্য সে-সত্য তাদের কাছে খুবই স্পষ্ট হল যে, যেসব লোক শুধু নিয়মতান্ত্রিক অহিংসা, অসহযোগ ইত্যাদির ওপরে আস্থা স্থাপন করে বসে আছেন, তাঁরা এসে দেবেন রেটিংদের তথা সমগ্র বিদ্রোহী বা বিপ্লবীদের নেতৃত্ব,—এরূপ আশা পোষণ করাই ভুল। মহাত্মা গান্ধী তখন ছিলেন তাঁর মধ্য-ভারতের আশ্রমে। এই গোলমালের কথা জেনে তিনি একদিন তাঁর সান্ধ্য প্রার্থনাসভায় কথাপ্রসঙ্গে বললেন, রেটিংরা যদি চাকুরিতে অসন্তুষ্টই ছিলেন, তবে তাঁরা তো কাজে ইস্তফা দিতে পারতেন (···could have resigned···)!

২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৬। ব্রিটিশ পার্লামেন্টে শ্রমিক-দলীয় প্রধানমন্ত্রী এটলি ঘোষণা করলেন, 'রয়েল নেভির জাহাজগুলো পূর্ণগতিতে বোম্বাইয়ের দিকে এগিয়ে চলেছে।' সঙ্গে সঙ্গে দিল্লীর জেনারেল হেড-কোয়ার্টার থেকে ঘোষণা করা হল, 'জল, স্থল, এবং বিমানবাহিনীর শক্তিশালী সৈন্যদল গোলযোগপূর্ণ কেন্দ্রস্থল বোম্বাই, করাচী এবং পুনা অভিমুখে রওনা হয়েছে।'

ঠিক একটু পরেই অল ইণ্ডিয়া রেডিও থেকে গভর্নরের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। তিনি বললেন, 'সরকারের সমস্ত সশস্ত্র শক্তি নিয়োগ করা হবে এ-বিদ্রোহ দমনে—তাতে সমস্ত নৌবহর ধ্বংস করতে হলেও দ্বিধা করা হবে না।' কিন্তু এই সময়েই

গুপ্তপথে খবর পাওয়া গেল করাচী, বোম্বাই, পুনা, জলন্ধর প্রভৃতি জায়গায় স্থল এবং বিমানবাহিনীর সৈন্যদের ওপর আদেশ করা হয়েছে বোম্বাই এবং করাচীতে নৌ-বিদ্রোহীদের দমন করার জন্য রওনা হতে, তারা তা না-করে উলটে ধর্মঘট করে বসল। বিমানবাহিনীর কিছু কিছু বিমান পুনা থেকে লোক দেখানোর মত রওনা হয়েছিল বটে, কিন্তু অদ্ভুতভাবে সব ইঞ্জিনই খারাপ বলে তারা যোধপুরে নেমে পড়ল। ধর্মঘট কমিটির নেতারা আবার জাতীয় নেতাদের আহ্বান জানালেন নৌবহরের কর্তৃত্বভার গ্রহণ করতে। বিদ্রোহী নেতারা বললেন, 'আমরা জাতীয় নেতাদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে রাজি আছি, ব্রিটিশের কাছে নয়।'

এদিকে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হল, কোনো কোনো বামপন্থী রাজনৈতিক দল সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিয়েছেন। কংগ্রেস তার বিরোধিতা করে বিবৃতি প্রকাশ করল। তখনো রেটিংরা বেরিয়ে আসতে পারছিল 'তলোয়ার' ও পোতাশ্রয়ের ডক-ইয়ার্ড থেকে। এবারে নৌ-কর্তৃপক্ষ ক্যাসেল ব্যারাক ও ডক ইয়ার্ড বরাবর ব্রিটিশ সৈন্যদের মার্চ করিয়ে দিল। শহরের ব্যবসায় কেন্দ্রের কাছাকাছি এবং অতি নিকটে অবস্থিত এই ডক ইয়ার্ড এবং ক্যাসেল ব্যারাক। ক্যাসেল ব্যারাকের ঠিক সামনেই টাউন হল ও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার বিরাটকায় সৌধগুলো। সেদিন সকালে প্রায় পাঁচ হাজার রেটিং ক্যাসেল ব্যারাকে ছিল। যারা জাহাজ-ব্যারাকে যায় নি তারা ঐ ক্যাসেল ব্যারাকেই কাটিয়েছিল রাতটা, ধর্মঘট কমিটির আহ্বানে অনশন ধর্মঘট তখনো চালিয়ে যাচ্ছিল। সকাল প্রায় ন'টা নাগাদ ভারতীয় সৈন্য ক্যাসেল ব্যারাকের রেটিংদের ওপরে গোলাবর্ষণ করল। রেটিংরা ছুটে গেল সংগ্রাম-স্থলে। বছরের পর বছর ধরে তারা এই শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছিল।

ভারতীয় সৈন্যরা (অবশ্য কোনো কোনো রেজিমেণ্ট) ব্রিটিশ অফিসারদের আজ্ঞাবাহী দাস মাত্র। ভারতীয় সৈন্য দেখে রেটিংরা গুলি চালিয়ে মোকাবিলা করতে চাইল না। তারা লাউডস্পিকারের সাহায্যে ভারতীয় সৈনিকদের উদ্দেশে জানাল, 'ভাইসকল, আমরা কেবল নিজেদের জন্যই এ-যুদ্ধ করছি না, এ-যুদ্ধ করছি দেশের স্বাধীনতার জন্য। এ-যুদ্ধ তোমাদেরও। ভাইসকল, আমরা তোমাদের ভাই। আমাদের ওপরে গুলি ছোড়া বন্ধ করো।'

বন্ধ হল গুলি ছোড়া। এটা ঠিকই যে, ভারতীয় সৈন্যদের বেশি বোঝাবার প্রয়োজন ছিল না। যথার্থ স্থানেই তাদের মনের আনুগত্য ছিল। কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ। তার পরেই একটি সৈনিক গোপন সংকেত এবং ইশারায় জানিয়ে দিল, তারা ফাঁকা গুলি ছুড়েছিল। ক্যাসেল ব্যারাকের রেটিংরা উল্লাসে ফেটে পড়ল। এর কিছু পরেই ভারতীয় সৈন্যদের মার্চ করিয়ে তাদের নিজ নিজে ব্যারাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল।

বেলা ১১টায় ব্রিটিশ সৈন্য পরবর্তী আক্রমণ শুরু করল। রেটিংরাও দাঁড়িয়ে গেছে যুদ্ধ করার ভঙ্গিতে। এবারে ক্যাসেল ব্যারাক তৈরি হয়ে গেছে দীর্ঘস্থায়ী

অবরোধের সম্মুখীন হতে। অহিংসাবাদের ঘটেছিল যে-পরিণতি, অনশন ধর্মঘটও লাভ করল সেই পরিণতি। রেটিংরা এখন দাঁড়ালো তাদের পরিচিত ভূমিতে। তাদের বোধহয় মনে আর কোনো দ্বিধা ছিল না—তাই যুদ্ধ করার প্রয়োজনে খাদ্য গ্রহণ করা স্থির করল। 'তলোয়ার'-এ কেন্দ্রীয় ধর্মঘট কমিটির নিকট খবর গেল ক্যাসেল ব্যারাক আক্রান্ত হয়েছে। সভাপতি খান বেরিয়ে এলেন নিজে দেখবার জন্যে। তিনি যখন বুঝতে পারলেন যে, আক্রমণের কাজ বেশ ভালভাবেই শুরু হয়েছে, তখন তিনি স্থির করলেন, কমিটির আস্তানাটি 'তলোয়ার' থেকে সরিয়ে আরো সুবিধাজনক স্থানে নিয়ে যেতে হবে। তাই ঠিক হল, ফ্ল্যাগশিপ 'নর্মদা' হবে সেই আস্তানা। ভারতীয় নৌবিভাগের আধুনিকতম স্লুপ 'নর্মদা'। মাত্র ১৯৩১ সালে ব্রিটেনে তৈরি হয়েছিল।

এটাই হল রেটিংদের যুদ্ধ চালানোর মূল ঘাঁটি। পোতাশ্রয়ের সমস্ত জাহাজকেই নির্দেশ দেওয়া হল যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে। (Raise steam aud prepare for acrion stations)। তাদের বলা হল, 'সমগ্র বোম্বাই শহরের চারধারে যুদ্ধসজ্জায় দাঁড়াতে হতে পারে প্রয়োজনবোধে। আমাদের জাহাজ এবং আমাদের পোতাশ্রয়কে রক্ষা করতেও এর প্রয়োজন হতে পারে।' কিন্তু দুর্ভাগ্য, শত্রুপক্ষ সেই বেতার-সংকেতের নির্দেশটি ধরতে পেরেছিল। পরবর্তীকালে কর্তৃস্থানীয় লোক এবং কোনো কোনো রাজনৈতিক নেতা এই খবরকেই রেটিংদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছিলেন। তাঁরা এই বলে রেটিংদের নামে অপবাদ দিলেন যে, রেটিংরা বোম্বাই শহরকে উড়িয়ে দেবার অভিসন্ধি করছিল।

এদিকে শহরে গুজব ছড়িয়ে পড়ল ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ রেটিংদের অনাহারে রেখে মেরে ফেলবার চেষ্টা করছে। তাদের খাবার দিচ্ছে না। এবারে জনসাধারণ ছুটে এল রেটিংদের বিপদ থেকে মুক্ত করতে। সর্বস্তরের লোক এসে জড় হল সমুদ্র তীরে। খাবারের প্যাকেট কারো হাতে, কারো হাতে খাবার জল-ভরা পাত্র। রেস্টুরেন্টের মালিকরা অনুরোধ জানালো জনগণকে, যতখুশি খাবার তুলে নিয়ে অবরুদ্ধ রেটিংদের দিয়ে আসতে। রাস্তার ভিক্ষুকরা পর্যন্ত ক্ষুদে ক্ষুদে প্যাকেট নিয়ে পোতাশ্রয়ের সামনে এসে হাজির হল তাদের সামান্য খাদ্যটুকু তুলে দিতে।

সে এক আশ্চর্যজনক দৃশ্য! সমস্ত এলাকায় ভারতীয় সশস্ত্র সৈন্যরা টহল দিচ্ছিল। ব্রিটিশ সৈন্যরা তৈরি হয়ে ছিল একটু তফাতে। যুদ্ধক্ষেত্রেও দেখা যেত এই দৃশ্য। ভারতীয় সৈন্য আগে, পেছনে থাকত ব্রিটিশ সৈন্য। মৃত্যু-শেল ভারতীয়দের বুকে আগে পড়ুক—এই ছিল ওদের প্ল্যান। বোম্বাইয়ের হাজার হাজার জনগণ খাবারের প্যাকেট সাথে এনে সমুদ্রকূল অবরোধ করে ফেলল। কাঁধে বন্দুক ঝুলিয়ে ভারতীয় সৈন্যরা ঐ সকল খাবারের প্যাকেট জল থেকে পাঠানো ছোট ছোট নৌকায় তুলে দিতে সাহায্য করছিল। ব্রিটিশ সৈন্যরা তা অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে থেকে দেখছিল। এই সময়ে একজন ব্রিটিশ অফিসারকে মন্তব্য করতে

শোনা গেল, 'ও মাই গড, এ তো বিদ্রোহ !'

কয়েক ঘণ্টার মধ্যে 'তলোয়ার'-এর প্রাচীরের ওপর দিয়ে টপকে এত খাবারের প্যাকেট এল যে, দেড় হাজার রেটিংদের কয়েকদিন ধরে খাবার পক্ষে তা যথেষ্ট। কিন্তু ওখানে আর অন্যান্য জাহাজ ব্যারাক মিলিয়ে রেটিংদের সংখ্যা ছিল প্রায় চল্লিশ হাজার। করাচীতেও ছিল প্রায় দশ হাজার। তাই খাদ্যের অভাব ছিল সর্বত্র। যা-কিছু খাবার পাওয়া গেল তা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই সামান্য। তবে, এইভাবে খাদ্য সরবরাহের মধ্য দিয়ে প্রমাণ হচ্ছে যে. এই বিদ্রোহের পেছনে দেশের সাধারণ লোকের কী অকুণ্ঠ সমর্থন বিদ্যমান ছিল।

ওদিকে ডক ইয়ার্ড অথবা ক্যাসেল ব্যারাকে ব্রিটিশ টমিদের প্রবেশের সমস্ত চেষ্টাই প্রতিহত করা হয়। যে-সকল জায়গা থেকে আক্রমণের আশঙ্কা ছিল, জাহাজ থেকে সে সকল স্থানে বিশেষ করে 'ওয়ালিকান কামানের গোলা ছোঁড়া হল। বেলা আড়াইটা পর্যন্ত বিক্ষিপ্তভাবে ছোট আগ্নেয়াস্ত্র থেকে গুলি-গোলা চলছিল ; মাঝে মাঝে গ্রেনেড বোমাও ছোঁড়া হচ্ছিল। এই সময়েই গডফ্রে সাহেব ধর্মঘট কমিটির কাছে এক তারবার্তা পাঠালেন। তাতে বললেন, তিনি বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করতে ইচ্ছুক। এই বার্তা পেয়ে গুলি ছোঁড়ার কাজ বন্ধ করার নির্দেশ দিলেন ধর্মঘট কমিটি। তার পরে সভাপতি এস এম খান বার্তা পাঠালেন গডফ্রে সাহেবের কাছে এই বলে যে, 'আশা করা যায়, আপনার দিক থেকে কোনো আক্রমণ হবে না। আমি আপনার সঙ্গে দেখা করছি।' দেখা গেল গডফ্রে ক্যাসেল ব্যারাকে এলেন না। কি যে হল, ঘটনা কি ঘটল, তা আর বোঝা গেল না। তবে মনে হয়, রেটিংদের আক্রমণে ইংরাজরা দিশেহারা হয়ে এবং কোন কোন জাতীয় নেতার অনুগ্রহ লাভ করে রেটিংদের জোরালো আক্রমণকে কৌশলে প্রতিহত করার উদ্দেশ্যেই ঐভাবে বিদ্রোহী নেতাদের কাছে তারবার্তা পাঠিয়েছিলেন গডফ্রে। গডফ্রে সাহেবের উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হল শেষ পর্যন্ত।

২২ ফেব্রুয়ারি বেলা ১১ টায় F.O.C.R.I.N. (ফ্ল্যাগ অফিসার কম্যাণ্ডিং রয়াল ইণ্ডিয়ান নেভি)-এর বার্তা র‍্যাটক্লে সাহেব বেতারযোগে ঘোষণা করলেন। অবশেষে ব্রিটিশের আকাঙ্ক্ষিত অতিরিক্ত সৈন্যদল এসে গেল, তারা আক্রমণের জন্য প্রস্তুত। তিনি বেতারবার্তায় চরমবাণী পড়ে শোনাতে লাগলেন, 'আমি গতকাল তোমাদের বলেছিলাম, শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে প্রচুর সৈন্য পাওয়া যাবে। মহামান্য সর্বাধিনায়ক (His Excellency the C-in-C) হুকুম দিয়েছেন, সাদার্ন কমাণ্ডের জি ও সি যেন বোম্বাইয়ের সর্বোচ্চ ক্ষমতা গ্রহণ করেন। প্রচুর ক্ষমতা সরকারের অধিকারে আছে—একথা বোঝাবার জন্য তিনি হুকুম দিয়েছেন, রয়াল এয়ার ফোর্সের একঝাঁক বিমানকে পোতাশ্রয়ের ওপর দিয়ে উড়ে বেড়াতে। আমার সতর্কতার বাণী অনুসারে যদি বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ করাই স্থির করে থাকো তা হলে উড়িয়ে দাও সাদা অথবা নীল পতাকা, সবাই এসে জড় হয়ে দাঁড়াও বোম্বাই শহরের দিকে মুখ করে

ডেকের উপরে, এবং পরবর্তী হুকুমের অন্য অপেক্ষা করো।'

যে-সময়ে এই তারবার্তার কথা ঘোষণা করা হচ্ছিল, তখন জনসাধারণ রাস্তায় বেরিয়ে এসে টমিদের সঙ্গে লড়াই করছিল। ভারতীয় সৈন্যদের সম্পূর্ণভাবে সরিয়ে নিয়ে ব্যারাকে আটকে রাখা হল। মেশিনগান এবং ট্যাঙ্কের সাহায্য নিয়ে টমিদের ব্যাটেলিয়ানগুলো রাস্তায় রাস্তায় টহল দিয়ে বেড়াচ্ছিল। জনসাধারণের হাতে কোনো আগ্নেয়াস্ত্র ছিল না। তারা রাস্তা খুঁড়ে যেমন-তেমনভাবে ব্যারিকেড তৈরি করে তার পেছনে থেকে পাথর ছুড়ছিল। শত শত লোককে গুলি করে ট্যাঙ্কগুলো আর বম্বার্ড-গাড়িগুলো রাস্তা পরিষ্কার করতে পেরেছিল। ২২ ফেব্রুয়ারি যা ঘটেছিল তা ভারতের অন্যান্য সাধারণ গণ-অভ্যুত্থানগুলো থেকে ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। জাতি-ধর্ম-সম্প্রদায়-নির্বিশেষে বোম্বাইয়ের খেটে-খাওয়া লোকেরা একসাথে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছিল। যারা কামানের গোলার মুখোমুখি হয়েছিল পাথর নিয়ে, তারা গুলির আঘাতে লুটিয়ে পড়তে লাগল। এই মৃত্যুর প্রকৃত সংখ্যা কখনো প্রকাশ করা হয় নি। কিন্তু এই বিষয়ে সবাই একমত যে, বোম্বাইয়ে এর আগে একদিনে এত লোক প্রাণ হারায় নি। করাচীতেও ঐ একই চিত্র। ২১ ফেব্রুয়ারি ছিল রেটিংদের দিন, আর ২২ ফেব্রুয়ারি ছিল বোম্বাইয়ের শ্রমিকদের দিন। ২২ ফেব্রুয়ারি জনসাধারণের উদ্দেশে পরস্পর-বিরোধী আবেদন প্রকাশ হল বিভিন্ন সংবাদপত্রে।

বামপন্থী দলগুলি সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিল। সর্ববৃহৎ জাতীয় দলের পক্ষ থেকে সর্দার প্যাটেল বললেন, 'কংগ্রেস যথাসম্ভব চেষ্টা করে চলেছে একটা শান্তিপূর্ণ মীমাংসায় আসার জন্য। ঘটনার এই বেদনাদায়ক আবর্তনের জন্যে কে দায়ী—কিসে এই বিধ্বংসকারী পরিণতি ঘটল তা জানা নেই। প্রত্যেক দায়িত্বশীল লোকের প্রথম এবং সমূহ কর্তব্য হল লক্ষ্য রাখা, যেন শহর গোলযোগে নিমজ্জিত না হয় এবং তার শান্তিপূর্ণ আবহাওয়া অব্যাহত থাকে। জনসাধারণের পক্ষে সর্বোত্তম কাজ হবে, নিয়মিত তাদের স্বাভাবিক কাজকর্ম করে যাওয়া।'

কংগ্রেসের শক্ত মানুষ, বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী ও স্পষ্টবক্তা সর্দার প্যাটেল তাঁর ভাষণে কোথাও সন্দেহের অবকাশ রাখলেন না। জেল থেকে সম্প্রতি বেরিয়ে তিনি ও তাঁর বন্ধুরা দেখলেন ব্রিটিশের সাথে সমঝোতা করার সুযোগ আগের চেয়ে অনেক উজ্জ্বল। তাঁর মতে এসব বোকা ছেলেরা ছিল 'চীনা মাটির দোকানের সেই কিংবদন্তীর বলদের মত'। আমাদের দিক থেকে আমরা এক মুহূর্তের জন্যও বিশ্বাস করি নি যে, ব্রিটিশদের সত্যি সত্যি স্বেচ্ছায় ভারত ছেড়ে যাবার ইচ্ছা ছিল।

F.O.C.R.I.N.-এর ভারতীয় নৌবহর ধ্বংস করার বর্বরোচিত হুমকির পাশাপাশি সংবাদপত্রগুলি জনসাধারণের নিকট এন সি এস সি (নেভাল সেন্ট্রাল স্ট্রাইক কমিটি)-র নিবেদনটি প্রকাশ করে যাচ্ছিল। তা হল, 'নৌ-বিভাগের

কর্তৃপক্ষকে বাধ্য করুন গুলি ছোঁড়া বন্ধ করতে, তাঁদের বাধ্য করুন ভয় দেখানো বন্ধ করে আমাদের সঙ্গে কথাবার্তা চালাতে।'

যে-অবস্থায় অ্যাডমিরাল র‍্যাটট্রে রেটিংদের এনে ফেলতে চেয়েছিলেন, সে অবস্থাই রেটিংদের হল। রেটিংদের সমকক্ষ হিসেবে মেনে নিয়ে তাদের সঙ্গে বসার আর প্রয়োজন হল না। ততক্ষণে জাতীয় নেতাদের চিন্তাধারার বিষয়ে র‍্যাটট্রে বেশ একটা অভ্রান্ত ধারণা গঠন করে নিয়েছেন।

আমরা পাগলের মত ছুটোছুটি করতে লাগলাম, 'তলোয়ার' এবং ক্যাসেল ব্যারাকে। সবাইকে বোঝাতে লাগলাম পরিস্থিতি ও সংকটের তাৎপর্য; এবং ঘটনাবলীর চ্যালেঞ্জ বিষয়ে। বাইরের ঘটনাবলী লক্ষ্য করে এবং নৌ-বিদ্রোহীদের আত্মপ্রত্যয় দেখে নৌবাহিনীর ধর্মঘট কমিটি প্রস্তাব নিলেন, 'আমাদের ভাইদের রক্ত ঝরছে রাস্তায়। আমরা আত্মসমর্পণ করতে পারি না, পারি না দেশকে ডুবিয়ে দিতে। যাই-ই ঘটুক না কেন, সর্তহীনভাবে ব্রিটিশের কাছে আত্মসমর্পণ করা হবে না। যা ঘটে ঘটুক।' এর পরে নাবিকরা নির্বাচিত 'আলোচনা সমিতি' (যা তৈরি হয়েছিল নৌ-কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলাপ চালাবার জন্য ফিরে না-আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে রাজি হল।

রেটিংদের অবস্থা তখন শোচনীয়। সাধারণ অসন্তোষকে একত্র করে এক খাতে বইয়ে দিয়ে একটা বিদ্রোহ সৃষ্টি করা হয়েছিল গোপন সংস্থার নির্দেশমত। চেষ্টা করা হয়েছিল ঐ অসন্তোষকে বিজাতীয় শাসনের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক অস্ত্ররূপে ব্যবহার করতে, কিন্তু তাদের পরাজয় হল। তাদের পরাজয় ঘটল, যেহেতু সৈন্য সংগঠন করেও আমরা ব্যর্থ হয়েছিলাম তার কার্য-কারণসঙ্গত অনিবার্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে। আমাদের নেতারা ছিলেন বিচ্ছিন্ন হয়ে। অথচ জনসাধারণ তাদের ভাগ্য সমর্পণ করে দিয়েছিল নৌ-সেনাদের ওপরে। শত বছরেও যে-সুযোগ আসে নি, সে-সুযোগ লাভ করেও আমরা তাকে সদ্ব্যবহার করতে অপারগ হলাম। কেন্দ্রীয় গোপন সংস্থার আচরণ হয়েছিল শিশুদের মত—ঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়ে শেষে বড়দের কাছে সাহায্য চাইতে যাবার মত। সর্বভারতীয় কেন্দ্রীয় গোপন সংস্থার অভাব ছিল যোগ্যতার, নাছোড়বান্দা হয়ে লেগে পড়ে থাকার শক্তির, আর অভাব ছিল বিচার-বুদ্ধির এবং অভিজ্ঞতার।

বিদ্রোহকে একটা নির্দিষ্ট রূপ দিতে হলে নেতৃত্বের যেসব গুণ থাকা দরকার আমাদের নেতাদের তার সব কিছুরই অভাব ছিল। এটা খুবই বাস্তব সত্য। নতুবা ক্যাবিনেট মিশনের আলোছায়ার মায়ায় দেশের জাতীয় নেতারা মশগুল হলেন। অনেকের মনে প্রশ্ন জাগল, স্বাধীনতা তো এসে গেল। এখন কি আর এইসব সশস্ত্র রক্তাক্ত বিপ্লবের প্রয়োজন আছে? তাঁর চেয়ে বরং দিল্লীর মসনদের ক্ষমতা লাভের অংশগ্রহণের প্রতি দৃষ্টি রাখা এবং শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা দখলের প্রচেষ্টা চালানো অনেক বেশি প্রয়োজন। নইলে এইসব বিষয় নিয়ে সবাই চিন্তান্বিত থাকবেন কেন?

ফলে, সশস্ত্র বিদ্রোহের পরিকল্পনা, বিশেষ করে নৌবাহিনীর রেটিংদের, স্থলে ও বিমানবাহিনীর যোদ্ধাদের আন্দোলন হল পরোক্ষে উপেক্ষিত।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলশ্রুতিই হল, সততা ও নিষ্ঠার বিলুপ্তি, ব্যক্তিগত প্রবৃত্তি চরিতার্থতার নিমিত্ত 'জনগণের স্বার্থ রক্ষিত হচ্ছে' বলে ক্যামোফ্লাজ-যুক্ত আত্ম-প্রতারণার দ্বারা নিম্নস্তরের কার্যাবলী গ্রহণ, সে যতই নিম্নস্তরের মানবতা-বিরোধী হোক না কেন; আর মহান দেশপ্রেম হল উপেক্ষিত। এই পরিবেশের মধ্যেই দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে ১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে দেখা দিয়েছিল ভারতের মহান নৌ বিদ্রোহ। অথচ এইভাবে ভারতবর্ষে তখন সম্পূর্ণভাবেই রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটানোর অনুকূল পরিস্থিতি বর্তমান ছিল। এক কথায় বলা যায়, বিপ্লবের সাবজেকটিভ এবং অবজেকটিভ পরিবেশ দুটোই বর্তমান ছিল। যেমন, যুদ্ধ শেষ হয়েছে। বাইরে যেসব জাহাজ ছিল সেই সমস্ত যুদ্ধজাহাজ তখন বোম্বাইয়ের উপকূলে। বোম্বাইতে তখন ৭৪টি যুদ্ধজাহাজ' করাচীতে ৫টি, সুরাটে ৬টি, কেরলে ৭টি, ভিজাগা-পট্টনমে ৫টি, ডায়মণ্ডহারবারে ৫টি, সবাই তখন বিদ্রোহী। সব মিলিয়ে নৌ-সেনার সংখ্যা প্রায় পঞ্চাশ হাজার।

খাদ্যাভাবের ফলে নাবিকরা খাওয়া-দাওয়া ভাল পাচ্ছেন না। লোক উদ্বৃত্ত, তাই ছাঁটাইয়ের কথা শোনা যাচ্ছে। ফলে তারা বিক্ষুব্ধ। স্থলবাহিনী ও বিমান বাহিনী আমাদের সঙ্গে একই রাস্তায় পা বাড়িয়েছে। এমন কী যে নিয়মের দাস গুর্খা বাহিনী, তারাও এখন বিদ্রোহী। বাইরের পরিস্থিতিও চমৎকার। আজাদ হিন্দ বাহিনীর কার্যকলাপের ফলে সেনাবাহিনীর মধ্যে শৃঙ্খলা ভেঙ্গে পড়েছে। আজাদ হিন্দ বাহিনীর লোকেদের ধরে এনে বিচার করা হচ্ছে। এই নিয়ে সারা দেশ উত্তাল। বিরাট যুদ্ধ চালানোর ফলে ইংরেজরা অর্থনৈতিক দিক থেকে বিপর্যস্ত। সেই অবস্থায় সংগঠন শুরু করা হল, আর অপেক্ষা করা হল উপযুক্ত সময় ও সুযোগের।

সব সম্প্রদায়ের লোক আমাদের সঙ্গে যুক্ত ছিল। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে যে-বিরাট একটা অসুবিধা ছিল সাম্প্রদায়িকতা—হিন্দু-মুসলমানে রেষারেষি—সেটা আমরা দূর করতে পেরেছিলাম। এটা ছিল এমন একটা অসাম্প্রদায়িক সংগ্রামী জোট যা অভূতপূর্ব, যা এক বিশ্রী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং খণ্ডিত ভারত-সমস্যার সমাধান করতে পারত। এই বিদ্রোহের প্রচেষ্টা ছিল সাম্প্রদায়িক বিভেদের উর্ধ্বে।

২২ ফেব্রুয়ারি, রাত একটা। এবারে প্রথম সারিতে এগিয়ে এলেন সর্দার বল্লভ-ভাই প্যাটেল, আর দ্বিতীয় সারিতে এসে দাঁড়ালেন জি অধিকারি এবং ইউসুফ। পটবর্ধন তখনো আত্মগোপন করে থাকায় উপস্থিত হতে পারেন নি। কিন্তু ঐ উপস্থিত নেতাদের ওপরে তাঁর অকুণ্ঠ সমর্থন ছিল। সর্দার প্যাটেল বললেন, 'আপনাদের দাবি-দাওয়া মিটিয়ে নেবার ব্যবস্থা কংগ্রেস করবে। আপনাদের ওপরে যাতে কোনো প্রকার শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হয় কংগ্রেস অবশ্যই তা

দেখবে। আপনারা, আমার অনুরোধ, শান্ত থাকুন; আমার ওপরে বিশ্বাস রাখুন। আত্মসমর্পণ করুন।'

বোম্বাইয়ের প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কে এম মুনসি সর্দার প্যাটেলের শক্ত নীতির সমর্থনে এক বিবৃতিতে বলেন, 'আত্মসমর্পণের নির্দেশ দিয়ে সর্দার প্যাটেল বোম্বাইয়ের মত মহান শহর ও ভারতবর্ষকে এক ব্যাপক সর্বনাশ থেকে রক্ষা করেছেন। কংগ্রেসের নির্দেশ ও শৃঙ্খলা ভঙ্গ করার দিন আসে নি। তথাকথিত দাঙ্গার প্রকৃতি সম্বন্ধে আজ সকলেরই সচেতন হওয়া উচিত। রাস্তায় সশস্ত্র সংগ্রাম কেমন করে করতে হয়, তার সুচিন্তিত ট্রেনিং দেওয়ার লক্ষণ দেখা যায়। কংগ্রেসের হাত থেকে গণ-আন্দোলনের নেতৃত্ব কেড়ে নেওয়ার মতলব প্রকাশ পায়। কংগ্রেস কর্তৃপক্ষের আবেদন অগ্রাহ্য করার চেষ্টা আপনাআপনি জনতার মধ্য থেকে আসে নি এবং রেটিংদের নালিশ দূর করার উদ্দেশ্যের চেষ্টা থেকেও সৃষ্টি হয় নি। পুলিশ সমাজবিরোধীদের (?) সঙ্গে সহজে যুঝে উঠতে পারছে না। বোম্বাইয়ের পুলিশের কর্মনিপুণতা সম্বন্ধে আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও আমি বুঝতে পারছি না, বোম্বাইয়ের পুলিশ অ্যাকট অনুযায়ী কেন আপৎকালীন অবস্থা ঘোষণা করা হয় নি!'

অল ইণ্ডিয়া মুসলিম লিগের প্রেসিডেণ্ট এম এ জিন্না ২২ ফেব্রুয়ারি (১৯৪৬) কলকাতায় একটি বিবৃতি দেন, 'খবরের কাগজে প্রকাশ যে, আর আই এন-ধর্মঘট বোম্বাইতে গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। কলকাতা ও করাচীর রেটিংরাও এই ধর্মঘটে যোগ দিয়ে অবস্থার গুরুত্ব বাড়িয়ে তুলেছে। বোম্বাই, করাচী ও কলকাতার সংবাদপত্রগুলি পাঠে বোঝা যায় যে নাবিকদের ন্যায়সংগত নালিশ রয়েছে এবং দীর্ঘকালের পুঞ্জীভূত অসন্তোষ আজ বিক্ষোভে ফেটে পড়েছে। কোনো সভ্য সরকারের পক্ষেই তাদের এই মনোভাবকে অগ্রাহ্য করা চলে না। আর আই এন রেটিংদের ন্যায়সঙ্গত নালিশ দূর করার কাজে আমি অকুণ্ঠচিত্তে সাহায্য করতে প্রস্তুত, যদি নাবিকরা নিয়মতান্ত্রিক, আইনসঙ্গত ও শান্তিপূর্ণ উপায়ের মধ্যে নিজেদের আন্দোলন সীমাবদ্ধ রাখেন এবং আমাকে যদি সমস্ত তথ্য জানানো হয় তা হলে আমি তাদের অসুবিধা দূর করার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করব বলে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। আর আই এন-এর লোকদের কাছে আমি আবেদন জানাচ্ছি ধর্মঘট তুলে নেবার জন্য—বিশেষ করে মুসলমানদের অনুরোধ করছি ধর্মঘট বন্ধ করতে।'

জিন্না আরো জানান যে, ৮ মার্চ তারিখে তিনি দিল্লী ফিরে যাবেন এবং তখন ভাইসরয়ের সঙ্গে নাবিকদের অভিযোগ নিয়ে তদবির করবেন। (ফ্রি প্রেস জার্নাল, ২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৬)।

২২ ফেব্রুয়ারি ফরওয়ার্ড ব্লকের সর্বভারতীয় সভাপতি আর এস রুইকর

নৌ-ধর্মঘটীদের সমর্থনে সংবাদপত্রে এক বিবৃতি দেন, 'রেটিংদের প্রতি জাতি-পক্ষপাতহীন ব্যবহার, ন্যায়সঙ্গত নালিশের সন্তোষজনক মীমাংসা দাবি করি এবং নাবিকদের দাবিসমূহ যে ন্যায্য ও মডারেট, তাও স্বীকার করি।'

৪ মার্চ আর এস রুইকর বোম্বাই যান, যেখানে তাঁকে কংগ্রেস কর্মীরা বিপুলভাবে সংবর্ধনা জানায়। উত্তরে রুইকর বিভিন্ন দেশের বিপ্লবের ইতিহাসের শিক্ষার বর্ণনা করেন। নৌ-বিদ্রোহীদের তিনি সমর্থন করেন। অন্যান্য ও উন্মুক্ত বিদ্রোহ করার জন্য তিনি রেটিংদের উপর দোষ না দিয়ে তাঁদের বাধ্য করেই, প্ররোচনা দিয়েই বিদ্রোহী করে তোলা হয়েছিল বলে তিনি মনে করেন। শহরে নানা ধরনের উৎপাতের জন্য দায়ী গুণ্ডাশ্রেণী লোকদের উপর সব দোষ চাপিয়ে দেবার বিরুদ্ধে বলতে গিয়ে রুইকর বলেন যে, প্রত্যেক বিপ্লবেই নিম্নস্তরের জনগণই প্রধানত অংশ নিয়ে থাকে, আর উচ্চশ্রেণীর প্রবক্তারা আরামকেদারায় বসে বড় বড় নৈতিক বুলি আউড়িয়ে থাকেন। যারা 'হয় করব নয় মরব' বলে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েন তাদের সমালোচনা করা এই সব আরামকেদারার রাজনীতিকদের মুখে সাজে না। প্যাথিক লরেন্স-এর মিশন ভারতীয় জনগণের এই নবজাগরণের পথকে ক্লান্ত ও বিপথগামী করার জন্যই প্রেরিত হয়েছে বলে তাঁর বিশ্বাস।

ব্রিটিশ কম্যুনিস্ট মুখপত্র '.ডেইলি ওয়ার্কার' সম্পাদকীয় প্রবন্ধে আর আই এন ধর্মঘট সম্বন্ধে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত মন্তব্য দেখা যায়, 'ভারতে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলনের চাপ ও বিক্ষোভের তরঙ্গগুলি নৌ-বিদ্রোহের মাধ্যমে তুঙ্গতম পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে।

'ভারতবর্ষ স্বাধীনতা চায়, কিন্তু ব্রিটিশ সরকার সে-সম্বন্ধে এ-যাবত যা কিছু প্রস্তাব উপস্থিত করেছে, তার মধ্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সুচতুর ভেদনীতি তাঁরা লক্ষ্য করেন। ভেদনীতির মধ্য দিয়ে সাম্রাজ্যবাদকে রক্ষা করার চিরাচরিত নীতিই দেখতে পান।

'ক্রমবর্ধমান দুর্ভিক্ষের পরিস্থিতির পটভূমিকা এ-সময়ে মনে রাখা দরকার। এ-হেন পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ ক্যাবিনেট মন্ত্রীগণ ভারতে যাচ্ছেন। এ-বিষয়ে কোনো অস্পষ্ট ধারণা থাকা উচিত নয় যে, ব্রিটিশ সরকারের সম্প্রতি ঘোষিত নীতির যদি পরিবর্তন করা হয়, তাঁদের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ব্যর্থ হতে বাধ্য। ভারতীয় জনমত কখনই এমন ধরনের সংবিধান রচয়িতা সংস্থাতে রাজি হতে পারে না, যা ব্রিটিশ স্বার্থের প্রতিবন্ধকতা দিয়ে ভারাক্রান্ত থাকবে, বিশেষ করে যদি সেই সংস্থা সামন্ততান্ত্রিক রাজন্যবর্গ দ্বারা অতিরিক্ত ভারাক্রান্ত করে তোলা হয়। ভারতীয় জনসাধারণ নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ছাড়া আর কারো হস্তক্ষেপ আজ স্বীকার করতে প্রস্তুত নয়।' (রয়টার, ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬)।

বিদেশী সংবাদপত্রগুলির মন্তব্য থেকেও নৌ বিদ্রোহের রূপরেখা বিচার করা যায়। ব্রিটেনের আটটি জাতীয় সংবাদপত্রের মধ্যে সাতটি নৌ বিদ্রোহের সংবাদ

প্রাধান্য দিয়ে পরিবেশন করেন। আর শ্রমিক দলের মুখপত্র 'ডেইলি হেরাল্ড' খবরটিকে দ্বিতীয় স্থান দেন তাঁদের বোম্বাইয়ের সংবাদদাতার সংবাদ পরিবেশনের মাধ্যমে।

রক্ষণশীল দলের কাগজ 'ডেইলি একসপ্রেস'-এ এক চমকপ্রদ হেডলাইন হল 'Mob out of hand' (জনতা হাতছাড়া), 'পুলিশের গুলিবর্ষণ' ...ইত্যাদি।

'ডেইলি মিরর'-এর হেডলাইন : 'বিদ্রোহীদের আসন্ন সর্বনাশ' (Doom threat to mutineers)।

'ডেইলি হেরাল্ড'-এর হেডলাইন : 'Army peace-men told—Stop Navy Strike !'

'ডেইলি হেরাল্ড'-এর সংবাদদাতা সাদার্ন কম্যাণ্ডের কম্যাণ্ডার-ইন্-চিফ জেনারল লকহার্ট-এর বোম্বাইয়ে উপস্থিতি সম্পর্কে মন্তব্য করেন, 'নৌ বিদ্রোহ দমন করার জন্য নৌ-সেনাধ্যক্ষের পরিবর্তে একজন আর্মি-অফিসারকে ডাকা বিশেষ ইঙ্গিত ও গুরুত্বপূর্ণ।'

তিনটি কাগজই সম্পাদকীয়তে নানা মন্তব্য করেন। তাঁদের মধ্যে 'ডেইলি একসপ্রেস' ও 'ডেইলি মেল' দৃঢ়তার সঙ্গে নৌ বিদ্রোহ দমন করার সুপারিশ করেন। তৃতীয় কাগজটি, কম্যুনিস্ট পার্টির 'ডেইলি ওয়ার্কার' বলে, 'ব্রিটিশরাজের বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলনের তরঙ্গের শীর্ষতম তুঙ্গে উপস্থিত।'

নৌ-সেনারা আত্মসমর্পণ করল জাতীয় নেতাদের কাছে। ১৯৪৬ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি রাত্রি ১১টায় বিদ্রোহীরা আত্মসমর্পন করে তাদের ধর্মঘট সমিতির মাধ্যমে দেশের জনগণের উদ্দেশে এক তারবার্তায় আবেদন রাখলেন, 'আমাদের জনগণের কাছে আমাদের শেষ কথা, আমাদের জাতীয় জীবনে এই ধর্মঘট এক যুগান্তকারী ঘটনা। এই প্রথম জনগণের এবং সৈনিকগণের শোণিত একত্রে মিলিত হয়ে বয়ে চলেছে এক সাধারণ উদ্দেশ্যে। আমরা সৈনিকরা এই ইতিহাস কখনো ভুলব না। আমাদের ভাই ও ভগ্নিগণ, তোমরাও যে ভুলবে না, তাও আমরা জানি। আমাদের মহান জনগণ দীর্ঘজীবী হোক ! জয়হিন্দ !'

এ-সংগ্রাম ছিল স্বাধীনতার সংগ্রাম। এ-সংগ্রাম সত্য ও ন্যায়ের সংগ্রাম। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি নয়, অতীতের কোনো ঘটনাই ভিন্নতর নিয়মে অনুরূপভাবে নিষ্পন্ন হওয়া। এটা স্বাভাবিক। অবস্থা এবং ঐতিহাসিক পরিবেশের বৈশিষ্ট্যে ঘটনা প্রবাহিত হতে থাকে। দেশপ্রেমের প্রেরণা সশস্ত্রভাবে সংহত হয়েছিল একদিন হলদিঘাটের পার্বত্যপ্রদেশে। দেশরক্ষার ও স্বদেশপ্রেমের সশস্ত্র অভ্যুত্থান এবং রণক্ষেত্রে তাঁদের পরিণামের চিত্র ইতিহাসের পাতায় আরো আছে। কিন্তু প্রকৃতিতে হলদিঘাট হয়েও তা হুবহু হলদিঘাটের প্রতিচ্ছবি কিনা বলতে পারি না।

দেখা গিয়েছে যে, সংখ্যাগরিষ্ঠে ও অস্ত্রবলে বলিয়ান না হলেও বিদ্রোহী মুক্তি-যোদ্ধারা বিপুলসংখ্যক ও শক্তিশালী শত্রুপক্ষকে পর্যুদস্ত করেছে। আগেও বলেছি

সংখ্যাগরিষ্ঠতাই সংগ্রামের বড় সহায় নয়, বীরত্ব ও আত্মবিসর্জনের আকুতি অসাধ্য সাধনের ইতিহাস সৃষ্টি করে। দেশপ্রেমের প্রেরণার কথা বাদ দিয়ে যুদ্ধের তথ্য ও জয়-পরাজয়ের সত্যাসত্যের উপর এই বিচার-বিশ্লেষণ করা যায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে উত্তর আফ্রিকার রণাঙ্গনের চিত্র তুলে ধরে আমরা দেখতে পাই, মুসোলিনির বিরাট বাহিনী মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়েও বিপক্ষের সংখ্যালঘিষ্ঠ কয়েকটি ব্রিগেডের আক্রমণে খুব সহজেই বিপর্যস্ত ও পরাভূত হয়েছিল। আকারে-প্রকারে বিশাল হলেও মুসোলিনির বাহিনী যেন কাঠের সেপাই বাহিনীর মত অপদার্থতার নিষ্করুণ চেহারা নিয়ে রণাঙ্গনে ধরাশায়ী হয়েছিল।

দাক্ষিণাত্যের ইতিহাসের দিকে একবার তাকিয়ে দেখি। সেদিন আকাশে মেঘের ঘনঘটা। বর্ষা শুরু। মোগলবাহিনী সেনাপতি শায়েস্তা খাঁর অধীনে বর্ষা শেষের অপেক্ষায় শিবিরে দিন যাপন করছে। বর্ষা শেষ হলেই তারা দেশপ্রেমিক বীর যোদ্ধা শিবাজীর দুর্গের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়বে। কিন্তু শায়েস্তা খাঁর সে-আশা পূর্ণ হয় নি। বর্ষার আকাশের বিদ্যুতের চকিত চমকের মত শিবাজীর সামান্য সংখ্যক সেনার আকস্মিক আক্রমণে শায়েস্তা খাঁ নিজেই শায়েস্তা হলেন। তার শিবির ছত্রভঙ্গ হল। আকারে-প্রকারে সামরিক চণ্ডনীতি হিংসাশ্রয়ী না হয়ে পারে না, কিন্তু মোগলবাহিনীর ভীরু হৃৎপিণ্ডে পরাভবের ভয় প্রবল ছিল। শায়েস্তা খাঁর সশস্ত্র সেনানীরা নির্বল হয়ে ভয়ানক পরিণামে পরিণত হল। নৌ-বিদ্রোহীদেরও আত্মিক বল জেগেছিল, তাই তাদের আত্মিক জয় হয়েছে।

২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৬। ভারতীয় সৈন্যরা এবারে শান্তি ফিরিয়ে আনার অনেক রকম চেষ্টা করতে লাগল ভোর পাঁচটা থেকে। বেতার সংকেত সমস্ত কেন্দ্রে সংবাদ দেওয়া হল যুদ্ধ বন্ধ করতে। ধর্মঘট সমিতির ওপরে সকলের আস্থা ছিল। তাঁরা যখন বলছেন তখন আর দ্বিধা না-করে সকলেই যুদ্ধ থামালো, ভাবল জাতীয় নেতারা দায়িত্ব নিয়েছেন। বিদ্রোহীরা তো পূর্বেই তাঁদের আহ্বান করেছিল দখলীকৃত সমস্ত নৌবহরের দায়িত্ব নিতে। যে-কারণেই হোক প্রথমে তাঁরা আসেন নি। এখন এসে যখন দায়িত্ব নিয়েছেন তখন আর তাদের (বিদ্রোহীদের) আনন্দ ধরে না। সবাই তখন আনন্দ-উৎসবে মেতে উঠেছে। মিষ্টি এনে বিতরণের ব্যবস্থা হচ্ছে। সকলে মিলে কোলাকুলি করছে। অনেককে দেখা গেল, ধর্মঘট সমিতির সভাপতি এম এস খানকে কাঁধে তুলে নিয়ে আনন্দে নৃত্য করছে। চতুর্দিকে আনন্দের হিল্লোল বইছে। আজ যে আনন্দের বাঁধ ভেঙেছে!

কিন্তু হায়, ভারতমাতাকে বোধহয় শেষ পর্যন্ত শৃঙ্খলমুক্ত করা গেল না। বিকেল সাড়ে চারটা নাগাদ দেখা গেল, ছোট ছোট কতগুলো গোরা সৈন্য বোম্বাই যুদ্ধজাহাজ আস্তে আস্তে বিদ্রোহী জাহাজগুলোকে ঘিরে ফেলতে লাগল। ঐ

জাহাজগুলোতেও শান্তির পতাকা উড্ডীন ছিল। ব্রিটিশের রণচাতুর্য ও সাংগঠনিক ক্ষমতাকে উপেক্ষা করা যায় না, বা অবজ্ঞা করারও উপায় নেই। বিদ্রোহীদের এই আকস্মিক আঘাতের প্রত্যাঘাত হানতে তাঁরা বদ্ধপরিকর। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ অত সহজে পরাজয় স্বীকার করে পশ্চাদ্‌পসরণ করবে—তা অসম্ভবই শুধু নয়, অচিন্ত্যনীয়ও। স্বাধীনতাকামী মানুষকে পদদলিত করে প্রভুত্বের অঙ্গীকারে ধ্বংসের রাজনীতিতে বণিকের ছদ্মবেশে তাঁরা দেশে দেশে উপনিবেশ গড়ে তুলেছে। বিপ্লবীবাহিনীর বিজয়-আমেজের অবকাশে এক অসতর্ক মুহূর্তে তাই তারা আক্রমণের ব্যূহ রচনা করে বিদ্রোহী জাহাজগুলোর দিকে কামান ও মেশিন-গানের অগ্নিগর্ভ মুখ খুলেছে। চ্যালেঞ্জের বজ্রনির্ঘোষে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি ছুটে আসছে। প্রথমে ভুল করে সকলে মনে করল দূরে আমাদের সমসাথী যে সকল বিদ্রোহী জাহাজ ছিল তারাই এবারে শান্তির আনন্দে যোগ দেবার জন্যে তীরের দিকে এগিয়ে আসছে। তীরের দিকে সকলেই তাদের সাদর সম্ভাষণ জানাচ্ছিল। হ্যাঁ, তারা বিপ্লবীদের সাদর সম্ভাষণ গ্রহণ করেছে ঠিকই, তবে ঐ সাদর সম্ভাষণ-গ্রহণকারী জাহাজগুলো প্রীতি-সম্ভাষণ জানালো কামানের গোলা আর বড় বড় ম্যাসকেটিয় অজস্র গুলির দ্বারা।

সবাই তো হতবাক, একি! নেতাদের কথার মূল্য কোথায়? তবে কি, নেতারা বেকায়দায় পড়েছেন? আশ্চর্য, এই বিপদের সময়ে কোনো নেতাই এলেন না। হয় তো বিদ্রোহীরা আবার বিষাদে মগ্ন হল। কোনো নেতাই এলেন না!

মরিয়া হয়ে বিদ্রোহীরা আপ্রাণ চেষ্টা করল তাদের পূর্ব মোহকে কাটাতে। আবার তারা গেল কামান-বন্দুকের কাছে। আবার ধরল দূরে-সরানো অস্ত্রগুলো—ভাঙা হাট জোড়া লাগাতে। কিন্তু ইতিমধ্যেই হঠাৎ আক্রমণে বিদ্রোহীদের দেড়শ' জন মারা গেল। মদন সিং 'খাইবার' জাহাজের বেতার-যন্ত্রের কাছে ছুটে গিয়ে সর্বত্র বেতার-সংকেতে আবার যুদ্ধের কথা ঘোষণা করলেন। তিনি বললেন, 'পেছন দিয়ে অতর্কিতে কাপুরুষ ব্রিটিশরা আমাদের আক্রমণ করেছে। ওদের ক্ষমা নেই। শান্তির পতাকা এখন গড়াগড়ি খাচ্ছে। প্রতিটি গোরা সৈন্যকে খতম করার সংকল্প নাও। ডু অর ডাই!

তারপরে তিনি একদিকে দৃঢ়হস্তে 'খাইবার'-এর দূরপাল্লার বড় কামানের চাবি-কাঠি হাতে নিয়ে চার্জ দিয়ে ঘন ঘন কামান দাগাতে থাকেন। আবার মাইক্রোফোনে দেশের জনগণের উদ্দেশে উদাত্তকণ্ঠে আবেদন রাখেন, 'Oh my beloved countrymen! See our national leaders. They are nothing but the traitors of our motherland, see them—see them—see them'

এরই মধ্যে বেতারে খবর পেয়ে 'কাথিয়াড়' জাহাজ (করভেট কাথিয়াড়), যে গভীর সমুদ্রে অবস্থান করছিল, তীরের দিকে এগিয়ে এল। বেতার-সংকেতে তার

কাছে ধরা পড়ল এই আক্রমণের সংবাদ। এক ঘণ্টার মধ্যে ঐ জাহাজের রেটিংরা জাহাজের কর্তৃত্বভার গ্রহণ করল। বন্দরের কাছাকাছি তাহা পৌঁছলে বোম্বাইয়ের ফ্ল্যাগ অফিসার হুকুম দিলেন প্রবেশপথে অবস্থিত লাইটহাউসের পনের মাইল দূরে জাহাজকে নোঙর করতে। রেটিংরা ইংরাজ ক্যাপ্টেনকে হুকুম দিল বন্দরের দিকে এগিয়ে যেতে। ক্যাপ্টেনের অন্য কোনো উপায় ছিল না এগিয়ে যাওয়া ছাড়া। 'কাথিয়াড়' বন্দরের দিকে এগিয়ে এলে নেভির ক্রুজার গ্লাসগো ধেয়ে এল তার দিকে। ছোট্ট জাহাজ তার ক্ষুদে বারো পাউণ্ডের কামান গ্ল্যাসগো-র দিকে উঁচিয়ে তুলে চলে গেল পার হয়ে। ক্রুজার গ্লাসগো আঘাত না করে সম্মান দেখালো ক্ষুদে জাহাজ কাথিয়াড়-এর সাহসকে। সে কাছে এসে বিদ্রোহী ভাইদের সাহায্যের জন্য পেছন থেকে গোরা সৈন্যদের ওপরে কামান দাগিয়ে আঘাত করতে থাকে।

কিন্তু দুর্ভাগ্য, 'কাথিয়াড়'-এর রেটিংরা আক্রমণ বেশিক্ষণ টিকিয়ে রাখতে পারল না। গোলা-বারুদ-রসদের অভাব তো আছেই। তার ওপরে ছিল খাদ্যের অভাব। ওরা এমনিতেই দু'-একদিন ধরে খাবার পাচ্ছিল না। তবুও যেটুকু মিলিত শক্তি ছিল তা দ্বারা বিদ্রোহীরা আবার নতুন করে দেড় হাজার গোরা সৈন্যের ভবলীলা সাঙ্গ করে আরব সাগরের গভীর জলে ডুবিয়ে দিয়েছিল। অবশেষে নিয়তির খেলায় বিদ্রোহীরা ঘৃণিত ব্রিটিশ শক্তির নিকটেই আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হল।

পঞ্চাশ হাজার বিদ্রোহীর আশার প্রদীপ নিভে গেল আরব সাগরের বিষাক্ত হাওয়ায়। যে-বিদ্রোহের দীপশিখা জ্বেলেছিল 'তলোয়ার', তার বীরত্বের ও দেশ-প্রেমের নেতৃত্ব দিয়েছিল 'খাইবার'। এই দুই জাহাজের রেটিংরা ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবে।

এর পরের ঘটনা আরো মর্মান্তিক। ব্রিটিশ তার জিঘাংসা চরিতার্থ করল কোর্ট মার্শাল আইনে। বহুশ্রুত silent service আবার ২৩ ফেব্রুয়ারির সন্ধ্যে থেকেই মৌন হয়ে গেল। এক লোহার পরদা শক্ত করে এঁটে দেওয়া হল আর আই এন-এর ওপরে। কেউ কখনো জানতেও পারে নি কত হাজার বিদ্রোহীকে কারারুদ্ধ করা হল, কত নাবিককে ডুবিয়ে মারা হল, আর কতজনকে গুলি করে হত্যা করা হল। এমনকি রেটিংরাও জানতে পারে নি, একে অন্যের ভাগ্যে কি ঘটেছিল।

গোপন পথে খবর পেলাম, বিদ্রোহের প্রধান নেতাদ্বয়কে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে। এম এস খানকে এক মন ওজনের দু'টো পাথর দু'পায়ে বেঁধে জীবন্ত অবস্থায় আরব সাগরের মধ্যখানে নিয়ে ডুবিয়ে মারা হয়েছে; আর মদন সিংকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। সকলেরই শাস্তি হয়েছিল রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে। তা ছাড়া সাড়ে চার হাজার ভারতীয় সৈন্যকে মুলতান সামরিক জেলে পাঠানো হল তিলে তিলে মৃত্যুবরণ করতে।

এই সকল মর্মান্তিক খবর জেনে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু পর্যন্ত আতঙ্কে

উঠে বলেছিলেন, 'আমি জানতে পেরেছিল, কম্যাণ্ডার-ইন-চিফ-এর বেতারবার্তায় ঘোষণা থাকা সত্ত্বেও ধর্মঘটী নাবিকদের বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে শাস্তিমূলক ব্যবস্থার হুকুম চালু হয়েছে। কেবল আক্ষরিক অর্থেই নয়, তাদের সাজা সত্যি সত্যি এমন ধরনের দেওয়া হচ্ছে, যাকে ভীতিজনক ব্যবস্থা বলা চলে।'

আমাদের জাহাজগুলোর অদৃষ্টও এর চেয়ে ভাল ছিল না। 'তলোয়ার'-এ আর সিগন্যাল স্কুল বলে কিছু রইল না, তার নামটা মুছে গেল। নৌ-বিভাগের খাতা থেকে ক্যাসেল ব্যারাক-এর নামটাও বাদ দেওয়া হল। ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত হওয়ার পরে নৌ-বিভাগের বখরা হিসাবে 'পাকিস্তান পেল 'নর্মদা'। আমাদের অধিকাংশ বন্ধুদের মত আমার কাছেও হারিয়ে গেল 'হিন্দুস্থান' এবং অন্যান্য জাহাজের গতিপথ। এই জাহাজগুলো অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল নৌ-অভ্যুত্থানে।

একথা স্বীকার করতেই হবে যে, বোম্বাই বা বোম্বাইয়ের বাইরে, সমুদ্রতীরে বা সমুদ্রে—সব জায়গা থেকেই রেটিংরা সাড়া দিয়েছিল এন সি এস সি-র ডাকে। ভারতে ব্রিটিশ রাজত্বের অবসানকল্পে তাদের চাকচিক্যহীন সরল এবং স্বার্থহীন প্রচেষ্টা একটা সীমাবদ্ধ সময়ের জন্য জনগণকে বিচলিত করেছিল। সর্বত্রই রেটিংরা তুলে ধরেছিল কংগ্রেস-লিগ-কম্যুনিস্টের একত্রিত পতাকা। ব্যারিকেডের পেছনে ছিল যেসব জনতা, তাদের মধ্যেও বিস্তৃত হল এই জাতীয় একতাবোধের আকাঙ্ক্ষা। ভারতীয় উপমহাদেশে শেষবারের মত তারাও পতাকাগুলো একসঙ্গে বেঁধে নিয়ে চলছিল। রেটিংরা যদি আত্মসমর্পণ না-করত, তাহলে আরো ভয়ঙ্কর রক্তপাত হত। বহু সম্পত্তির আরো ক্ষতি হত।

কিন্তু ভারত বিভাগের প্রাক্কালে এবং স্বাধীনতার ছ' মাস বাদে যে-বিভীষিকা, যে-বিকৃতি এসে গ্রাস করল ভারতকে, তার তুলনায় এই ক্ষতি ও মৃত্যু হত নেহাতই নগণ্য। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমরা যদি আত্মসমর্পণ না করতাম, তাহলে জাতীয় আন্দোলন হয়তো অন্য কোনো পথে বয়ে যেত। ফলে খণ্ডিত ভারত কার্য-পরিকল্পনা এড়ানো যেত। ব্রিটিশ ভারত থেকে সরে যাবার প্রাক্কালে এই উপমহাদেশে যে-বিপর্যয় ঘটালো, তার জন্য যেসব নেতা দায়ী ছিলেন এই বিরাট ঘটনাপ্রবাহের মধ্য থেকে হয়তো তাঁদের চেয়ে ভিন্ন ধরনের নেতার আবির্ভাব হত।

আজ আরো শুনতে পাচ্ছি, বর্তমানে প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের নথিতে নাকি মাত্র চারশ' বিদ্রোহীর নাম আছে। প্রশ্ন করতে পারি কি—পঞ্চাশ হাজার বিদ্রোহীর মধ্যে মাত্র চারশ' জনের নাম থাকে কি করে? স্বাধীন ভারত সরকারের বলা উচিত ছিল, ব্রিটিশ সরকার তাদের নথিতে যে-নামগুলো রেখেছিল এবং সরকারের মনোনীত যেসব নাম রাখা হয়েছে, তাই আছে। একথা বললে কতকটা মেনে নেওয়া যায়। কিন্তু তার পরেও স্বাধীন সরকারের কিছু দায়িত্ব থেকে যায়। তাদের উচিত ছিল তৎকালীন অন্যান্য রেকর্ড ঘেঁটে ও বিভিন্ন পত্রপত্রিকার সাহায্যে বিদ্রোহীদের নাম খুঁজে বের করে দেশের লোককে প্রকৃত

সত্য জানানো।

২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৬। ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ডঃ জি অধিকারী নিম্নলিখিত বিবৃতি দিলেন :

'বোম্বাইয়ের শ্রমিক ও নাগরিকেরা আর আই এন-এর নাবিকদের প্রতি এবং তাঁদের দেশাত্মবোধক দাবিসমূহের প্রতি সহানুভূতি ও আনুগত্য প্রকাশ করেছেন।

'উদ্ধত সাম্রাজ্যবাদ আর আই এন ধর্মঘটীদের বিদ্রোহী বলে অভিযুক্ত করতে দ্বিধা করে নি এবং তাদের নৌবাহিনীসহ ধ্বংস করে দেওয়ার হুমকিও দিয়েছে। গতকাল ধর্মঘটীদের সমর্থক হাজার হাজার নাবিকের ওপর নির্বিচারে গুলিবর্ষণ করতে দ্বিধা করে নি সেই সাম্রাজ্যবাদ।

'ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী আর্মার্ড-কারে রাস্তায় টহল দেয় এবং জনতার ওপর নির্বিচারে গুলিবর্ষণ করে। জনতা যেখানে ঘনসন্নিবদ্ধ হয়, কোনোপ্রকার হুঁশিয়ারী না-দিয়েই গোরা সৈন্যরা সেখানে গুলিবর্ষণ করে। প্যারেলের শ্রমিক-অঞ্চলে মেয়ে ও পুরুষের ওপরে এভাবেই গুলি করা হয়। প্যারেলের মহিলা সংঘের কমরেড কমলা ডোণ্ডে নিহতদের মধ্যে একজন।

'ব্রেনগান, ট্যাঙ্ক ও বম্বারের সাহায্যে ভারতীয়দের ভয় দেখানোর দিন চলে গেছে। আমাদের এই শহরে যদি শক্তি-মদমত্ত সাম্রাজ্যবাদ মনে করে, সপ্তাহব্যাপী 'জালিয়ানওয়ালাবাগ' সৃষ্টি করে নাগরিকদের দমন করা যাবে, তবে তাঁরা ভুল করছেন। এই রক্তস্নান আমাদের মধ্যে ঐক্যের সিমেণ্টকে আরো শক্ত করবে এবং এই সন্ত্রাসের রাজকে দূর করার প্রতিজ্ঞাকে আরো দৃঢ়তর করবে।'

বলা বাহুল্য যে, ভারতীয় রাজকীয় বিমানবাহিনীতেই প্রথমে ধর্মঘট সুরু হয়। আমি জানি তার পূর্বে ব্রিটিশের খাস রয়েল এয়ার ফোর্সেও ধর্মঘট হয়েছিল। একথাও ব্রিটিশ সরকার স্বীকার করে যে, ভারতীয় নৌবহরে ধর্মঘটের প্রেরণা আর এ এফ এবং আই এ এফ থেকে পেয়েছিল। এ-স্বীকৃতি তাৎপর্য ও আন্তর্জাতিক গুরুত্ব কত সুদূরপ্রসারী হতে পারত যদি এই ধর্মঘট শেষ পর্যন্ত আপসহীন বিপ্লবের পথেই অগ্রসর হত। ভারতীয় বিপ্লব আন্তর্জাতিক বিপ্লবের আবদ্ধ ধারাকে হয়ত মুক্ত করে দিতে পারত এবং ব্রিটিশ বাহিনীর কাছ থেকেও কোনো দুরূহ প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হত না। ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর সৈনিকরা তো নৌ-বিদ্রোহীদের প্রতি সহানুভূতিশীলই হয়ে পড়েছিল। এমন কি গুর্খা-বাহিনীতে স্থানে স্থানে ধর্মঘট দেখা দিয়েছিল। তা ছাড়া বোম্বাই, কলকাতা, করাচী, পুনা, জলন্ধর, জব্বলপুর প্রভৃতি শহরগুলোতে বিদ্রোহীদের সমর্থনে লক্ষ লক্ষ লোক রাস্তায় নেমে

পড়েছিল এবং হতাহত হয়েছিল হাজার হাজার লোক।

এই পরিপূর্ণ বিদ্রোহ ও বিপ্লবের মুখে উপস্থিত হয়েই ব্রিটিশ সরকারকে ভারত-ত্যাগের সিদ্ধান্ত নিতে হয়। প্রধানমন্ত্রী এটলি সাহেব তো পার্লামেণ্টে ঘোষণাই করে দেন যে, 'ভারতকে পরাধীন রাখতে হলে ব্রিটিশবাহিনীকে নূতন করে ভারতকে দখল করতে হবে এবং লক্ষ লক্ষ ব্রিটিশ নওজোয়ানদের দরকার হবে। আজকের ব্রিটিশ নওজোয়ান আর সে-ধরনের অভিযানে যোগ দেবে না।'

২৩ ফেব্রুয়ারি তারিখের 'নিউ ইয়র্ক টাইম্‌স' 'Revolt in the East' শিরোনামায় এক দীর্ঘ সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লেখেন। তাতে লেখা হয়, 'মিঃ এটলির স্বাধীনতা ও ন্যায়ের উপর প্রতিশ্রুত সরকার ভারতে বিশৃঙ্খলা দমন করে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে পেরেছেন বলে জয়ী অথবা আত্মসন্তুষ্ট হবার কারণ নেই। বিশৃঙ্খলা ও বিদ্রোহের কারণগুলো দূর করতে হবে। সমস্ত পৃথিবীতেই অশ্বেতকায় জাতিসমূহ গভীর ও বিস্তৃত অসন্তোষের সমুদ্রে বিক্ষোভের তরঙ্গের পর তরঙ্গ সৃষ্টি করে চলেছে। এবং তাদের সংখ্যা সমগ্র মানবজাতির অর্ধেকের কম নয়। আজ আমাদের এ-সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হতে হবে যে, অশ্বেতকায়দের ওপরে শ্বেতকায়দের সাম্রাজ্য শাসনের অবসান হতে চলেছে।

'আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণা' ও 'মানবাধিকারের সনদ' এখনো তার কাজ করে চলেছে। পরাধীন জাতিসমূহ আজ তাদের সাবালকত্ব অর্জন করতে চলেছে —একথা স্পষ্ট। এই সত্যকে প্রাক্তন মানবজাতিদের স্বীকার করে নেওয়া দরকার। ফিলিপাইনে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এই সত্যকে স্বীকার করে সকলের জন্য একটি দৃষ্টান্ত উপস্থিত করেছে '

মস্কোর 'রেড ফ্লিট' নামক কাগজে এই নৌ বিদ্রোহ সম্বন্ধে সোভিয়েট ইউনিয়ন ১৯৪৬ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি সর্বপ্রথম মন্তব্য প্রকাশ করে। এই কাগজে এম মিখিলভ ঘটনাসমূহের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে এক প্রবন্ধে লেখেন, 'নাবিকদের বিদ্রোহ জনসমর্থিত। বর্তমান ভারতে যে-ভয়ঙ্কর অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে, নৌ বিদ্রোহ তার একটি প্রকাশ মাত্র। অর্থ নৈতিক দুরবস্থা এ-বিদ্রোহের অন্যতম কারণ, জনসাধারণ নিদারুণ দারিদ্র্য-পীড়িত। কৃষিতে চরম সংকট দেখা দিয়েছে, শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদন দ্রুতহারে হ্রাস পাচ্ছে। ভারতের সর্বত্র যে-অনির্বাণ বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে তাতে জনগণের স্বাধীনতা স্পৃহা কতটা তীব্র হয়েছে তাই বোঝা যায়।'

২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৬, মহাত্মা গান্ধী পুনা থেকে এক বিবৃতিতে বলেন :

'অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে ভারতবর্ষের ঘটনাবলী আমি লক্ষ্য করে যাচ্ছি। নৌবাহিনীতে বর্তমানে এই যে বিদ্রোহ চলছে এবং তাকে অনুসরণ করে অন্যত্র যেসব ঘটনা ঘটছে, তাকে কোনোমতেই অহিংসা বলা যায় না। যখনই কাউকে জোর করে 'জয়হিন্দ' বলানো হয়, অথবা অন্য যে কোনো জনপ্রিয় শ্লোগান বলতে বাধ্য করা হয়, লক্ষ-কোটি জনসাধারণের স্বরাজ বলতে যা বোঝায় তার কবর সৃষ্টি করার পক্ষে

সেগুলি সবই মর্মান্তিক আঘাত হয়ে ওঠে। গির্জা ধ্বংস করা অথবা ঐ জাতীয় কোনো কাজই কংগ্রেস সমর্থিত স্বরাজের পথ নয়। ট্রাম-কার জ্বালানো, সম্পত্তি ধ্বংস করা, ইউরোপীয়দের অপমান অথবা আহত করা, আমার সমর্থিত অহিংসা তো দূরের কথা, কংগ্রেস-সমর্থিত অহিংসাও সেটা নয়। এই সংগ্রামের সকল পরিচিত ও অপরিচিত নেতাদের কাছে এই বিবেচনাহীন হিংসার উন্মাদনার পরিণাম সম্বন্ধে আমি ভাবতে অনুরোধ করি এবং এই পথ থেকে বিরত হতে বলি। পৃথিবীর লোকেরা যেন এ-কথা না বোঝেন যে, কংগ্রেসের ভারতবর্ষ মুখে অহিংসার ও স্বরাজ-সাধনার কথা বলে, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে, বিশেষ করে চরম পরীক্ষার সময়ে তার অন্য পথ নেয়। আমি ইচ্ছা করে বিবেচনাহীন কথাটা ব্যবহার করেছি। কেননা বিচার ও বিবেচনাসম্মত সহিংস পথও একটা আছে।

'আমি আজ যে-সহিংস কার্যকলাপ দেখছি তা সত্যিই বিচারবিবেচনাহীন। যদি নৌবাহিনীর সৈনিকরা অহিংসার তাৎপর্য বোঝেন তো অহিংস প্রতিরোধের পথ গৌরবময় পুরুষোচিত ও সমবেতভাবে প্রয়োগ করলে সম্পূর্ণ ফলপ্রসূ হতে পারে। প্রত্যেকের পক্ষেই এ-পথ সবসময়েই প্রযোজ্য। যদি কারো মনে হয় যে, চাকরির অবস্থা ও ব্যবস্থা কারো পক্ষে অথবা ভারতবর্ষের পক্ষে অপমানজনক, তবে তিনি সে-কাজে ইস্তফা দেবেন না কেন? এ-জাতীয়কর্ম পন্থাকে আমি নামা দিয়েছি অহিংস-অসহযোগিতা। কিন্তু নাবিকরা তাঁদের বর্তমান বিদ্রোহাত্মক কাজের দ্বারা ভারতের পক্ষে একটি খারাপ ও অযোগ্য দৃষ্টান্ত বা ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছেন।

'হিন্দু, মুসলমান ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে হিংসামূলক কার্যকলাপের জন্য এই যে মিলন তা অশুভ এবং হয়ত ঐ পথের ভবিষ্যত নিজেদের মধ্যে হিংসাত্মক কার্যকলাপের জন্য প্রস্তুতি বলে পরিণতি লাভ করতে পারে,—দেশ এবং পৃথিবীর পক্ষে যা হবে খুবই ক্ষতিকারক।

'ইংরেজ শাসকরা ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে চলে যাবেন বলে ঘোষণা করেছেন, জনসাধারণের হৃদয়ে লুক্কায়িত তিক্ত অসন্তোষের বিক্ষুব্ধ প্রকাশ যেন সেই ছেড়ে যাওয়ার মুহূর্তটিকে কোনোকারণে বিলম্বিত না করে। এ-বিক্ষোভের শক্তি সীমাহীন সন্দেহ নেই, কিন্তু এর ব্যবহার প্রয়োজনের অতিরিক্ত হতে দেওয়া ঠিক নয়। এমন কি তা দুষ্টবুদ্ধি জাত হয়েও যেতে পারে, যদি দেশকে অথবা তার একটি বৃহৎ অংশকে আবার দাবিয়ে দেওয়ার পক্ষে একটা অছিলা হিসাবে ব্যবহার করা হয়। কারণ এই দেশ বা জনসাধারণ আজ বহুদিন পরপদানত।'

২৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৬। মহাত্মা গান্ধী পুনার 'নেচার কিওর' হাসপাতাল থেকে যে-বিবৃতি দেন তা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। তাতে দু'টি বিষয় গুরুত্ব লাভ করে। প্রথমত, নৌ বিদ্রোহ সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধীর ধারণা প্রকাশ পেয়েছে, এবং দ্বিতীয়ত, ১৯৪২ সালের আগস্ট-বিপ্লবের সময় কংগ্রেসের মধ্যেই যে-নবীন নেতৃত্বের সূত্রপাত হয়—অরুণা আসফ আলি, জয়প্রকাশ নারায়ণ, ডঃ রামমনোহর লোহিয়া, অচ্যুত

পটবর্ধন, অশোক মেহতা—এঁরা যার প্রবক্তা-রূপে প্রতিভাত হয়ে আসছিলেন, তাঁদের সঙ্গে কংগ্রেস হাই-কমাণ্ড ও গান্ধী-নেতৃত্বের পার্থক্য কোথায় সে-সম্বন্ধেও গান্ধীজীর বিচারের কিছু ইঙ্গিত এই বিবৃতিতে আছে। বলা বাহুল্য, এঁদের মধ্যে সেই সময় বিদ্রোহী হিসাবে সবচেয়ে বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন অরুণা আসফ আলি। তিনি আবার পরোক্ষে কেন্দ্রীয় গোপন সংস্থার সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন ভারতে সমগ্র সেনাবাহিনীতে বিদ্রোহ ঘটাবার জন্য। তাই নৌ-বিদ্রোহীরা অনেক কিছু আশা করেছিলেন অরুণা আসফ আলির নেতৃত্বের কাছে। মহাত্মা গান্ধী তাঁর বিবৃতির মধ্যে অরুণা আসফ আলিকে জবাব দিতে গিয়ে তৎকালীন বিদ্রোহী বিকল্প-নেতৃত্ব সম্বন্ধেই পরোক্ষভাবে তাঁর মন্তব্য প্রকাশ করেন। সম্পূর্ণ বিবৃতিটি এই রূপ:

'সম্প্রতি বোম্বাইয়ের ঘটনার উপরে আমার বিবৃতির বিরোধিতা করে অরুণা আসফ আলি যে-বিবৃতি দিয়েছেন তার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ। নিজের ঔরসজাত না হলেও, আমি তাঁকে আমার কন্যা বলে মনে করি, যদিও সে-কন্যা বিদ্রোহী। সাধারণ অবস্থায় তাঁর প্রতিবাদে আমি কোনো প্রতিবাদই করতাম না। কিন্তু তিনি নিজেকে ছাড়াও, যেহেতু আত্মগোপনকারী সংগ্রামীদের প্রতিনিধিস্থানীয়া, সেই হেতু আমাকে প্রকাশ্যে এই বিবৃতি দিতে হল।

'তাঁর আত্মগোপনকারী অবস্থায় কয়েকবারই তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল, আমি তাঁর সাহসিকতা, বুদ্ধিমত্তা ও জলন্ত দেশপ্রেমের প্রশংসা করি, কিন্তু প্রশংসা সেই পর্যন্তই। তাঁর আত্মগোপনকারী জীবন আমি পছন্দ করি না। আত্মগোপনকারী কার্যকলাপও আমি পছন্দ করি না।

'আমি জানি লক্ষ লক্ষ লোক আত্মগোপন করে থাকতে পারে না। লক্ষ কোটি লোকের আত্মগোপনের প্রয়োজনও হয় না। কিছু কিছু লোক আত্মগোপন করে গোপন নির্দেশের সাহায্যে লক্ষ লক্ষ লোককে তাদের স্বরাজ আনয়ন করে দিতে পারেন, এমন ধরনের আনন্দ পেতে পারেন। কিন্তু এ কি ঝিনুক দিয়ে খাওয়াবার মত নয়? খোলা চ্যালেঞ্জ, প্রকাশ্য কার্যকলাপই সকলে অনুসরণ করতে পারে। সত্যিকার স্বরাজ সকলেরই অনুভব করতে হবে—পুরুষ, নারী ও শিশু—সকলকে। সে-জাতীয় স্বার্থকতার জন্য পরিশ্রম করাই হল সত্যিকার বিপ্লব।

'পৃথিবীর সকল নির্যাতিত জাতিদের সামনে ভারতবর্ষ একটি দৃষ্টান্তস্বরূপ উপস্থিত। কেননা, এই ভারতবর্ষেই দেখা দিয়েছে এক উন্মুক্ত অস্ত্রহীন অহিংস ব্যাপক প্রচেষ্টা, যা সকলের কাছেই আত্মদান দাবি করে, অথচ যারা ক্ষমতাশীল তাদের অনিষ্টকর এমন কিছু দাবি করে না। ভারতের লক্ষ-কোটি লোকের আজ এমন ধরনের জাগরণ হত না, যদি না, এই ধরনের উন্মুক্ত অস্ত্রহীন সংগ্রাম প্রচলন করা যেত। এই পথে যেখানেই এবং যখনই বিচ্যুতি ঘটেছে তখনই এই ক্রম-বিকাশী বিপ্লবের (evoultionary revolution) গতি সাময়িক রুদ্ধ হয়েছে।

'১৯৪২ সালের ঘটনাবলীর পাঠ এ-বীরাঙ্গনা মহিলা যেভাবে নেন আমি সেভাবে নিই নি। স্বতঃস্ফূর্তভাবে জনসাধারণ সে-আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিল এ-সংবাদ শুভ সন্দেহ নেই। কিন্তু কেউ কেউ অথবা অনেকেই হিংসার পথ নিয়েছিল, এটা ভাল সংবাদ নয়। কিশোরীলাল মসরুওয়ালা, কাকাসাহেব এবং আরো কেউ কেউ সাময়িক অধৈর্য উৎসাহে অহিংসার ভুল ব্যাখ্যা করেছিলেন, তাতেও কোনো ভিন্ন যুক্তি সৃষ্টি করে না। তাঁরা যে এ-ধরনের ভুল ব্যাখ্যায় অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন তাতেও এ-কথাই প্রমাণ হয় যে, অহিংসা একটি অত্যন্ত লাজুক বা পেলব নরম হাতিয়ার। কারো উপরে কোনো অপ্রীতিকর মন্তব্য করার উদ্দেশ্যে আমি এই উপমাটি দিই নি—যে যা ভাল বুঝেছেন সেই অনুযায়ী কাজ করেছেন। সংঘবদ্ধ হিংসার তাণ্ডবমূর্তির সামনে মাথা নত করে চলা কাপুরুষতারই নামান্তর। আবার, ১৯৪২ সালের কার্যকলাপ সম্বন্ধে আমার বিচার ও বিশ্লেষণ প্রকাশে দ্বিধা করাও দুর্বলতা ও অন্যায়।

'অরুণা হিন্দু ও মুসলমানকে নিয়মতান্ত্রিক মোর্চায় মিলিত করার চেয়ে লড়াইয়ের ব্যারিকেডে মিলিত করার পক্ষপাতি। সহিংস সংগ্রামের শাস্ত্রেও এ-ধরনের চিন্ত ভুল। ব্যারিকেডে হিন্দু-মুসলমানের এই মিলন সত্যনিষ্ঠ হলেও নিয়মতান্ত্রিক (constitutional) মোর্চায়ও এ-মিলনের প্রয়োজন আছে। সংগ্রামী সৈনিকরা সব সময়ই ব্যারিকেডে বাস করে না। তারা নিশ্চয়ই আত্মহত্যাও করে না। ব্যারিকেড-জীবনের পরে নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক মোর্চায়ও উপস্থিত হতে হয়; এই মোর্চাটিও তাদের পক্ষে নিষিদ্ধ বস্তু নয়।

'ব্রিটিশের বর্তমান ঘোষণাগুলিকে অবিশ্বাস করা এবং আগে থেকেই ঝগড়া সৃষ্টি করা মোটেই দূরদৃষ্টির পরিচায়ক নয়। তাঁদের তরফ থেকে যে-সরকারি ডেপুটেশন আসছে, তা কি ভারতের মত একটি বৃহৎ দেশকে প্রতারিত করার জন্য—এইরূপ চিন্তা বীরোচিত ও বীরাঙ্গনাচিত নয়।

'একটু অপেক্ষা করলে কী ক্ষতি হত! যে-সরকারি প্রতিনিধিদল আ ছেন তাতে ব্রিটিশ ঘোষণার উপর বিশ্বাসযোগ্য কিছু তাঁরা দিতে পারছেন না—সেটা শেষবারের মত প্রমাণিতই হোক না। আমাদের দেশ ওদের বিশ্বাস করে লাভবান হবে। প্রতারিতের নিভু'ল অভিব্যক্তিতে শেষ পর্যন্ত প্রতারকই ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

'ঘটনার মুখোমুখি হই না কেন? যে-মিশনটি আসছেন তাঁরা নিজেদের ভারতের বন্ধু বলেই ঘোষণা করেছেন, ভারতের স্বাধীনতার ব্যাপারটি তাঁরা নিয়মতান্ত্রিক পথেই বের করতে পারবেন বলে বিশ্বাস করেন। সমস্যাটি সত্যিই জটিল, হয়তো যে কোনো রাষ্ট্রনীতিবিদদের পক্ষে জটিলতম। এমনো হতে পারে, মিশন হয়তো এসে এই জটিল সমস্যাটিকে একটি সমাধানহীন ধাঁধাতে দাঁড় করিয়ে দেবেন। তাতে তাঁদের পক্ষে ক্ষতিই হবে। যদি তাঁদের উদ্দেশ্য সৎ হয়ে থাকে এবং তাঁদেরই তৈরি সমস্যাজাল থেকে তাঁরা নিজেরা মুক্ত হতে চান, তবে সে-পথ মিলবে বলে আমি

নিঃসন্দেহ। কিন্তু আমাদের দেশকেও তো এই খেলাতে ভাগ্য অংশ নিতে হবে। যদি তা করে তবে তাঁকেও কোনো কালের জন্ম হলেও ব্যারিকেড ফেলে আসতে হবে। আমি অরুণা ও তাঁর বন্ধুদের কাছে আবেদন করি, তাঁরা তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ কাজ ও আত্মদানের ভিতর দিয়ে যে-শক্তি সঞ্চয় করেছেন তা যেন বিচক্ষণোচিতভাবে ব্যবহার করেন।

'সর্দার প্যাটেলের উপদেশ মত রেটিংরা যে আত্মসমর্পন করেছেন এ একটি বড় স্বস্তির খবর। এর দ্বারা তাঁরা তাঁদের আত্মসম্মান বিসর্জন দেন নি। যতদূর আমি দেখতে পাই বিদ্রোহের পথে অগ্রসর হওয়ার উপদেশটি কখনই সদুপদেশ হয় নি। যদি কল্পিত অথবা সত্য নালিশের প্রতিবাদে সে-বিদ্রোহ ঘটে থাকে, তার পূর্বে তাঁদেরই পছন্দমত রাজনৈতিক নেতাদের পরামর্শ ও হস্তক্ষেপ নেওয়া উচিত ছিল।

'যদি তাঁরা ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্যে বিদ্রোহ করে থাকেন তবে তাঁদের ভুলটাও আরো বেশি বা দ্বিগুণ। একটি সুগঠিত বৈপ্লবিক দলের নেতৃত্ব ও ডাক ছাড়া তাঁদের তা করা উচিত হয় নি। যদি তাঁরা মনে করে থাকেন যে, একমাত্র তাঁদের শক্তির জোরেই তাঁরা ভারতবর্ষকে বৈদেশিক পরাধীনতা থেকে মুক্ত করে দিতে পারবেন তবে তাঁদের চিন্তাহীনতা ও অজ্ঞতাই প্রকাশ পায়।

'অরুণা ঠিকই বলেছেন যে, এই সংগ্রামী নাবিকরা যে-সাহস ও দৃঢ়তা দেখিয়েছেন তা অভূতপূর্ব। কিন্তু এ-সাহস নির্বোধ দুঃসাহসে পরিণত হয়, যদি তা সময়োচিত না হয় এবং এর পরিণামে আত্মঘাতী হতে হয়।

'অরুণা দাবি করতে পারেন যে, জনসাধারণ হিংসা ও অহিংসার তাত্ত্বিক যুক্তিযুক্ততায় আগ্রহী নয়। কিন্তু আমি বলি, মুক্তির পথ হিংসা অথবা অহিংসা পথে আসে কিনা সে-প্রশ্ন জনসাধারণের জানা আছে। জনসাধারণ অবশ্য এ-যাবত অহিংসার পথেই অগ্রসর হয়েছে, যদিও অসম্পূর্ণভাবে আংশিক বিচ্যুতির মধ্য দিয়ে। অরুণা ও তাঁর সহকর্মীরা নিজেদের বারে বারে প্রশ্ন করে দেখতে পারেন, যুগ যুগান্তরের নিদ্রা থেকে ভারতবর্ষকে জাগরণের পথে আনতে, অস্পষ্ট হলেও স্বরাজের জন্য একটি ব্যাপকতম আকাঙ্ক্ষা সকলের মনে ধীরে ধীরে সৃষ্টি করতে, অহিংসার পথ তাঁদের কতটা কী করেছে। আমার জানা আছে সেখানে প্রশ্নের সঠিক উত্তর মিলবে।'

পূর্বেই বলেছি, নৌ বিদ্রোহের দায়িত্ব এড়িয়ে অরুণা আসফ আলি পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর নিকট তার পাঠান—'নৌ-ধর্মঘট চরম উত্তেজনার সৃষ্টি করেছে, অবস্থা ভয়ানক খারাপ, চূড়ান্ত হেস্তনেস্তর দিকে অগ্রসরমান, একমাত্র আপনিই অবস্থা আয়ত্বে আনতে পারেন এবং আসন্ন ট্র্যাজেডি থেকে রক্ষা করতে পারেন। এই মুহূর্তে আপনাকে বোম্বাইয়ে উপস্থিত হবার জন্য একান্তভাবে অনুরোধ করি।'

অথচ ১৯৪২ সালের 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে তাঁর জঙ্গী ভূমিকার জন্য তিনি সকলের প্রিয়পাত্রী হয়েছিলেন। কারো কাছে তিনি ছিলেন সেই ঐতিহাসিক কাহিনীর ঝাঁসীর রানী লক্ষ্মীবাঈয়ের মত। রেটিংদের দায়িত্ব নিতে না পেরে তিনি তাদের বললেন, 'শান্ত থাকো।' আর পণ্ডিতজীকে বললেন, 'আসন্ন ট্র্যাজেডি থেকে রক্ষা করুন।' সত্যিই করুণ ট্র্যাজেডিই বটে!

২৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৬। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বোম্বাইয়ের চৌপট্টিতে প্রায় দু'লক্ষ লোকের সমাবেশে ভাষণ দেন। সেখানে সাংবাদিকদের প্রশ্ন ছিল—বোম্বাই শহরে আর আই এন-এর রেটিংদের প্রতি সহানুভূতির জন্য হরতাল করা উচিত কিনা! এই প্রশ্ন শুনে পণ্ডিত নেহরু হঠাৎ রেগে উঠে বললেন, 'আর আই এন কেন্দ্রীয় ধর্মঘট সমিতির এ-ধরনের ধর্মঘট করার পক্ষে আবেদন করার কোনো অধিকার নেই। আমি এ-ধরনের কার্যকলাপ সহ্য করব না। এই পনেরটি লোক, তাদের আমি যতই পছন্দ করি না কেন তারা বোম্বাই অথবা ভারতবর্ষ এবং পৃথিবী সম্পর্কে কী জানে? বোম্বাইয়ের সকলের মাথার ওপর দিয়ে সকল রাজনৈতিক দলকে অগ্রাহ্য করে কোন অধিকারে তারা এই হরতালের আবেদন জানালো? তাদের উচিত ছিল, এই ত্রিশ লক্ষ নাগরিকদের আগে রাজনৈতিক দলগুলিকে ডাকা এবং নিজেদের বক্তব্য উপস্থিত করা। একমাত্র কংগ্রেস অথবা লিগ এই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার অধিকারী।'

পণ্ডিতজী বোধহয় জানতেন না যে, কংগ্রেসের বামপন্থী অংশসহ ভারতবর্ষের সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলির মিলিত গোপন সংস্থা দ্বারা সংগঠিত হয়েছিল নৌ বিদ্রোহ এবং সমগ্র ভারতের বিদ্রোহতরঙ্গ। এমন কি ভুলাভাই দেশাইও ঐ কেন্দ্রীয় গোপন সংস্থার একজন সদস্য ছিলেন। যদিও তিনি ভিতরে থেকে অনেক ক্ষেত্রেই বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করেছেন। তাঁর বিবৃতির মধ্যেই তা ধরা পড়বে। এ-সমস্ত ঘটনা কি পণ্ডিতজী জানতেন না? অবশ্য পণ্ডিত নেহরু চিরদিনই নরম-গরম সুবক্তা হিসাবে পরিচিত। হাস্যকরও বটে, ঐ একই দিনে তিনি আবার বলেছিলেন, 'ভারতবর্ষ আজ চল্লিশ কোটি মানুষের আগ্নেয়গিরি, যারা এই পৃথিবীতে আর অবহেলিত হয়ে না-থাকতে বদ্ধপরিকর।'

২৬ তারিখ পণ্ডিত নেহরু বোম্বাই আসেন। চৌপট্টির জনসমাবেশে তিনি একই সাথে ব্রিটিশ সরকার ও তাঁর নির্মম শাসনের বিরুদ্ধে অগ্নিবর্ষণ করেন এবং অপরদিকে ধর্মঘটী নাবিকদেরও নানাপ্রকার ধমক দিতে থাকেন। তখন সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল বোম্বাইতেই ছিলেন। তিনি প্রথম থেকেই সব ব্যাপার জানতেন। কেন না, বিদ্রোহী নাবিকরা এবং গোপন সংস্থার সদস্যরা বিভিন্ন সূত্রে তাঁর সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে চলছিলেন। সর্দার প্যাটেল অবশ্য বরাবরই এই ধর্মঘটের বিরুদ্ধে ছিলেন। ধর্মঘটীদের বরাবরই ব্রিটিশের কাছে বিনাসর্তে আত্মসমর্পণ করতে বলেছিলেন। বিদ্রোহী নাবিকদের পক্ষে বোম্বাই শহরের শ্রমিক ও জনসাধারণের হরতাল, বিক্ষোভ ইত্যাদি

ব্যাপারে তিনি সংকোচ না রেখে নিন্দা করেছেন, তার মানে তাঁর মধ্যে কোনো 'কিন্তু' বা 'দ্বিধা' ছিল না। পণ্ডিতজী কিন্তু একই সঙ্গে শীতল ও উত্তপ্ত বাণীর ঝর্ণা বইয়ে দিতে সুদক্ষ ছিলেন। তিনি ১৯৪২ সালের আন্দোলনকে অস্বীকার করেন নি, নিন্দাবাদও করেন নি। অথচ স্বয়ং গান্ধীজী সেই আন্দোলনের দায়িত্ব অস্বীকার করেন। এই সমস্ত কারণেই সেদিনকার ভারতে পণ্ডিত নেহরু সবচেয়ে বড় বীর বলে সম্মানিত ছিলেন। তা ছাড়া আজাদ হিন্দ ফৌজের বন্দি সেনাপতিদের আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য পণ্ডিতজীর ব্যারিস্টারের পোশাক পরে কোর্টে উপস্থিতি প্রভৃতি কার্যকলাপের দ্বারা অতীতে সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে তাঁর যে-বিরোধিতা ছিল সেই তিক্ত ইতিহাসটুকু পণ্ডিত নেহরুর অনুকূলে ও মহিমায় মুছে যায়। নিশ্চয়ই, ইতিহাসের সেই চরম বৈপ্লবিক মুহূর্তে পণ্ডিত নেহরুর কী ভূমিকা ছিল, সেই ঘটনার পুনর্বিচার ঐতিহাসিকরা একদিন করবেনই। ঐদিন চৌপট্টির সমুদ্র সৈকতে তিনি যে-ভাষণ দেন তার কিছু কিছু অংশ পাঠক-পাঠিকাদের জ্ঞাতার্থে এখানে তুলে দিচ্ছি।

উক্ত সভায় বল্লভভাই প্যাটেলও উপস্থিত ছিলেন এবং ভাষণও দিয়েছিলেন। অবশ্য সেই ভাষণ ছিল তাঁর নিজস্ব স্বভাবসিদ্ধ রক্ষণশীল সুরে। সর্দার প্যাটেল সে-সময়ে খুব জনপ্রিয় নেতা ছিলেন না। তাই বোম্বাইয়ের সেই উত্তেজিত মুহূর্তে নিজে থেকে তিনি কোনো সভা ডাকেন নি। বোম্বাইয়ের বীর বিপ্লবী জনতাকে শান্ত করবার মত তাঁর কোনো ক্ষমতা ছিল না। পণ্ডিত নেহরুরও বোধহয় সেই ক্ষমতা ছিল না। কেননা, তিনি যখন বোম্বাইতে আসেন নৌ বিদ্রোহের তখন অবসান হয়ে গেছে। বিদ্রোহীরা আত্মসমর্পণ করেছেন। জনসাধারণ বিক্ষুব্ধ অথচ স্তব্ধ, কেন না, সৈনিকরা এবং মহান জনসাধারণ এই ধরনের আত্মসমর্পণ আশা করে নি। তাই পণ্ডিতজীর সেদিনকার ভাষণ, একজন ব্যারিস্টার রাজনৈতিক নেতার অগ্নিবর্ষী ভাষণের বেশি কিছু নয়।

তিনি ভাষণ দিতে গিয়ে বললেন, 'ভারতের স্বাধীনতার জন্য আমাদের সশস্ত্র-বাহিনীর বিদ্রোহ করার অধিকার আছে। কমাণ্ডার-ইন-চিফ তাঁর বেতার-ভাষণে ঘোষণা করেছেন যে, সশস্ত্রবাহিনীতে তিনি রাজনীতির অনুপ্রবেশ ঘটতে দেবেন না এবং নিয়মানুবর্তিতা সেখানকার প্রথম ও শেষ কথা। আমি তাঁর সঙ্গে এ-বিষয়ে একমত। কিন্তু আমাদের সৈন্যবাহিনীকে একটি স্বাধীন দেশের সৈন্যবাহিনী হতে হবে।

'আমাদের সৈনিকরা রাজনীতি ও তাঁদের কর্তব্যবোধের মধ্যে একটা বিরোধ টেনে বিদেশী সরকারের আজ্ঞাবাহী ভাড়াটিয়া সৈনিকের কাজ করে যেতে পারেন না। আমার মতে, আমাদের সৈন্যদের সম্পূর্ণভাবে রাজনীতি-সচেতন হওয়া উচিত। কেননা, তাঁরা কেবল সৈনিকই নন, তাঁরা সচেতন নাগরিকও বটে, এবং সচেতন নাগরিক হিসবে দেশের প্রতি তাঁদের কর্তব্য পালন করতে হবে। বর্তমানে

আমাদের সৈনিকরা তাঁদের দেশের প্রতি কর্তব্য এবং সৈনিকোচিত নিয়মানুবর্তিতা—এই দুই প্রেরণার বিপরীতগামী সংকটের শিকার হয়ে পড়েছেন।

'ভুলাভাই দেশাই প্রথম আই এন এ বন্দিদের বিচারের সময় অনবদ্য ভাষায় পরাধীন সৈন্যবাহিনীর বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার অধিকার সুন্দরভাবে দেখিয়ে দিয়েছেন। আমাদের সশস্ত্রবাহিনী তাই ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার সকল নৈতিক অধিকার রাখে।

'সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে আই এন এ-র ঘটনাবলী সাম্প্রতিক আর আই এ এফ এবং আর আই এন-এর ধর্মঘট দেশের স্বার্থে বা মুক্তিতে একটি উল্লেখযোগ্য কাজ করেছে। জনসাধারণের ও সশস্ত্রবাহিনীর মধ্যে যে-দুস্তর ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছিল তা এই সব অভিযান দূর করে দিয়েছে। আজ জনতা ও সৈন্যরা পরস্পরের নিকটে এসে গেছে।

'দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে ও পরে হাজার হাজার ভারতীয় যুবক স্থল, নৌ ও বিমানবাহিনীতে যোগ দেয়। এঁদের মধ্যে অনেকেই রাজনীতি-সচেতন ছিলেন, কেউ কেউ প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতি করেছেন। যুদ্ধের সময়ে সকল প্রকার নিয়মানুবর্তিতা মেনে চলেছেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বহু ধরনের অপমান, জাতিগত বৈষম্য ও অত্যাচার ভোগ করেছেন। যুদ্ধের অবসানে এঁদের মধ্যে কেউ এই অপমান ও অন্যায়ের বিরুদ্ধাচারণ করেছেন যা নানা ধরনের বিক্ষোভ ও প্রতিবাদে ফেটে পড়েছে।

'এদের প্রতি আমার প্রভূত সহানুভূতি আছে, কিন্তু সামরিক কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে তাঁদের অস্ত্রধারণ করা ঠিক হয় নি। এই যুবকরা জানত যে, তারা কতবড় শক্তির বিরুদ্ধে লড়তে যাচ্ছে। তাদের হাতে যথেষ্ট খাদ্য মজুত ছিল না, সামান্যই গুলি বারুদ ছিল, অথচ প্রতিপক্ষের হাতে অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য শক্তি কতই না বিপুল! বিদ্রোহের প্রেরণায় প্রতিপক্ষ সাময়িক প্ররোচনা দিয়ে এই যুবকদের শত্রুর ফাঁদে পা দিতে বাধ্য করেছিল।

'সম্প্রতি আর আই এন-এর ধর্মঘটে এই বীর নাবিক যুবকেরা একটা ভুল করেছে বটে, কিন্তু তাদের ক্ষমা করা আমাদের কর্তব্য। এবং এদের প্রতি যাতে কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা না নেওয়া হয় তাও দেখা আমাদের কর্তব্য। কোনো কোনো সংবাদপত্রে দেখলাম সর্দার প্যাটেল নাকি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, এদের প্রতি কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না। মৌলানা আজাদও নাকি ঐরূপ গ্যারান্টি দিয়েছেন। কিন্তু সর্দার প্যাটেল ও মৌলানা আজাদের পক্ষে ঐরূপ গ্যারান্টি দেওয়ার কোনো ক্ষমতা নেই। একমাত্র সরকার সেই জাতীয় প্রতিশ্রুতি দিতে এবং তা রক্ষা করতে পারে।

'কর্তৃপক্ষকে কেবলমাত্র আর আই এন-এর ছেলেদের ব্যাপারে নয়, কেবল বোম্বাইয়ের ব্যাপারে নয়, সমস্ত ভারতে এ-জাতীয় বিদ্রোহ, বিক্ষোভ প্রভৃতি ঘটনায়

প্রকাশ্য তদন্ত করা দরকার। সমস্ত অভিযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে আত্মসমর্পণের সবরকম সুবন্দোবস্ত করতে হবে—যেমন আই এন এ-র অভিযুক্ত সৈন্য ও অফিসারদের আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে।

'সশস্ত্রবাহিনীর লোকেরা আজ এ-ধরনের ব্যবহার করছে কেন? কালের পরিবর্তন ঘটেছে। শাসকবর্গের জানা উচিত যে, অতীতে যেভাবে এক দলকে অপর দলের বিরুদ্ধে লাগিয়ে শাসন চলত, আজকের দিনে তা হবার উপায় নেই। সশস্ত্র-বাহিনীর লোকেরা আজ দেশের ও জনসাধারণের প্রতি তাদের কর্তব্য বুঝতে পেরেছে।'

'বিপ্লব ও গুণ্ডামী এক জিনিস নয়। বস্তুত যে-ধরনের বিপ্লবী কার্যকলাপ সামাজিক পরিবেশের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটায় না, তাকে প্রতিবিপ্লবী কার্যকলাপ বলা যেতে পারে। এ হল এক ধরনের বিপজ্জনক অ্যাডভেঞ্চার, যাতে জনসাধারণের নৈতিক বুদ্ধি ও সংগঠনকেই দুর্বল করে দেয়। প্রত্যেক বিপ্লবেরই একটা সুচিন্তিত ও সুনির্দিষ্ট নীতি বা স্ট্রাটেজি থাকে এবং সুপরিকল্পিত প্রচার থাকে। এসব ছাড়া বিপ্লব ব্যর্থ হতে বাধ্য। কাজেই যে-ধরনের বিপ্লবের মধ্যেই আমরা প্রবেশ করি না কেন, আমাদের দেখতে হবে শৃঙ্খলা রক্ষিত হচ্ছে কিনা এবং সমস্ত কার্যকলাপ সুনির্দিষ্ট পথে অগ্রসর হচ্ছে কিনা। অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করে অগ্রসর হতে হবে।'

চৌপট্টিতে পূর্বদিনের ভাষণে পণ্ডিত নেহরু এবং সর্দার প্যাটেলের বক্তব্যে জনগণ সন্তুষ্ট হতে পারে নি মনে করেই হয়তো পরের দিন পণ্ডিত নেহরু আবার একটি প্রেস কনফারেন্স করে দু'ঘণ্টা ধরে সেখানে তাঁর বক্তব্য রাখেন। অধিকন্তু, ধর্মঘটী নাবিকদের কোনো শাস্তি দেওয়া হবে না, এই ধরনের প্রতিশ্রুতি রাখবার ভারতের ব্রিটিশ সরকার কোনো লক্ষণই দেখাচ্ছিলেন না। ফলে, পণ্ডিত নেহরুর পক্ষে বোম্বাইয়ের জনগণকে সন্তুষ্ট রাখা অত সহজ হচ্ছিল না। তাই, এই প্রেস কনফারেন্সে আবার তাঁকে তাঁর নিজস্ব স্বাভাবিক প্রকৃতির উত্তপ্ত বাণীর বাক্য-বিন্যাস করতে দেখা যায়। তিনি বললেন, 'আমি জানতে পেরেছি কমাণ্ডার-ইন-চিফের বেতার-বার্তার ঘোষণা-সত্ত্বেও ধর্মঘটী নাবিকদের বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে শাস্তি-মূলক ব্যবস্থার হুকুম চালু হয়েছে। কেবল আক্ষরিক অর্থেই নয়, তাঁদের সাজা সত্যি সত্যি এমন ধরনের দেওয়া হচ্ছে, যাকে ভীতিজনক ব্যবস্থা বলা চলে। কেন্দ্রীয় এ্যাসেম্বলিতে সহকারি যুদ্ধসচিব মিঃ ম্যাসন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে না বলে যে-প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, সেই প্রতিশ্রুতিরও কোনো মূল্য দেওয়া হচ্ছে না।'

উক্ত প্রেস কনফারেন্সে ১৯৪২ সালের গোপন আন্দোলন সম্বন্ধে, অর্থাৎ অরুণা আসফ আলি প্রভৃতির কার্যকলাপ সম্বন্ধে তাঁর মতামত কি—এ-প্রশ্নের উত্তরে পণ্ডিত নেহরু বললেন:

'যেখানে খোলাখুলিভাবে কাজ করা সম্ভব, সেখানে অন্য কোনোভাবে বা গোপনভাবে কাজ করার চেষ্টা ফলপ্রসূ তো নয়ই, বরং অর্থহীন বলা যায়। গত

দু'তিন বছর যাবত যখন অবস্থা সেরকম ছিল না, তখন ভিন্ন ধরনের কাজের কথা ভাবা যেতে পারে। এ-বিষয়ে কেউ একমত হতে পারেন, না-ও হতে পারেন। কিন্তু যেখানে খোলাখুলিভাবে কাজ করার অনেক ক্ষেত্র ও সুযোগ রয়েছে, সেখানে গোপনভাবে চলার কোনো অর্থ হয় না। সেক্ষেত্রে জনসাধারণকেই গোপন করে চলার রেওয়াজ গড়ে ওঠে এবং সত্যিকার কোনো গণআন্দোলন গোপনীয়তার পথে গড়ে উঠতে পারে না।'

অরুণা আসফ আলির গত কয়েক বছরের কার্যকলাপ তিনি পছন্দ করেন কিনা —এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, 'আমি তাঁর কার্যকলাপ সমর্থন করি না।'

হিংসা ও অহিংসা সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন, 'আমি আমার নিজের কথাই বলতে পারি। হয় তো আরো অনেকে এ-বিষয়ে একমত হবেন। আমি মনে করি, আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রামে আজ এবং অতীতেও অহিংসা ও তার রীতি-নীতি উপযুক্ত, বর্তমানের ভারতের ও পৃথিবীর পরিস্থিতির বিবেচনায়। যদি আমরা হিংসা-নীতির কথাই ভাবি তবে আমাদের অধিকতর যোগ্য সহিংস উপায়ের কথা ভাবতে হবে। শত্রুপক্ষের সশস্ত্র শক্তির তুলনায় অপেক্ষাকৃত যোগ্যতর হিংসার বিরুদ্ধে নিকৃষ্টতর হিংসার কথা ভাবা বোকামি মাত্র। কোনো সশস্ত্রবাহিনীর সেনাপতি সেভাবে ভাবতে পারেন না।'

তিনি কেন তবে আই এন এ সম্বন্ধে উচ্চ প্রশংসা করে থাকেন, এই প্রশ্নের উত্তরে পণ্ডিত নেহরু বললেন, 'আই এন এ-র শিক্ষা থেকেই আমি বরং একথা বলি যে, এদেশে অহিংসার পথই শ্রেষ্ঠ পথ। ভারতের স্বাধীনতার জন্য যাঁরা সশস্ত্র বা নিরস্ত্র যে ভাবেই হোক লড়েছেন, সে এক কথা, কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে ভারতের সমস্যা সমাধানের উপায় নির্ধারণের কথা সম্পূর্ণ আলাদা কথা বা প্রশ্ন। আই এন এ সশস্ত্র পথ নিয়েছিলেন এবং তাঁরা ব্যর্থ হন। আই এন এ যদি সার্থক হত, তবে প্রশ্নকর্তা হয়তো বলতে পারতেন যে, সহিংস সংগ্রাম সার্থক হয়েছে। আই এন এ ব্যর্থ হয়েছে সশস্ত্র অথবা অহিংস সংগ্রামের জন্য নয়, ব্যর্থ হয়েছে বাহ্যিক পরিস্থিতির প্রতিকূলতার জন্য। পৃথিবীর বাস্তব অবস্থায় বৃহত্তর শক্তিগুলি তাদের প্রতিকূলে ছিল বলেই তাঁরা ব্যর্থ হয়েছিলেন।'

বৃহত্তর শক্তিগুলি আই এন এ-র প্রতিকূলে থাকলেও তাঁরা ব্যর্থ হতেন না যদি দেশের অভ্যন্তরে কিছু বাক্যবাগীশ ও কায়েমী স্বার্থের প্রতিভূ নেতারা দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে এবং ব্রিটিশের সাথে হাত মিলিয়ে আই এন এ অর্থাৎ সুভাষচন্দ্র ও তাঁর সহযোগীদের প্রতি চরম শত্রুতাপূর্ণ কার্যকলাপ পরিচালনা না করতেন।

'আই এন এ-র সঙ্গে বর্তমান ভারতের পরিস্থিতির তুলনা করা চলে না। কেননা, আই এন এ-কে কাজ করতে হয়েছে দেশের বাইরে থেকে এবং সেক্ষেত্রে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের কোনো ক্ষেত্র ছিল না। আপনারা আমাকে ক্ষমা

করবেন, কিন্তু আমার মনে হয় যখনই আমাদের দেশে হিংসা ও অহিংসার কথা ওঠে, তখনই আমরা স্থান-কাল-নির্বিশেষে শিশুসুলভ কথাবার্তা বলে থাকি, অষ্টাদশ শতাব্দীর পরিপ্রেক্ষিতে তর্ক-বিতর্ক করি। লোকে ভুলে যায় আমরা বিংশ শতাব্দীর মাঝখানে এসে উপস্থিত হয়েছি। যখনই আপনারা কোনো দেশের মুক্তি বৈপ্লবিক সহিংস পথে আনবার কথা ভাবেন, তখন সে আভ্যন্তরীণ বিপ্লবী-শক্তিকে বিনষ্ট করার জন্যে রাষ্ট্রের হাতে কি রকম নিষ্ঠুর সহিংস শক্তি আছে, আপনারা সে-কথা ভাবেন না। গত পঞ্চাশ বছরে রাষ্ট্রের violence-এর ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তিত হয়ে গেছে। সে-শক্তি আজ রাষ্ট্রের এত বেশি যে, জনগণের সাধারণ সহিংস শক্তি তার তুলনায় অতি নগণ্য। যাঁরা ব্যারিকেডের কথা বলেন, তাঁরা আজ ফরাসি-বিপ্লবের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কথা বলেন। আজ থেকে দেড়শো বছর আগে রাষ্ট্রের সশস্ত্র শক্তি ও বিদ্রোহী জনসাধারণের শক্তির মধ্যে পার্থক্যটা সত্যি খুব বেশি ছিল না। এমন কি আজকের দিনেও সশস্ত্র-বাহিনীর সৈনিক ও নাগরিকদের সশস্ত্র সংগ্রামের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। কেননা, বিমান, ট্যাঙ্ক ও বোমা প্রভৃতি অত্যাধুনিক মারণাস্ত্র সাধারণত সাধারণ সৈনিকের হাতের বাইরে।'

নরম-গরম সুবক্তা পণ্ডিতজীর একথাও সত্য নয়। বিংশ শতাব্দীর মাঝে কেন, তার পরেও বহুদিন ধরে ভিয়েতনামের বীর বিপ্লবী জনগণ সৎ ও নিষ্ঠাবান দেশ-প্রেমিক নেতা হো চি মিন-এর মহান নেতৃত্বে বীরবিক্রমে সশস্ত্র সংগ্রাম চালিয়ে দেশকে মুক্ত করেছেন সাম্রাজ্যবাদী রাহুগ্রাস থেকে—আমাদের দেশের মত বিশ্বাস-ঘাতক কায়েমী স্বার্থান্বেষী নেতা এবং বিশ্বসাম্রাজ্যবাদী শক্তির হাত থেকে। অথচ জনবল ও অস্ত্রবলে বীর ভিয়েতনাম হল শত্রুপক্ষের তুলনায় অতীব নগণ্য। কিন্তু তাঁরা কেন পারলেন জয়ী হতে?

তাঁরা জয়ী হতে পারলেন এই কারণে যে, তাদের নেতা ছিলেন সৎ ও নিষ্ঠাবান দেশপ্রেমিক। সেই নেতার বৃহত্তর জীবনে তো বটেই, এমন কি নিতান্ত ব্যক্তিগত জীবনেও এতটুকু নিজস্বার্থ-সিদ্ধির ফিকিরে ছিলেন না কখনা। যা-কিছু করেছেন, দেশের জনগণের স্বার্থেই করেছেন। তাই তিনিই পেরেছিলেন দেশের প্রতিটি লোকের মধ্যে আত্মবল জাগাতে, পেরেছিলেন প্রতিটি লোকের মধ্যে দেশপ্রেমের বন্যা বইয়ে দিতে। ফলে অস্ত্র ও জনবলে নগণ্য হয়েও মনোবলে মহান ভিয়েতনাম হয়ে আছে অজেয়। তাঁরা সশস্ত্র বিপ্লবই করেছেন। অহিংস বিপ্লব করলে, আমার মনে হয়, তাঁদের দুঃখ, তাঁদের চিরদারিদ্র্য কোনোদিনই দূর হত না। বরং তিলে তিলে নিঃশেষ হয়ে যেত—যা নাকি ঘটছে বর্তমানে ভারতের ভাগ্যে।

তিনি আরো বললেন, 'আজকের দিনে হিংসা ও অহিংসার নৈতিক তাৎপর্য নিয়ে তর্কের অবসর তত নেই, যত আছে তাদের বাস্তব ব্যবহারের উপযোগিতা নিয়ে। হিংসার পথ সম্বন্ধে সমস্ত আলোচনাই বৃথা হতে বাধ্য—যদি না সৈন্যবাহিনীর হিংসাত্মক ক্ষমতার কথা আলোচ্য বিষয় না হয়। সামান্য ধরনের সশস্ত্র সংঘাত,

হয়তো সাময়িকভাবে একটা ত্রাস সৃষ্টি করতে পারে, এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে জটিল অবস্থাও সৃষ্টি করতে পারে, কিন্তু শেষ বিচারে দেখা যাবে অধিকতর যোগ্য violence-এর ক্ষমতা কোথায় এবং কার ! তাছাড়া এ-ধরনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সহিংস প্রচেষ্টা বা সংঘর্ষ একটা অনিশ্চয়তার আবহাওয়া সৃষ্টি করে এবং দীর্ঘকাল পর্যন্ত একটা ভারসাম্য স্থির করতে অসমর্থ হয়। রাজনৈতিক স্বাধীনতার মূল্যায়ন শেষ পর্যন্ত একটি বিকল্প স্থায়ী সর্বজন-স্বীকৃতি শক্তির বা authority-র জন্ম দিয়েছে, যে-শক্তি বা authority-র সাহায্যে ইপ্সিত সমাজ-ব্যবস্থা আনয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত পদক্ষেপ নেওয়া চলে। কিন্তু যদি বিশৃঙ্খলা, অরাজকতা ও অনিশ্চয়তা চলতেই থাকে, একটা স্থায়ী ভারসাম্য সৃষ্টি না হয়, তাহলে প্রয়োজনীয় সামাজিক পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব নয়।'

এটা একটা নতুন কথা নয়। যখন কোনো দেশে সশস্ত্র বিপ্লব ঘটে, তখন রাতারাতি স্থায়ী সরকার বা স্থায়ী অথরিটি ভারসাম্য নিয়ে দাঁড়াতে পারে না। সময়ে লাগবেই। সামান্য ভোটাভুটির মাধ্যমে যখন কোনো সরকার বা দেশের অথরিটি পরিবর্তিত হয়, তখনো তো তাঁরা রাতারাতি কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না। সাময়িকভাবে হলেও তাঁরা ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন। তাঁদের ঠিক হয়ে বসতে অনেক সময় কেটে যায় তাঁদের আদর্শ মত নিয়মতান্ত্রিক কাঠামোকে স্থাপন করতে। পণ্ডিতজীরা তো শিশুরাষ্ট্র বলে কাটিয়ে দিলেন প্রায় বিশ বছর। তখনো নাকি শিশুর দাঁত ওঠে নি! সেক্ষেত্রে সশস্ত্র বিপ্লবের বেলায় রাষ্ট্রকাঠামো ঠিকমত বসতে তো সময় একটু লাগবেই। তবে আমাদের শিশুরাষ্ট্রের মত নয়। মোটকথা— চাই আন্তরিকতা, চাই প্রকৃত দেশপ্রেম।

মহাত্মা গান্ধীর অহিংস আন্দোলনের সপক্ষে তিনি মন্তব্য করলেন, 'আজকের দিনে ছোট ছোট বিদ্রোহাত্মক সংঘর্ষের প্রচেষ্টা আমাদের নিজেদের সম্বন্ধে ভুল ধারণা থেকেই সম্ভবপর। আমরা কোনো দুর্বল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোক নই, আমরা শক্তিধর আন্দোলনের সন্তান, আমাদের পক্ষে ছোটখাটো violence-এর চক্র সৃষ্টি করে চলা উচিত নয়। ভারতের প্রায় অনেক স্থানেই আমি যা দেখতে পাচ্ছি, ছোটখাটো ইতস্তত বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষের পথে অগ্রসর হয়ে অনেকেই ভাবেন যে, তাঁরা বিপ্লব ত্বরান্বিত করছেন। আমি বলি তাঁরা তা করছেন না, বরং বাধাই সৃষ্টি করছেন। যদি সত্যি সত্যিই সহিংস পথ ধরতে হয়, তবে তাকে বৃহৎ ও ব্যাপক আকারে সংগঠিত করতে হবে। তার জন্য প্রস্তুতি চালাতে হবে। ক্ষুদ্রাকারের violence কেবলমাত্র অহিংসার পক্ষেই বাধা নয়, সত্যিকারের ব্যাপক violence-এরও অন্তরায়। এতে প্রতিপক্ষকে হুঁশিয়ার করে দেওয়া হয় মাত্র, প্রতিবিপ্লবী শক্তিকে জাগানো হয়।'

এক্ষেত্রেও বলা যায়, ভায়োলেন্স প্রথমত ক্ষুদ্রাকারেই দেখা দেয়। এতো আমরা সকলেই জানি, ক্ষেত্র প্রস্তুত থাকলে সামান্যতম একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গও দাবানলের

সৃষ্টি করে থাকে। এবং এটাই প্রকৃতিগত নিয়ম। তবে হ্যাঁ, বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত থাকা সত্ত্বেও সেই ক্ষুদ্রাকারের ভায়োলেন্সও ব্যর্থ হয় যদি সেই নেতৃত্বে স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিদের অনুপ্রবেশ ঘটে—যা দেখা গিয়েছে গত ১৯৪৪ এবং ১৯৪৬ সালের নৌ বিদ্রোহের সময়। সমগ্র ভারতের সমগ্র সামরিক বাহিনীতে তখন ভারতের পক্ষে ছিল প্রকৃষ্ট বিপ্লবের অনুকূল পরিস্থিতি, সাবজেকটিভ এবং অবজেকটিভ উভয় দিকেই প্রস্তুত ছিল দেশের অবস্থা, শুধু অভাব ছিল বিপ্লবকে সঠিক পথে এগিয়ে নিয়ে যাবার মত সৎ ও নিষ্ঠাবান দেশপ্রেমিক নেতৃত্বের। কেন্দ্রীয় গোপন সংস্থার বেশির ভাগ নেতাই ছিলেন অসৎ, ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধিপ্রবণ ও কৃত্রিম দেশপ্রেমিক। ফলে সাবোতাজ হয়েছে সর্বক্ষেত্রেই। নতুবা ঐ বিপ্লবে ভারতের রাষ্ট্রকাঠামো প্রকৃত বিপ্লবী সরকারের দ্বারা গঠিত ও পরিচালিত হত। ভারতের ভাগ্যাকাশে ঐরূপ সার্বিক বিপ্লবের সুযোগ আর উদিত হবে বলে সন্দেহ আছে।

বোম্বাইয়ের সাম্প্রতিক ঘটনা সম্পর্কে বলতে গিয়ে পণ্ডিত নেহরু বললেন, 'বোম্বাইয়ের রেটিংদের প্রতি জনসাধারণের সহানুভূতি যে প্রচুর,' সেকথা সহজবোধ্য। কামান ব্যবহারের ফলেই জনসাধারণের উত্তেজনা এত উচ্চ পর্যায়ে উঠেছিল। যদিও এই সমস্ত কামানের গোলা কোনো ক্ষতিকর হয় নি, তবু জনসাধারণ মনে করেছিল বুঝি বা দুই পক্ষের মধ্যে একটা ভয়ানক লড়াই হয়ে গেছে শুধু। কার্যত লড়াইটা কিন্তু দুই পক্ষের মধ্যে অতটা কিছু ঘটে নি।'

এ-কথাটাও পণ্ডিতজীর সত্যের অপলাপ ছাড়া আর কিছুই নয়। উভয় পক্ষের মধ্যে লড়াইটা যদি কার্যত জোরালো নাই-ই হবে তবে বোম্বের ও অন্যান্য স্থানের ইংরেজ এবং তার গোরা সামরিকবাহিনী তাদের স্থান ত্যাগ করে আত্মরক্ষার জন্য পালিয়ে যাবে কেন ? বোম্বে, করাচী প্রভৃতি স্থানগুলি একনাগাড়ে সাতদিন বিপ্লবীদের হাতে স্বাধীন থাকল কি করে ?

তবে হ্যাঁ, ঐ সাতদিন পরে পণ্ডিতজীদের মত কৃত্রিম দেশনেতাদের সহযোগিতা ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ কাপুরুষের ন্যায় বিপ্লবীদের শান্তির আমেজে পেছন দরজা দিয়ে চোরাগোপ্তা পথে আক্রমণ করে পরাভূত করল এবং ভারতের প্রকৃত বিপ্লবী পরিস্থিতিকে চিরতরে ধূলিস্মাৎ করবার চেষ্টা করল।

এর পরে তাঁর মন্তব্য, 'শহরে নানা ধরনের নানা দল ও উপদল আছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ নিজেদের বিপ্লবী মনে করে, অথচ অষ্টাদশ শতাব্দীর রণকৌশলের উপরে যেতে রাজি নন। কম্যুনিস্টরা নিজেদের ভয়ানক বিপ্লবী বলে মনে করেন। কিন্তু আমি তাঁদের প্রতিবিপ্লবী মনে করি। তাঁরা বিপ্লবী তো নয়ই, বরং কার্যত ভয়ানক রক্ষণশীল।'

পরমুহূর্তেই পণ্ডিতজী বললেন, বিশেষ করে শহরের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ও অরাজকতার প্রতি লক্ষ্য করে :

'একদিকে সরকারের তরফ থেকে নির্বিচারে গুলি-গোলা প্রয়োগ, শত শত

ব্যক্তির মৃত্যু, অপর দিকে শহরের নানা সম্পত্তির ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির জন্য আমি মর্মাহত। জনসাধারণের কিছু কিছু অংশ যেভাবে অনাচারী ব্যবহার করেছে, বিশেষত, বিদেশীদের প্রতি যে-দুর্ব্যবহার করেছে, তাঁদের টাই, টুপির ধ্বংসসাধন করে তাঁদের অপমান করেছে, তীব্র ভাষায় আমি তার নিন্দা করি।'

বলিহারী অদৃষ্টের পরিহাস! পণ্ডিতজীর ভাষাতেই যেখানে শত শত ভারতীয় (প্রকৃতপক্ষে মারা গিয়েছিল হাজার হাজার. যার সঠিক সংখ্যা এখনো আবিষ্কৃত হয় নি) ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে সরকারের নির্বিচারে গুলি-গোলার প্রয়োগে, তার জন্য সামান্য ভদ্রতার খাতিরেও দুঃখপ্রকাশ করলেন না। অথচ বিদেশীদের টাই, টুপি খুলে নিয়ে আগুনে পুড়িয়ে ফেলায় মহান বীর জনগণকে এই কাজের জন্য তীব্র ভাষায় নিন্দা করতে ভুললেন না। এ-জন্যই পণ্ডিতজীকে ব্রিটিশ-প্রেমিক বলা হয়ে থাকে। এমনকি গান্ধীজীও বলতেন, 'জহরলাল যতটা না ভারতবাসী তার চাইতে বেশি ইংরেজ। তিনি দেশবাসীর সাহচর্যের চাইতে অনেক বেশি ইংরেজ-সাহচর্য লাভ করে খুশি হতেন। ('কংগ্রেসের ইতিহাস', ডঃ পট্টভি সীতারামাইয়া, খণ্ড ২, পৃঃ ৩১২)

এবারে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের বিবৃতির কিছু উদ্ধৃতি দিচ্ছি। চৌপট্টির যে-সভায় পণ্ডিত নেহরু ভাষণ দেন, সেই সভারই সভাপতি ছিলেন সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল। সর্দার প্যাটেল জনসাধারণের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মনোভাবের অপব্যবহার করে যে-সমস্ত রাজনৈতিক দল ও ব্যক্তি জনসাধারণকে বিপথে চালিত করেছেন তাঁদের সম্বন্ধে ভারতবাসীদের সচেতন করে দেন। তিনি বলেন, 'কংগ্রেস যেখানে কোনোপ্রকার বিদ্রোহের ডাক দেয় নি, উপরন্তু জনসাধারণকে গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করতে বলেছে, সেখানে জনসাধারণ বিদ্রোহ ও বিপ্লবের পথে পা বাড়িয়েছে দেখে আশ্চর্যান্বিত হয়েছি।

'কংগ্রেসের নাম করে যে-সমস্ত কংগ্রেসের লোক জনসাধারণকে বিদ্রোহের জন্য উস্কানি দিচ্ছেন আমি তাঁদের সম্বন্ধেও দেশবাসীকে হুশিয়ার করে দিচ্ছি। জনসাধারণ একমাত্র কংগ্রেস হাই-কমাণ্ডের কথা শুনবেন, আমি এটাই আশা করি। যদি আপনারা মনে করেন যে, কংগ্রেস নেতৃত্ব ভুল করছেন, তাহলে নতুন নেতৃত্ব সৃষ্টি করুন। কিন্তু যদি কংগ্রেস নেতৃত্বই মানেন, তবে কংগ্রেসের আদেশ আপনাদের শুনতেই হবে।'

কিন্তু প্রশ্ন হল, ভুলাভাই দেশাই তো ছিলেন কংগ্রেস হাইকম্যাণ্ডের লোক। তিনিই তো এই বিপ্লবাদের কেন্দ্রীয় গোপন সংস্থায় ছিলেন। তিনি যদিও ১৯৪৪ সালের বিদ্রোহের সব কিছুই পণ্ড করে দিয়েছিলেন বিশ্বাসঘাতকতা করে; তবু কিছু নেতার সহযোগিতায় তিনি আবার স্থান করে নিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় গোপন সংস্থায়। বিশেষ করে যখনই আই এন এ-বন্দিদের স্বপক্ষে ব্যারিস্টারের পোশাক পরে দাঁড়ালেন। তাহলে কি করে বলি যে, কংগ্রেস হাই-কমাণ্ড পেছনে নেই? তাছাড়া সর্দার

বল্লভভাই প্যাটেলের মত কায়েমী স্বার্থভোগী নেতাদের পরিবর্তন করে কংগ্রেসকে অচল অবস্থা থেকে সচল করার মানসে আপসহীন নেতা সুভাষচন্দ্র বহুবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু কই, সর্দারজী তো বেআইনীভাবেই সুভাষচন্দ্রকে হটিয়ে নিজেরা কংগ্রেস দখল করে থাকলেন। ওসব লোক দেখানো নতুন নেতৃত্বের কথা বা নেতৃত্ব বদলের কথা বলে কী লাভ!

তিনি আরো বলেন, 'কম্যুনিস্ট পার্টি জনসাধারণকে ভুল নেতৃত্ব দিচ্ছে ও তাদের স্বদেশপ্রেমকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করতে চাইছে। গত কয়েক বছরে তাদের মর্যাদা যেভাবে ক্ষুন্ন হয়েছে তার ক্ষতিপূরণ করার জন্যই কম্যুনিস্ট পার্টি এ-ধরনের উস্কানি দিয়ে চলেছে। ১৯৪২ সালের আগস্ট আন্দোলনের বিরোধিতা করে কম্যুনিস্ট পার্টি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করে, সেই গ্লানি ও অপরাধকে মুছে নিজেদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করার জন্যই তাদের এই বিপ্লবীয়ানা।

'এই পার্টি এখন সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের কথা বলছে, কিন্তু কে আজ তাদের বিশ্বাস করবে বা করতে পারে? তাদের এই উস্কানি বেশিক্ষণ কার্যকর হতে পারে না, অচিরেই তাদের ব্যর্থতা প্রমাণিত হতে বাধ্য।

'ছাত্রদের নিয়মানুবর্তিতার অভাব ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির জন্য আমি বিশেষভাবে দুঃখিত। যদি তারা, আমার মতে, কিছু ভাল কাজ করতে চান তবে তাঁরা যেন কংগ্রেসের আদেশ অক্ষরে অক্ষরে মানেন।'

এ-ছাড়াও নৌ বিদ্রোহের ফলে সারা দেশে যে-ভয়ানক বিপজ্জনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে সে-কথা সর্দার প্যাটেল সভায় বলেন, এবং নৌ বিদ্রোহের সমর্থনে শুক্রবার দিন শহরে যে-সর্বাত্মক হরতালের ঘোষণা করা হয়েছে তার বিপজ্জনক তাৎপর্যের কথা উল্লেখ করেন। এই ধর্মঘট যাঁরা ঘোষণা করেছেন তাঁরা মূর্খের স্বর্গে বাস করছেন বলে সর্দার প্যাটেল অভিযোগ করেন, যেহেতু তাঁরা সর্বাঙ্গীণ অবস্থার গুরুত্ব অনুভবই করতে পারছেন না। এ-সমস্ত তথাকথিত জনদরদী নেতারা নিজেদের যেমন আত্মপ্রতারিত করছেন, তেমনি জনসাধারণকে বিপথগামী করে জনসাধারণের এবং শহরের প্রচুর ক্ষতিসাধন করছেন বলে মন্তব্য করেন।

অথচ তিনি নিজে যে দেশের কতবড় ক্ষতিসাধন করলেন অখণ্ড ভারতকে ভাগ করার সম্মতি দিয়ে, তা কিন্তু সর্দারজী একবার মনেও স্থান দিলেন না। তাই তো আবার বলতে হচ্ছে, 'ইষ্ট নেই নেতা যেই, যমের দালাল কিন্তু সেই।' অর্থাৎ দেশের ও দশের মঙ্গল কামনার আদর্শ যাদের নেই, তারা যদি দেশের নেতা হয়, তবে তারা যমেরই দালাল হতে বাধ্য।

নৌ বিদ্রোহের অনতিকাল পরেই ১৯৪৭ সালে কংগ্রেস ক্ষমতায় আসে। পণ্ডিত নেহরুই প্রধানমন্ত্রী হন, সর্দার প্যাটেল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। জিন্না সাহেবের দলও ক্ষমতায়

আসে। কিন্তু ধর্মঘটী নাবিকদের সম্বন্ধে যে-প্রতিশ্রুতি ব্রিটিশ সরকার পালন করে নি, কংগ্রেস ও লিগ সরকারও তা পালন করল না। ব্রিটিশ, কংগ্রেস এবং লিগের ভূমিকা

মনে আজ প্রশ্ন জাগে, গান্ধীজী, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, নেহরুজী বা কংগ্রেস হাই-কমাণ্ড কোনদিন তো বলেন নি যে, দেশের চরম সংকটের দিনে তাঁরাই সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে দেশকে মুক্ত করার নেতৃত্ব দেবেন! এঁরা আর যা-ই ধোঁকা দিয়ে থাকুন না কেন, সশস্ত্র বিপ্লবের দ্বারা দেশকে মুক্ত করবেন—এমন ধোঁকা কোনোদিনই দেন নি। তবু বিপ্লববাদী নেতারা তাঁদের কাছে বারে বারে অর্থাৎ কংগ্রেস ও মুসলিম লিগের হাই-কমাণ্ডের কাছে বিপ্লবী নেতৃত্ব চাইতে গেছিলেন কেন?

এর উত্তরে, আমার মনে হচ্ছে, বিপ্লবী নেতাদের চরিত্রগত এবং মনুষ্যত্ব জনিত সত্যনিষ্ঠাসম্ভূত আদর্শের অভাব আছে। এই আদর্শের অভাব থাকায় প্রকৃত দেশপ্রেমেরও অভাব দেখা দিয়েছে। কেন না, দেশপ্রেম তো আদর্শেরই উপরে নির্ভর করে থাকে, একে অন্যের পরিপূরক হয়ে। যাঁরা বিপ্লববাদে বিশ্বাসী তাঁদেরই তো দায়িত্ব ছিল এই বিদ্রোহের পূর্ণাঙ্গ নেতৃত্ব দেওয়া। সর্বভারতীয় কেন্দ্রীয় গোপন সংস্থা তো সেই কাজের জন্যই সৃষ্টি হয়েছিল এবং সে-দায়িত্ব পালন করার অপূর্ব সুযোগ, যাকে সুবর্ণ সুযোগ বা শেষ সুযোগ বলা যায়—দেখা দিয়েছিল সেই মহান ঐতিহাসিক নৌ বিদ্রোহে।

এমন সুবর্ণ সুযোগ ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহেও দেখা যায় নি। জাহাজ দখল করে থাকলেই তো হবে না, বোম্বাই দখল করাই তখন একমাত্র কাজ ছিল। নাবিকেরা সেই ব্যবস্থাই করেছিল। বাধা দিলেন কেন্দ্রীয় গোপন সংস্থা। এমন যে হতে পারে এই ভেবে ভয়ে বোম্বাইয়ের লাটসাহেব পর্যন্ত সেদিন পুনাতে পালিয়ে গিয়েছিলেন। জেনারেল লকহার্টের ওপর শহরের দায়িত্ব অর্পণ করা হল। মারাঠী সৈন্যরা যখন গুলি-গোলা চালানোর হুকুম শুনল না, আর সর্বভারতে যখন ভারতীয় সৈন্যরা—এমনকি গুর্খা রেজিমেণ্ট পর্যন্ত হুকুম মানতে রাজি নয়, নৌ বিদ্রোহের দু'একদিন আগে থেকেই যখন ভারতীয় বিমানবহরের সব কর্মীরা ধর্মঘট করে আছে, সর্বত্র যেখানে মজুররা ধর্মঘট করে চলেছে, আজাদ হিন্দ বাহিনীর লোকদের মুক্তির জন্য যখন কলকাতা ফেটে পড়ছে—বোম্বাই, করাচী, কলকাতার মত প্রধান তিনটি শহর যেখানে প্রায় বিদ্রোহী—সে-অবস্থায় বোম্বাই শহর দখল করে সর্বভারতে বিপ্লব শুরু করে দেওয়া যথেষ্ট সহজ ছিল।

এতবড় সংগ্রামের পরিধি ১৯২১, ১৯৩০-৩২ এবং ১৯৪২ সালের সংগ্রাম-গুলিকেও অনায়াসে ম্লান করে দিত। এমন কি আজাদ হিন্দ বাহিনীর সংগ্রামের ভবিষ্যৎও তার তুলনায় ম্লান হয়ে যেত। পরিশেষে, ঐতিহাসিক তাৎপর্য নিয়ে যুগে যুগে যে-প্রশ্নটি মাথা তুলে দাঁড়াবার চেষ্টা করবে তা হল স্বাধীনতার নাম করে শেষ পর্যন্ত ভারতবর্ষকে খণ্ডিত না-করে স্বাধীন করার করার আর কোনো উপায়

ছিল কি না। ঐতিহাসিকরা যা ঘটে তার বর্ণনা দিয়েই খালাস, যা ঘটতে পারত, অন্যরকম কিছু ঘটতে পারত কিনা সে-জাতীয় গবেষণা সাধারণত করে না। সে-কাজ প্রধানত রাজনীতিবিদদের। স্বাধীনতা পেয়েই যেসব ভারতীয় ও পাকিস্তানী নেতারা আত্মসন্তোষে বিভোর হয়েছিলেন, তাঁদের পক্ষে ভারতবিভাগকে একটা অনিবার্য বিকল্পহীন ঘটনা বলে সাফাই গাওয়ার চেষ্টা ছিল এবং আজও থাকবে।

কিন্তু যাঁরা বিপ্লববাদী বলে নিজেদের জাহির করতে ব্যস্ত ছিলেন, তাঁদের একথা স্বীকার করতে হবে যে, ভারতবর্ষের অখণ্ডতা রক্ষা করে সর্বভারতীয় গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের শেষ সুযোগটা বোধহয় নৌ বিদ্রোহকে অস্বীকার করেই হারিয়ে যায়। সর্বভারতীয় অসাম্প্রদায়িক বিপ্লবের শেষ পদধ্বনি ঐ নৌ বিদ্রোহের মধ্যেই শোনা গিয়েছিল, সে-বিদ্রোহের প্রকৃত তাৎপর্য, বাণী ও আদেশ সেদিনকার কোনো দলই অনুভব করতে পারে নি—এমন কি অরুণা আসফ আলি প্রভৃতিও না। ইতিহাসের এই নিষ্ঠুর অথচ সত্যনিষ্ঠ বিচারের রায় থেকে কারো নিষ্কৃতি পাবার উপায় নেই। সে-বিদ্রোহ ও বিপ্লব ব্যর্থ ও পরাস্ত হওয়ার দায়িত্ব কেবল কংগ্রেস নেতৃত্বেরই নয়—কংগ্রেস-বিরোধীদের দায়িত্ব এবং অংশও তাতে কম নয়।

পরিষ্কার বোঝা যায়, মূলত সেদিনকার ভারতবর্ষের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বিদ্রোহাত্মক সংঘর্ষগুলিকে পণ্ডিত নেহরু শান্ত বা দমিত করার জন্যই বিপ্লবের বৈজ্ঞানিক অজুহাতগুলি দিচ্ছিলেন। সুপরিকল্পিত ও সুনিয়ন্ত্রিত বৈপ্লবিক নেতৃত্বের অভাবে নৌ বিদ্রোহ ও অন্যান্য সব বিদ্রোহ ব্যর্থ হতে পারে, একথা যদি সত্য হয় তবে পণ্ডিত নেহরুর পক্ষে নিজেকেই সেই নেতৃত্ব সৃষ্টি করা অথবা দেওয়ার কি অন্তরায় ছিল? অন্যান্য তথাকথিত বিপ্লবীদের অপরিপক্বতা ও চিন্তার স্থবিরতা নিয়ে ঠাট্টা করা চলে তাঁরই, যিনি বিকল্প সত্যিকার বৈপ্লবিক নেতৃত্ব দেওয়ার কথা ভাবতে পারেন। কাজেই সহিংস ও অহিংস উভয় দিক থেকেই তৎকালীন বৈপ্লবিক পরিস্থিতিকে ব্যবহার করার জন্য কি মহাত্মা গান্ধী, কি পণ্ডিত নেহরু, কেউ কিছুই করেন নি। জনসাধারণের প্রতি যত সহানুভূতি ও দরদই দেখানো হোক না কেন, উত্তেজিত ধর্মঘটী নাবিকদের অথবা সহানুভূতিশীল বিদ্রোহী বোম্বাইয়ের নাগরিকদের প্রত্যক্ষ নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য সেদিন পণ্ডিত নেহরু অথবা মহাত্মা গান্ধী পথে এসে জনতার সঙ্গে এক সারিতে দাঁড়ান নি বা জনসাধারণকে পরিচালিত করেন নি।

বিদ্রোহীদের আত্মসমর্পণের তিনমাস বাদে বিদ্রোহের কারণ অনুসন্ধান করার জন্যে তদন্ত কমিশন গঠন করা হয়েছিল। এই কমিশনে টেকচাঁদ ছাড়াও, কোঁয়ার দুলিম সিং, জয়াকার, বিচারপতি জাফরুল্লাহ, কে বেঙ্কটরাম শাস্ত্রী, বিচারপতি বিশ্বাস এবং স্যার আল্লাদি কৃষ্ণস্বামী আয়ার সদস্য হিসাবে ছিলেন। কিন্তু ছ'শো পৃষ্ঠার সেই রিপোর্ট কখনো জনসাধারণের সামনে প্রকাশ করা হয় নি। স্বাধীন সরকারও সে-রিপোর্ট নিষিদ্ধ করেছেন। কেন করেছেন, এ-প্রশ্ন আজ ওঠা উচিত। রাজনৈতিক

দল এবং নেতাদেরই সর্বাগ্রে উচিত তা প্রকাশ করার চেষ্টা করা। কিন্তু মনে হয়, তাঁরা যেন একে গোপন রাখতেই চাইছেন। কিন্তু কেন? এ-প্রশ্ন করতে পারি কি? নৌ বিদ্রোহের প্রকৃত শিক্ষা ও তাৎপর্য গ্রহণে প্রচুর দ্বিধা লক্ষ্য করা যায়। অর্থাৎ সত্যনিষ্ঠার অভাব আমাদের ভেতরে রয়েছে সদা বিরাজমান।

ভারতে নৌ বিদ্রোহের তাৎপর্য হল, নাবিক, সৈনিক, শ্রমিক, বৈমানিক সবারই মধ্যে বিদ্রোহ-প্রবণতা জেগে উঠেছিল। হারিয়ে-যাওয়া জাতীয় সংহতি ও শ্রেণী-সচেতনতা মাথা তুলে উঠেছিল। আজাদ হিন্দ বাহিনীর কার্যকলাপের ইতিহাস যখন প্রকাশিত হল তখন এদের চেতনা হল অগ্নিগর্ভ। ১৯৪২ সালের পরাজিত সংগ্রামের প্রতিশোধ নিতে দেশের সর্বত্র জাগরণ দেখা দিল। যুদ্ধের দ্বারা—সে-সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধই হোক আর জনযুদ্ধই হোক—দেশের জনসাধারণ যে কত প্রতারিত হয়েছিল তা তারা বুঝতে পেরেছিল। নেতাজী সম্বন্ধে মিথ্যা প্রচারের অভিসন্ধিটা যে কত জঘন্য ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রজাত ছিল সে-ঘটনাও তারা জানতে পারল।

পক্ষান্তরে দেখতে পাই ১৯১৭ সালে সীমান্ত-ফেরত রুশ-নাবিক ও সৈনিকদের বিদ্রোহ বিপ্লবে পরিণত হয়েছিল। অথচ তার চেয়ে অনেক বেশি কারণ ও উপযুক্ত ক্ষেত্র থাকা সত্ত্বেও ভারতীয়দের বিদ্রোহ ও বিদ্রোহী চেতনা শেষ পর্যন্ত বিপ্লবে পরিণত তো হলই না, বরঞ্চ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়ে দেশ ভাগ হয়ে গেল। রক্ত দিল, প্রাণ দিল, গৃহহারা হল লক্ষ লক্ষ লোক—কিন্তু স্বাধীনতা ও বিপ্লবের জন্য নয়, দেশ ভাগ করার জন্য। আমাদের দু'শো বছরের পরাধীনতার গ্লানির বিরুদ্ধে বিপ্লবের যৌক্তিকতা নিশ্চয়ই রুশ দেশের অভিজাত শ্রেণীর বিরুদ্ধে সাধারণ রুশীয়দের বিদ্রোহের যৌক্তিকতার চেয়ে দশগুণ বেশি। তবু এমনটা হল কি করে? আমাদের মধ্যে স্বাধীনতার চেতনা কি কম ছিল? আমাদের দুঃখের ও বঞ্চনার সঞ্চয় কিছু কম ছিল কি? একেবারেই নয়। তবে?

ভারত ও রাশিয়া—দুই দেশের রাজনীতিতে একটা প্রকাণ্ড পার্থক্য ছিল। তা হল অভিজ্ঞতার পার্থক্য, নেতৃত্বের পার্থক্য। ১৯১৭ সালে সেখানকার জনগণ যখন আবার জাগতে শুরু করল, তখন ১৯০৫ সালের অনেক অভিজ্ঞতা তাদের তহবিলে জমা ছিল। তাই গ্রামে গ্রামে, শহরে শহরে, বন্দরে বন্দরে, কল-কারখানায়, সৈন্য-ব্যারাকে, নৌবহরে সর্বত্র রাতারাতি গড়ে উঠল সোভিয়েট বা বিপ্লবী পঞ্চায়েত, আর তাদের চোখের সামনে বিচার-বিতর্ক চলতে থাকল। বলশেভিক, মেনশেভিক, স্যোশাল রেভলিউশনারি, ক্যাডেট প্রভৃতি পার্টিগুলোর জাঁদরেল নেতৃত্বের তর্ক-বিতর্ক পরিষ্কার বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপরে চলল।

এদিকে আমাদের দেশের জনগণের চিত্তেও একটা দীর্ঘকালের সংগ্রামের ঐতিহ্য আছে; কিন্তু সে প্রধানত হরতাল, ধর্মঘট আর কিছু কিছু বোমার ও বারুদের ব্যক্তিগত ব্যবহারের ইতিহাস। তা ছাড়া যে-বিপ্লবের অভিজ্ঞতাটা সব প্রচেষ্টাকে

চাপা দিয়ে ভারতের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল, তা হল অহিংসা, সত্যাগ্রহ, আইন অমান্ত ধর্মঘট ও হরতাল পর্যন্তই, বড় জোর ১৯৪২ সালে কিছু কিছু অগ্নিসংযোগ ও রেললাইন উপড়ানো পর্যন্ত। আর আজাদ হিন্দ বাহিনীর সচেতন সশস্ত্র সংগ্রামের খবর পৌঁছেছিল মাত্র। কিন্তু তার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য, সশস্ত্র সংগ্রামের কৌশল ইত্যাদির কোনো বিচারই সেদিন তো দূরের কথা আজো হয় নি। আজো নেতাজী একটা ভাবাবেগের আধার মাত্র হয়ে বহুজনের মনে স্থান নিয়ে আছেন। সেটা যে প্রত্যক্ষ যুদ্ধের রণকৌশল জাতীয় কোন নেতৃত্ব সে-কথা, ক'জন লোক বিচার করেন? আর ১৯৪৪ ও ১৯৪৫-৪৬ সালের কোনো কিছুই বোধগম্য ছিল না দেশের নেতাদের ও জনগণের মানসে।

কেননা, বিপ্লবের শাশ্বত অবদান হল, আত্মদান, সাহসিকতা, মৃত্যুভয়শূন্যতা, কর্মস্পৃহা, পরার্থবোধ এবং সব'কিছু জড়িয়ে নিয়মানুবর্তিতার শিক্ষা। জাতির জীবনে ঐ সব গুণাবলী সাদরে বরণ না করলে তার যৌবন দেউলে হয়ে যাবে। শুরু হবে দুর্দিন। সে-দুর্দিন চরমে পৌঁছতে দেরি হবে না। তখন আবার পুনর্বিপ্লব ঘটাবার জন্য জাতিকে নতুন করে শুরু করতে হবে সেই ক্ষুদিরাম-পর্ব থেকে। কাজে কাজেই আজই তাদের বিশেষ করে শোনানো প্রয়োজন বিপ্লবের শাশ্বত বীর্যবত্তার কাহিনী, আত্মদানের কীর্তি। মৃত্যুহীন বিপ্লববাদ—বাংলা তথা ভারতের অমর ঐতিহ্য জাতির যৌবন জানুক এবং বুঝুক। আপন প্রাণের তারে তারা অনুরণিত করুক সেদিনকার বিপ্লবীদের কর্ম-ইতিহাসের শৌর্যবাণী। আজকের যাত্রী পূর্বগামীদের উদ্দেশে বলুক যে তাদের তারা ভোলে নি। এসবের মধ্য দিয়েই নবভাবে জন্মলাভ করবে দেশ-বরেণ্য শুদ্ধসত্ত্ব দেশ-কাণ্ডারী।

আমি এক অখ্যাত অজ্ঞাত বাঙালী নৌ বিদ্রোহী। সুমহান ও পবিত্র স্বাধীনতা দিবসের আনন্দ-মুহূর্তে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই বীর বিপ্লবী নৌ বিদ্রোহীদের। প্রণাম জানাই মহান বোম্বাইকে, মহান করাচীকে, মহান মহারাষ্ট্রকে!

ছন্দ ও গীতে কবিও গেয়েছেন:

অমৃতের পুত্র মোরা,
কাহারা শোনালো বিশ্বময়!
আত্মবিসর্জন করি,
আত্মারে কে জানিল অক্ষয়।